জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

১৮৫৩ সনের ৬ই ডিসেম্বর (২২ অগ্রহায়ণ, ১২৬০) তারিখে নৈহাটীর প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য-বংশে হরপ্রসাদের জন্ম হয়। তাঁহার প্রপিতামহ মাণিক্য তর্কভূষণ পলাশীর যুদ্ধের কিঞ্চিৎ আগে বা পরে স্বগ্রাম—যশোহর (অধুনা খুলনা) জেলার কুমিরা ত্যাগ করিয়া নৈহাটীতে আসিয়া বসতি করেন। তিনি অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন; ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। "পূর্ব্ব-দেশ হইতে আসিয়া নৈহাটী গ্রামে চৌপাড়ী করিয়া অধ্যাপনা" করার কথা কর্ণগোচর হইলে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১১৬৭ সালে (ইং ১৭৬০-৬১) মাণিক্যকে "পরগণে হাবেলী সহর" নৈহাটীতে অনেকখানি ব্রহ্মোত্তর জমি দান করিয়াছিলেন। মাণিক্যের পুত্র শ্রীনাথ তর্কালঙ্কারও নব্য-ন্যায়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই শ্রীনাথের পুত্র রামকমল ন্যায়রত্নই হরপ্রসাদের পিতা। তিনিও সুপণ্ডিত ছিলেন। নৈহাটীতে ভট্টাচার্য্য-পরিবারের টোল সে সময়ে শীর্ষস্থানীয় ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হরপ্রসাদ নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—"আমার পূর্ব্বপুরুষেরা নৈহাটীতে আসিয়া ন্যায়শাস্ত্রের টোল খুলেন। এক শত বৎসর ধরিয়া এই অঞ্চলের নৈয়ায়িকেরা আমাদের বাড়ী পাঠ স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অনেকেই নৈহাটীতে পাঠ স্বীকার করিয়া তথা হইতে উপাধি লইয়া গিয়াছেন।"

বিদ্যাশিক্ষা

রামকমলের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু ও পঞ্চম পুত্র হরপ্রসাদ প্রকৃত পণ্ডিত-পদবাচ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। নন্দকুমার অল্প বয়সেই ন্যায়শাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়াছিলেন। তিনি চারি বৎসর (নবেম্বর ১৮৫৬—ডিসেম্বর ১৮৬০) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপনা করিবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুপারিশে পাইকপাড়া রাজাদের কান্দী-স্কুলে হেড-পণ্ডিতের পদ লাভ করেন। ১৮৬১ সনের ৪ঠা অক্টোবর পিতা রামকমলের মৃত্যু হইলে নন্দকুমারকে নৈহাটী আসিতে হইয়াছিল। পিতৃশ্রাদ্ধের পর তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে লইয়া কান্দী ফিরিয়া গিয়াছিলেন। হরপ্রসাদের এ-বি-সি শিক্ষা এই কান্দী-স্কুলেই হয়। তখন তাঁহার নাম ছিল—শরৎনাথ। স্কুলের অ্যাডমিশন রেজিষ্টারে শরৎনাথের বয়স (নবেম্বর মাসে) "৮" লিখিত আছে। তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন :—

> বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে আমার দাদা ৺নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু কান্দীর হেডপণ্ডিত ছিলেন। তখন কান্দীর ইস্কুল এ্যাঙ্গ্‌লো সংস্কৃত ইস্কুল ছিল। হেডমাষ্টার ও হেডপণ্ডিত প্রায় সমান বেতন পাইতেন। আমার এ বি সি শিক্ষা কান্দীর ইস্কুলেই হয়। আমরা প্রায় এক বৎসর কান্দীতে ছিলাম। তখন আমার বয়স ৯ বৎসর,...ইস্কুলে আসিয়া এ্যাডমিশন রেজিষ্টার দেখিলাম। তখন আমার নাম ছিল শরৎনাথ ভট্টাচার্য্য, সেই নামেই আমায় ভরতি হইতে হইয়াছিল। আমার ভাএরাও সেই দিনে ভরতি হইয়াছিলেন।...২রা জুলাই ১৯২৩। ("পুরাণ বাঙ্গালার একটা খণ্ড" : 'বঙ্গশ্রী', মাঘ ১৩৪০)

পিতার সপিণ্ডকরণের সময় নন্দকুমার ভ্রাতাদের লইয়া নৈহাটী

ফিরিয়াছিলেন। ইহার একমাস পরে—১৮৬২ সনের অক্টোবর মাসে রাজযক্ষ্মায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

অল্প দিনের ব্যবধানে রামকমল ও নন্দকুমারের মৃত্যুতে অভিভাবক-হীন ভট্টাচার্য্য-পরিবারে অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়। হরপ্রসাদ কিছু দিন কাঁটালপাড়ার টোলে (বয়স তখন ১১), কিছু দিন স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনা করিবার পর ১৮৬৬ সনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীর ছাত্রাবাসে আশ্রয়লাভ করিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। এই সময় তিনি "হরপ্রসাদ" নামেই পরিচিত ছিলেন; একবার কঠিন পীড়ায় হরের প্রসাদে মুক্তিলাভ করায় 'শরৎনাথ' নামের পরিবর্ত্তে তাঁহার নামকরণ হয়—হরপ্রসাদ। কয়েক মাস পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্রাবাসটি উঠিয়া যাওয়ায় হরপ্রসাদ বৌবাজার নেবুতলা-নিবাসী গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। এখানে তিনি বাড়ীর ছেলেদের পড়াইতেন ও নিজে রাঁধিয়া খাইয়া বিদ্যালয়ে যাইতেন। এক কথায় দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের সহিত রীতিমত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইয়াছিল।

"তিনি সংস্কৃত কলেজে ৭ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে তাঁহার সমগ্র 'রঘুবংশ' মুখস্থ হইয়া যায়। এই শ্রেণীতে রামনারায়ণ তর্করত্ন 'রঘুবংশ' পড়াইতেন। এই রামনারায়ণই সুপ্রসিদ্ধ নাটুকে রামনারাণ। তাঁহার নিকটেই হরপ্রসাদ কাব্যের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিবার জ্ঞানলাভ করেন। এই শ্রেণী হইতেই এক শ্রেণী টপকাইয়া (ডবল প্রোমোশন লইয়া) ৪র্থ শ্রেণীতে উঠেন। এখানে 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ পড়েন।...এই শ্রেণীতে পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ৮৲ টাকা বৃত্তি পান। আবার এখান হইতে ডিঙ্গাইয়া

(পুনর্ব্বার ডবল প্রোমোশন লইয়া) ২য় শ্রেণীতে উঠেন।...শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেন—"My school career is more brilliant than my college career." (শ্রীগণপতি সরকার: 'হরপ্রসাদ-জীবনী,' পৃ. ৯-১০)

হরপ্রসাদ অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি তিনি কিরূপ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, ইউনিভারসিটি ক্যালেণ্ডার হইতে তাহার আভাস দিতেছি:—

ইং ১৮৭১...এন্‌ট্রান্স ...সংস্কৃত কলেজ।
১৮৭৩...এফ.এ. ...সংস্কৃত কলেজ...১৯শ স্থান।
১৮৭৬...বি.এ. ...প্রেসিডেন্সী কলেজ* ৮ম স্থান।
১৮৭৭...এম.এ. ...সংস্কৃত কলেজ; একাই সংস্কৃতে ১ম বিভাগে।

হরপ্রসাদ এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে "শাস্ত্রী" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

বিবাহ

বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া হরপ্রসাদ সবেমাত্র সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন, এই সময়—১৮৭৮ সনের মার্চ মাসে কাটোয়ার সন্নিকটস্থ দেয়াসিন গ্রামের রায় কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* ১৮৭৫-৭৬ সনের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য আছে:—"The single student [from the Sanskrit College] who passed the B. A examination is credited to the Presidency College where he was for the most part taught. He, however, won the highest 'Sanskrit College graduate' scholarship of Rs. 50 a month, the Laha scholarship of Rs. 25 a month, and the Radhakanta Deb Medal for standing first in Sanskrit at the B. A. examination."

বাহাদুরের দ্বিতীয়া কন্যা হেমন্তকুমারী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। হরপ্রসাদের বিবাহিত জীবনের ফল—পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। চতুর্থ পুত্র শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-সংসারে নিতান্ত অপরিচিত নহেন।

চাকুরী—সরকারী ও বে-সরকারী

হরপ্রসাদ কলেজ হইতে বহির্গত হইবার অল্প দিন পরেই সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন।

হেয়ার স্কুলঃ ১৮৭৮ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারি* তিনি হেয়ার স্কুলের ট্রানস্লেশন-মাষ্টার নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৮৮৩ সনের ২৪এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন।

লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজঃ হেয়ার স্কুলে ছয় মাস কাজ করিবার পর হরপ্রসাদ বিনা-বেতনে ১৩ মাসের (১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮-৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯) ছুটি লইয়া লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে একটিনি করিতে গিয়াছিলেন। বায়ু-পরিবর্ত্তনই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল ; তিনি কলিকাতায় প্রায়ই ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেন। তিনি পথিমধ্যে কর্ম্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলায় এক রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

> ১৮৭৮ সালে [কর্ম্মাটাঁড়] ষ্টেশনের পাশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক বাংলা ছিল···আমি ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ যাই এখানে আমার সর্ব্বদা ম্যালেরিয়া জ্বর হইত ; সেই জন্য

---

* History of Services of Gazetted Officers...Corrected up to July 1907 দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের সংস্কৃত প্রফেসারের [রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর] একটিনি করিতে গিয়াছিলাম।...আমরা কর্ম্মাটাঁড়ে পৌছিয়া আমাদের মালপত্র ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্বা করিয়া দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলায় গেলাম।...তিনটার পর গাড়ী পৌছিয়াছিল;—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গল্পগুজবে কাটিয়া গেল। তিনি আমার বাড়ীর প্রত্যেকের খবর নিলেন, আমিও তাঁহার অনেক খবর লইলাম। আমি লক্ষ্ণৌয়ে সংস্কৃত পড়াইতে যাইতেছি—এম-এ ক্লাসেও পড়াইতে হইবে—বিশেষ হর্ষচরিতখানা পুরা পড়াইতে হইবে—শুনিয়া তিনি একটু ভাবিত হইলেন, বলিলেন—বইটা বড় কঠিন। তিনি নিজে আট ফর্ম্মা মাত্র ছাপাইয়াছিলেন এবং তাহা পূর্ব্বেই কলিকাতায় আমায় দিয়াছিলেন। বলিলেন—বাকীটা বড় গোল। আমি বলিলাম—রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলেন—ইহার সংস্কৃত বড় কাঁচা। তিনি বলিলেন—তাই ত, রাজকুমার এত বড় পণ্ডিত হইয়াছে, যে কাঁচাপাকা সংস্কৃত চিনিতে পারে?—যাহা হউক তিনি আমাকে হর্ষচরিত ও অন্যান্য বই পড়াইবার কিছু কিছু কৌশল বলিয়া দিলেন, তাহাতে আমার বেশ উপকার হইয়াছিল।...[পরদিন] আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাহির হইলাম,...।*

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজঃ ১৮৮৩ সনের জানুয়ারি মাসে রামনারায়ণ তর্করত্ন সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার শূন্য পদে "হেয়ার স্কুলের ট্রানস্লেশন-মাষ্টার" হরপ্রসাদকে নিযুক্ত করিবার জন্য কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন শিক্ষা-বিভাগকে সুপারিশ

* শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ,' ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

করিয়াছিলেন। হরপ্রসাদের নিয়োগ সম্বন্ধে আমরা সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে পাই :—

> Asst. Professor of Rhetoric and Grammar (Class VI) at Rs, 100 per month. Transferred from the Hare School and joined in the forenoon of the 25th January 1883.

এই পদে হরপ্রসাদ পরবর্ত্তী ২৪এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

অ্যাসিষ্টাণ্ট ট্রানস্লেটর : তিনি ১৮৮৩ সনের ২৫এ সেপ্টেম্বর হইতে সরকারী অনুবাদকের সহকারীর পদে যোগদান করেন।*

বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান : ১৮৮৬ সনের জানুয়ারি মাসে হরপ্রসাদ বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জনশিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর সার্ অ্যালফ্রেড ক্রফ্ট তাঁহার উপরিওয়ালা ছিলেন; তিনি হরপ্রসাদের লিখিত বার্ষিক বিবরণগুলির বিশেষ প্রশংসা করিতেন। এই পদে হরপ্রসাদ নয় বৎসর—১৮৯৪ সন পর্য্যন্ত যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। বেঙ্গল লাইব্রেরির ১৮৯৪, অক্টোবর-ডিসেম্বরের ত্রৈমাসিক রিপোর্টেও বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান-হিসাবে তাঁহার নাম মুদ্রিত আছে; পরবর্ত্তী ত্রৈমাসিক রিপোর্টে তাঁহার নাম নাই।

প্রেসিডেন্সী কলেজ : ১৮৯৫ সনের ২৮এ ফেব্রুয়ারি† হরপ্রসাদ প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদে

---

* সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ তারিখে শিক্ষা-বিভাগকে লিখিয়াছিলেন :—"I have the honour to inform you that Pandit Hara Prasad Sastri M. A. Asst. Professor of Sanskrit Rhetoric and Grammar in this college, has left the college to join his new post as Assistant to the Bengali Translator to Government."

† *Hist. of Services of Gazetted Officers*...দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বগামী লেখকেরা ভুলক্রমে প্রেসিডেন্সী কলেজে হরপ্রসাদের নিয়োগকাল "ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অধিষ্ঠিত থাকা কালে তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় ১৮৯৬ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতে এম. এ. ক্লাস প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংস্কৃত কলেজঃ জনশিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর আলেকজাণ্ডার পেড্‌লারের (Pedler) স্থপারিশে গবর্মেণ্ট ১৯০০ সনের ৮ই ডিসেম্বর হইতে হরপ্রসাদকে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এই পদের বেতন ছিল তিন শত টাকা। ১৯০৮ সনের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত আট বৎসর স্থনামের সহিত অধ্যক্ষের কাজ করিয়া হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষতাকালে তিনি সংস্কৃতে এম. এ-পাস-করা এক দল গবেষককে সংস্কৃতে গবেষণাকার্য্যে রীতিমত শিক্ষা দান করেন। ইঁহারা অনেকেই পরে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

১৯২৪ সনে সংস্কৃত কলেজের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তাঁহার গুণমুগ্ধ জনেরা কলেজ-গৃহে তাঁহার তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বঙ্গের গবর্নর লর্ড লিটন এই তৈল-চিত্র উন্মোচিত করেন।

বুরো অব ইনফর্মেশনঃ হরপ্রসাদ সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও সরকার তাঁহাকে একেবারে ছাড়িলেন না; তাঁহারা হরপ্রসাদকে Bureau of Information for the benefit of Civil Officers in Bengal in history, religion, customs and folklore of Bengal প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার করিলেন। এই পদাধিকারে তিনি ১৯০৯ সন হইতে জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্য্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে মাসিক ১০০৲ বৃত্তি পাইতেন।

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ইহার স্থাপনাবধি হরপ্রসাদ সংস্কৃত ও বাংলা-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার

নিয়োগকাল ১৮ জুন ১৯২১। এই পদে তিনি ১৯২৪ সনের জুন মাস পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৭ সনে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. লিট্‌ (Honoris Causa) উপাধি দানে সম্মানিত করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহচর্য্য

হরপ্রসাদের বাংলা রচনার সূত্রপাত সংস্কৃত কলেজে পঠদ্দশায়। তিনি যখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র, সেই সময়ে "ভারতমহিলা" নামে প্রবন্ধ রচনা করিয়া হোলকার-পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' (১২৮২ মাঘ-চৈত্র; ইং ১৮৭৬) প্রকাশিত হয়। এই উপলক্ষেই সাহিত্য-সম্রাটের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় ঘটে। তাঁহার পৈতৃক বাসভবনের নিকটেই কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র তখন অবস্থান করিতেন। পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল। হরপ্রসাদের ভাষায়—"আমি শনিবারে বাড়ী আসিলেই, এইখানে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম। আমরা রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত ইতিহাস, সাহিত্য, পদ্য, গদ্য, নাটক, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজি, এই সকল লইয়া আলোচনা করিতাম।" পরবর্ত্তীকালে 'নারায়ণে' বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনাকালে হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার কথা এই ভাবে বিবৃত করিয়াছেন ঃ—

> আঠার-শ চুয়াত্তর সালে আমি সংস্কৃত কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি। মহারাজ হোলকার সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন। মহারাজ হোলকার একটি পুরস্কার দিয়া গেলেন। কেশববাবু বলিয়া দিলেন, সংস্কৃত কলেজের যে ছাত্র "On the highest ideal of woman's character

as set forth in ancient Sanskrit writers." একটি 'এসে' লিখিতে পারিবে, তাহাকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হইবে। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আমায় ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমিও চেষ্টা কর কলেজের অনেক ছাত্রই চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮৭৫ সালের প্রথমেই 'এসে' দাখিল করা হইল। পরীক্ষক হইলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ও বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল। লিখিতে এক বৎসর লাগিয়াছিল, পরীক্ষা করিতেও এক বৎসরের বেশীই লাগিয়াছিল। ছিয়াত্তর সালের প্রথমে আমি বি. এ. পাস করিলাম, উমেশবাবুও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ্ পাইলেন। প্রিন্সিপাল প্রসন্নবাবু মনে করিলেন সংস্কৃত কলেজের বেশ ভাল ফল হইয়াছে, সুতরাং তখনকার বাঙ্গলার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্প্‌লকে আনিয়া প্রাইজ দিলেন। সেই দিন শুনিলাম রচনার পুরস্কার আমি পাইব। সার রিচাড আমাকে একখানি চেক্ দিলেন ও কতকগুলি বেশ মিষ্ট কথা বলিলেন।

আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহাশয়েরা যে রচনা ভাল বলিয়াছেন এবং গবর্ণর সাহেব যাহার জন্য আমায় এতগুলি মিষ্ট কথা বলিয়া গেলেন, সেইখানি ছাপাইয়া দিয়া আমি কেন না একজন গ্রন্থকার হই? তার পর ভাবিলাম এম. এ. ক্লাস পর্য্যন্ত ত একরকম স্কলারশিপেই চলিয়া যাইবে। তাহার পর হঠাৎ কিছু আর চাকরি পাওয়া যাইবে না। তখন প্রাইজের ঐ কটি টাকাই আমার ভরসা। অতএব বই ছাপাইয়া ঐ কটি টাকা খরচ করা হইবে না। তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম. এ., মহাশয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি সংস্কৃত কলেজের এম. এ.—

আমার উপর তাঁহার স্নেহদৃষ্টি থাকা সম্ভব, সুতরাং তিনি তাঁহার মাসিকপত্র 'আর্য্যদর্শনে' আমার লেখাটি স্থান দিলেও দিতে পারেন। তাঁহার কাছে গেলে, খুব গম্ভীরভাবে, বেশ মুরুব্বি-আনা চালে বলিলেন, "তুমি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, রচনা লিখিয়া তুমি পুরস্কার পাইয়াছ, আমার কাগজে উহা ছাপান উচিত। কিন্তু তুমি বাপু যে সকল 'ভিউ' দিয়াছ, আমার সঙ্গে তা মেলে না। আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে আমার কাগজে উহা স্থান দিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "আমার ত মহাশয় নিজের কোন 'ভিউ' নাই। পুরাণ পুঁথিতে যা পাইয়াছি, তাই সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছি।" যাহা হোক তিনি উহা ছাপাইতে রাজী হইলেন না। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, আপাততঃ গ্রন্থকার হইবার আশা ত্যাগ করিলাম।

তাহাব পর এক দিন চাঁপাতলার ছোট গোলদীঘির ধার দিয়া বেড়াইতে যাইতেছি, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত রাস্তায় দেখা হইল। তিনি ও তাঁহার দাদা বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বেশ জানিতেন, আমাকে বেশ স্নেহ করিতেন, কিন্তু আমি তিন চারি বৎসর কাল তাঁহাদের বাড়ী যাই নাই বা তাঁহাদের কাহারও সহিত দেখা করি নাই। তিনি সে জন্য আমাকে বেশ মৃদু তিরস্কার করিলেন এবং আমাকে অতি সত্বর তাঁহাদের বাড়ী যাইতে বলিলেন। আমি তাঁহাদের বাড়ী গেলেই এই তিন চারি বৎসর কি করিয়াছি তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্রমে রচনাটির কথা উঠিলে তিনি সেটি দেখিতে চাহিলেন। আমি এক দিন গিয়া তাঁহাকে উহা দেখাইয়া আসিলাম। তাহার পর তিনি আমায় একদিন বলিলেন, "তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমি উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে পারি।" আমি বলিলাম,

"আর্য্যদর্শনে যাহা লয় নাই, বঙ্গদর্শনে তাহা লইবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না।" তিনি বলিলেন, "সে ভাবনা তোমার নয়। তুমি রবিবারের দিন নৈহাটী ষ্টেশনে অপেক্ষা করিও, আমি সেই সময়ে সেখানে পৌঁছিব।" যথাসময়ে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া বেলেব ভিতর দিয়াই বঙ্কিমবাবুর বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিলেন। পথে শুনিলেন যে তাঁরা চারি ভাই শ্যামাচরণ বাবুর বাড়ীতে বসিয়া গল্প করিতেছেন। তারের বেড়া ডিঙ্গাইলেই শ্যামাচরণ বাবুর বাড়ীব দরজা। রাজকৃষ্ণবাবু বাড়ী ঢুকিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমারও এই প্রথম প্রবেশ। রাজকৃষ্ণবাবুকে তাঁহারা খুব আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, আমিও বসিলাম। নানারূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। চার ভাইয়েরই নাম শুনা ছিল, আমি তাঁহাদের গল্পের মধ্যেই কোন্‌টি কে, চিনিয়া লইলাম। ক্রমে বঙ্কিমবাবুর দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তিনি রাজকৃষ্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কে?" তিনি বলিলেন, "এটির বাড়ী নৈহাটী, সংস্কৃত কলেজে পড়ে, এবার বি-এ. পাস করিয়াছে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্রাহ্মণ?" রাজকৃষ্ণ-বাবু বলিলেন, "হাঁ"। তখন তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৈহাটী বাড়ী, ব্রাহ্মণের ছেলে, সংস্কৃত কলেজে পড়, বি. এ. পাস করিয়াছ, আমাদের এখানে আস না কেন?" আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, "সঞ্জীববাবুর ভয়ে।" তাঁহারা সকলেই ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঞ্জীববাবু বলিলেন, "আমার ভয়? কেন?" "শুনিয়াছি কামিনীগাছের ফুল ছিঁড়িলে আপনি নাকি মারেন।" হাসির মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৈহাটী? তোমার বাবার নাম কি?" আমি বলিলাম, "৺রামকমল ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়।" তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,

"তুমি রামকমল ন্যায়রত্নের পুত্র, নন্দর ভাই, রাজকৃষ্ণ তোমাকে আমার নিকট আনিয়া আলাপ করাইয়া দিল! তোমার দাদার সঙ্গে আমার ভারি ভাব ছিল। সে আমার একবয়সী ছিল। তার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধির লোক আর দেখা যায় না"—বলিয়া তিনি দাদার সম্বন্ধে নানা গল্প বলিতে লাগিলেন। দেখিলাম, দাদার উপর তাঁহার বেশ শ্রদ্ধা ছিল। এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "হরপ্রসাদ আপনার নিকট আসিয়াছে, উহার একটু কাজ আছে।" অমনি বঙ্কিমবাবু বেশ গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন, "কি কাজ?" রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "ও একটি রচনা লিখিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে একটি প্রাইজ পাইয়াছে, আপনাকে উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে হইবে।" বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিআনা চালে বলিলেন, "বাঙ্গলা লেখা বড় কঠিন ব্যাপার, বিশেষ যারা সংস্কৃতওয়ালা, তারা ত নিশ্চয়ই 'নদনদী পর্ব্বত কন্দর' লিখিয়া বসিবে।" আমি বলিলাম, "আমার রচনার প্রথম পাতেই 'নদনদী পর্ব্বত কন্দর' আছে" বলিয়া খুলিয়া দেখাইয়া দিলাম এবং বলিলাম, "প্রথম চারিটি পাত ও সকলের শেষে আমি ঐ ভাবেই লিখিয়াছি, পরীক্ষক কে জানিয়াই আমার ঐরূপ ভাবে লেখা, কিন্তু ভিতরে দেখিবেন অন্যরূপ।" তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "নন্দের ভাই বাঙ্গলা লিখিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, যাহাই হোক আমাকে উহা ছাপাইতে হইবে।" আমি তিনটি পরিচ্ছেদ মাত্র লইয়া গিয়াছিলাম, এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে উহা দিয়া দিলাম। তাহার পর অনেক মিষ্টালাপের পর আমি বাড়ী গেলাম, রাজকৃষ্ণবাবু সেখানে রহিয়া গেলেন।...আমি আর একদিন বঙ্কিমবাবুর কাছে গেলাম। তিনি বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। আমায় দেখিয়াই

বলিলেন, "তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে। তুমি এমন বাঙ্গলা লিখিতে শিখিলে কি করিয়া ?" আমি বলিলাম, "আমি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের চেলা।"* তিনি বলিলেন, "ও! তাই বটে! নহিলে সংস্কৃত কলেজ হইতে এমন বাঙ্গলা বাহির হইবে না।" সেই মুহূর্ত্ত হইতে বুঝিলাম যে বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিআনা ভাবটা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। সেদিনকার মত গম্ভীর ভাব আর নাই। তিনি আমাকে একেবারে আপন করিয়া লইতে চাহেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদ উহার বাকী আছে, সেগুলি আপনি একবার দেখিবেন কি ?" তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই।" আমি আর একদিন তাঁহার কাছে বাকী অধ্যায় কয়টি লইয়া গেলাম। প্রথম তিন অধ্যায়ই স্মৃতি অথবা তাহার টীকা হইতে লওয়া। কিন্তু বাকীগুলি সমস্তই পুরাণ অথবা কাব্য হইতে লওয়া। এবং পুরাণ ও স্মৃতিতে যতগুলি স্ত্রীচরিত্র ছিল, সবগুলিরই সমালোচনা আছে। তিনি বেশ মন দিয়া পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া সেগুলি পড়িতে লাগিলেন। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এগুলি চলিবেক কি ?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "যাহা ছাপাইয়াছি সে রূপা, এসব কাঁচা সোণা।" বলিতে কি, সে দিন আমি ভারী খুসী হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। তাহার পর যখন নৈহাটী হইতে কলিকাতা

---

* হরপ্রসাদ যে সংস্কৃত-বিরল খাঁটি বাংলা লিখিতেন, তাহার মূলে সংস্কৃত কলেজের "লেক্‌চারার" শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির প্রভাব বড় কম ছিল না। শ্যামাচরণ ১৮৬৭ সনের ১২ই আগষ্ট ১৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-বিভাগের "লেক্‌চারার" নিযুক্ত হন। ১৮৭৭ সনের 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রে প্রকাশিত তাঁহার "Bengali Written and Spoken" প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শনে' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫) বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

যাতায়াত করিতাম, তখন প্রায় প্রত্যহই তাঁহার কাছে যাইতাম। যখন কলিকাতায় বাসা থাকিত, তখন শনি-রবিবার বৈকালে তাঁহার কাছে যাইতাম।··

বঙ্গদর্শন তিন বৎসর নয় মাস বাহির হইয়াছিল। আমার ভারত-মহিলা লইয়া বাকী তিন মাস পূর্ণ হয়। চারি বৎসরের পর তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা ছাড়িয়া দেন।···বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালে সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতায় আবার বাহির হয়। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কার্য্যতঃ বঙ্গদর্শনের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তিনি নিজে ত লিখিতেনই, অন্য লোকের লেখা পছন্দ করিয়া দিতেন, অনেককে বঙ্গদর্শনে লিখিবার জন্য লওয়াইতেন, অনেকের লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন। পূর্ব্বেও তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে যেমন চলিত, বঙ্গদর্শন এখনও তেমনি চলিতে লাগিল। নূতন বঙ্গদর্শনে নূতনের মধ্যে আমি, আমি প্রায়ই লিখিতাম, কিন্তু কখনও নাম সই করি নাই। সেই জন্য এখন সেই সকল লেখা যে আমার, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইয়াছে।

নূতন বঙ্গদর্শন বাহির হইবার প্রায় বছরখানেক পরে আমি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি এবং সেখানে এক বৎসর থাকি।···লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া আমি কাঁটালপাড়ায় গিয়া দেখি বঙ্কিমবাবু সেখানে নাই। শুনিলাম তিনি চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন।···সেই দিনই বৈকালে চুঁচুড়ায় গেলাম···হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তিনি খুব খুসী হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি ত চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন, ইহার ভিতরে কি কিছু 'কৃষ্ণকান্তী' আছে?" তিনি বলিলেন, "তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি বড় খুসী হইলাম, তোমার কাছে আমার বেশী কৈফিয়ৎ দিতে হইল না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "লক্ষ্ণৌ হইতে

আমি বঙ্গদর্শনের জন্য যে কয়টি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম, পড়িয়াছেন কি ?" তিনি বলিলেন, "তুমি যেটির কথা মনে করিয়া বলিতেছে, সেটি কোন জার্ম্মান পণ্ডিতের লেখা বলিয়া মনে হয়।" আমি আর কিছু বলিলাম না। সে প্রবন্ধটির নাম "বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি" —অর্থাৎ তিন জন কবির বহি কলেজের ছাত্রেরা খুব আগ্রহের সহিত পড়ে, এবং এই তিন জন কবির কথা লইয়াই তাহারা আপনাদের 'চরিত্র গঠন করে'—সেই তিন জন কবি বাইরন্, কালিদাস ও বঙ্কিমচন্দ্র।" ('নারায়ণ,' বৈশাখ ১৩২২)

১২৮২ সাল (ইং ১৮৭৬) হইতে ১২৯০ সাল (ইং ১৮৮৩) পর্য্যন্ত— প্রায় আট বৎসরের মধ্যে হরপ্রসাদের বহুবিধ রচনা 'বঙ্গদর্শনে' স্থান লাভ করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন :—

"তিনি আমাকে লিখিতে সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন। বঙ্কিমবাবুর উপর তখন আমার এরূপ টান যে, প্রতি মাসেই তাঁহাকে এক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিতাম। প্রবন্ধ লিখিয়া নাম করিব, এ মতলব আমার একেবারেই ছিল না, সে জন্য কখনও প্রবন্ধে নাম সহি করিতাম না। একটা ইচ্ছা ছিল—হাত পাকাইব, আর এক ইচ্ছা—বঙ্কিমবাবুকে খুসী করিব। তিনি যদি কখন কোন প্রবন্ধের প্রশংসা করিতেন, তাহাতে হাতে স্বর্গ পাইতাম।" ('নারায়ণ,' আষাঢ় ১৩২৫)

শুধু বঙ্কিমচন্দ্রকে খুসী করিবার ও হাত পাকাইবার জন্য 'বঙ্গদর্শনে' প্রবন্ধ লিখিতেন, এইরূপ উক্তি করিয়া হরপ্রসাদ অত্যধিক বিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সেই বয়সেই স্বদেশ, সমাজ ও মাতৃভাষার উন্নতির জন্য চিন্তা করিতেন। তাঁহার চিন্তার প্রকৃতি মোটেই গতানুগতিক ছিল না; বরং অনেকগুলি প্রবন্ধকে বিদ্রোহাত্মক বলা

যাইতে পারে। আজ সেই প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইয়া দেখিতেছি, হরপ্রসাদের কি অসাধারণ দূরদর্শিতা ছিল। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে 'বাঙ্গালা সাহিত্য—বর্ত্তমান শতাব্দীর' (ফাল্গুন ১২৮৭) ও 'বাঙ্গালা ভাষা' (শ্রাবণ ১২৮৮) এইরূপ উল্লেখযোগ্য রচনা। আমাদের শিক্ষার গলদ সম্বন্ধে তিনিই সর্ব্বাগ্রে সচেতন হইয়াছিলেন। "কালেজী শিক্ষা" (ভাদ্র ১২৮৭) নামক প্রবন্ধে তিনি যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহার সত্যতা চিন্তাশীল শিক্ষাবিদেরা আজ উপলব্ধি করিতেছেন। মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত, এই মত তিনি বহু পূর্ব্বে জোরের সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সমগ্র প্রবন্ধটি সর্ব্বত্র পুনঃপ্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা সামান্যই উদ্ধৃত করিতেছে :—

"যদি নিজ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে অনেকটা সহজে হয়। তাহা না হইয়া এক অতি কঠিন অতি দূরবর্ত্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই। শুদ্ধ সেই ভাষাটি মোটামুটি শিখিতে রোজ চারি ঘণ্টা করিয়া অন্ততঃ আট দশ বৎসর লাগে। ভাষা শিক্ষাটি অথচ কিছুই নহে, ভাষাশিক্ষা কেবল অন্য ভাল জিনিস শিখিবার উপায়—উহাতে শিখিবার পথ পরিষ্কার হয় মাত্র—সেই পথ পরিষ্কার হইতে এত সময় ব্যয় ও এত পরিশ্রম। তবুও কি সে ভাষা বুঝা যায়? তাহার যো কি! বাঙ্গালা হইলে এই কেতাবী জিনিসই আমবা কত অধিক পরিমাণে শিখিতাম। ইংরেজীতে আমবা কথন বথা কহি না। এখন আমরা ইংরেজীতে চিঠি-পত্রও বড লিখি না, অথচ আমাদের জ্ঞান-উপার্জ্জনের একমাত্র দ্বার ইংরেজী। ইংরেজী আমাদের বাজভাষা। যাঁহারা ইংরেজের সংসর্গে আসিবেন তাঁহাদের ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন। তাই বলিয়া

ছয় কোটী ছষট্টি লক্ষ লোক ইংরেজী পড়িয়া মরিবে কেন? বলিবে, ইংরেজ যখন রাজা, সকলেই কোন না কোন সময়ে ইংরেজের সংসর্গে আসিবেন। স্বীকার। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা কর, ভাল করিয়াই শিক্ষা কর। ইংরেজীতে অঙ্ক কসিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে ইহার অর্থ কি? বাঙ্গালা দিয়া ইংরেজী শিখ না কেন? ইংরেজী দিয়া শাস্ত্র শিখিতে যাও কেন? আরও অধিক দুঃখের কথা এই যে, আমাদের সংস্কৃত শিখিতে হইলেও ইংরেজীমুখে শিখিতে হয়।

যেরূপ চলিতেছে ইহাতে জ্ঞান অল্প হয়, ইংরেজী শিক্ষা অল্প হয় আর পরিশ্রম অনন্ত করিতে হয়। আর শিক্ষিতদিগের সহিত অশিক্ষিতের মনোমিল থাকে না; শিক্ষিতগণ যেন একটি নূতন জাতি হইয়া দাঁড়ান। অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শ্রম করিয়া অতি অল্প জ্ঞানলাভ হয়।

যাও বা শিখি তাহাও শিখিবার জন্য শিখি না; জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য শিখি না। শিখি এক্‌জামিন পাশ করিবার জন্য। আচ্ছা করিয়া পড়ি; যেমন প্রশ্ন দিক ঠকাইতে পারিবে না এজন্য পড়ি না, কেমন প্রশ্ন দিবে বাছিয়া বাছিয়া তাহাই পড়ি, অনেক সময়ে মাষ্টার মহাশয়েরাও তাহাই পড়ান। ইহার এক ফল এই যে, যখন এক্‌জামিন নাই তখন পড়ি না, এক্‌জামিনের সময় রাত দিন পড়ি। লাভ এই হয় কতকগুলো গুরুপাক জিনিস উদরস্থ হয়, সব হজম হয় না। রাত জেগে যাহা পাঠ করা গেল, তাহা মাসখানেকের মধ্যে ভুলিয়া যাই।

অতএব লেখাপড়ার যে উদ্দেশ্য—মনোবৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি—তাহা একেবারেই হয় না। যে চিন্তাশক্তিবলে শিক্ষিত-

দিগের দ্বারা সমাজের উপকার হইবে, তাহা হয় না। চিন্তা করিবার শক্তি নাই অথচ জ্ঞান আমি বড় বুঝি, ইহার অনেক দোষ, কালেজী শিক্ষায় সে দোষগুলি সমুদয়ই ঘটে। যদিও চিন্তাশক্তি দুই চারি জনের জন্মে তাহাও শূন্যের উপরে। যদি এরূপ হইত, তবে এইরূপ ফল হইত। কিন্তু চিন্তা abstract-এর উপর। যাহা আছে তাহার উপর নহে। যাহাই হউক, তবুও চিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত হইলেই সেটি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহা ত হয় না।

অতএব কালেজী শিক্ষায় চিন্তাশক্তি উত্তেজিত হয় না, উহা শুদ্ধ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্য, এজন্য উহাতে জ্ঞান-অর্জ্জন হয় না। জ্ঞান-অর্জ্জন একটু আধটু হইলেও ইংরেজীমুখে অর্জ্জন করিতে হয় বলিয়া সেই একটুকুতেই অনেক শ্রম লাগে, যাহা শিখি তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তিও দুই পাঁচটির মাত্র চালনা হয়, হৃদয়বৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তির কিছুই হয় না। কোন একটি বিষয়ও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা হয় না; অতএব উহা দ্বারা পরিণামে যে করিয়া খাইবে তাহাও হয় না। কালেজে না একমুখী শিক্ষা হয়, না সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা হয়।"

হরপ্রসাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও মতামত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবান্ হইয়াও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহিত্য-যশঃপ্রার্থী হরপ্রসাদের তরুণ চিত্তে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব বড় কম ছিল না; তাঁহার চিন্তা ও রচনা-ভঙ্গীর ছাপ হরপ্রসাদের কোন কোন প্রাথমিক রচনায় পরিস্ফুট। পরবর্ত্তী কালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাকালে সভাপতি হিসাবে হরপ্রসাদ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি নিজেকে বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্যরূপে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; তিনি বলিয়াছিলেন:—"তিনি জীবনে আমার Friend, Philosopher and Guide ছিলেন। তিনি এখন

উপর হইতে দেখুন যে, তাঁহাব এই শিষ্যটি এখনও তাঁহার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত।" ('মাসিক বসুমতী,' ভাদ্র ১৩২৯)

এশিয়াটিক সোসাইটির কর্ম্মক্ষেত্র

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই হরপ্রসাদ সে-যুগের অপর এক শ্রেষ্ঠ মনীষীর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইনি—প্রবীণ পুরাতত্ত্ববিৎ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ইঁহারই সাহচর্য্যে কলিকাতায় হরপ্রসাদের প্রকৃত কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল; তিনি প্রধানতঃ পুরাতত্ত্ব-চর্চায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।*

হরপ্রসাদ লিখিয়া গিয়াছেন, ১৮৭৮ সনে রাজেন্দ্রলাল প্রথমে তাঁহাকে গোপালতাপনী উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ করিতে বলেন। এই সময়ে রাজেন্দ্রলাল নেপাল হইতে আনীত সংস্কৃতে লিখিত বহু বৌদ্ধ পুথির বিবরণমূলক তালিকা প্রস্তুতকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পুথিগুলির বিবরণের ইংরেজী অনুবাদ তাঁহারই সম্পন্ন করিবার কথা, কিন্তু দীর্ঘকাল অসুস্থ হইয়া পড়ায় হরপ্রসাদের সাহায্য চাহিয়াছিলেন।

---

* রমেশচন্দ্র দত্ত সায়নের ভাষ্য অবলম্বনে ১৮৮৫ সনে ঋগ্বেদের যে অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার ভূমিকায় লিখিয়া গিয়াছেন:—"এই প্রণালীতে অনুবাদ কার্য্য সম্পাদন করিবার সময় আমি আমার সুহৃদ্ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। হরপ্রসাদবাবু সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র-সমূহে কৃতবিদ্য,—তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ও শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত অনেক প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি এই বৃহৎ কার্য্যে প্রথম হইতে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এ গুরু কার্য্য সমাধা করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।"

সনে সোসাইটির "আজীবন" সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়া পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্য অতীব যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ১৯১০ সনে সোসাইটি তাঁহাকে "ফেলো" এবং ১৯১৯-২০ ও ১৯২০-২১ সনে উপর্য্যুপরি দুই বার সভাপতির পদে বরণ করিয়া গুণেরই সমাদর করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রলালের উপর এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি-সংগ্রহের ভার ছিল। ১৮৭০ সন হইতে তিনি বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত পুথির বিবরণ সোসাইটির আনুকূল্যে *Notices of Sanskrit Mss.* নামে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহার ১০ম খণ্ড, ১ম ভাগ (ইং ১৮৯০) প্রকাশিত হইবাব অল্প দিন পরে ১৮৯১, ২৬এ জুলাই তাঁহার দেহান্ত হয়। হরপ্রসাদই ১০ম খণ্ডের শেষার্দ্ধ বা ২য় ভাগ সঙ্কলন ও প্রকাশ করেন (ইং ১৮৯২)। সমগ্র দশ খণ্ডের সূচীও তাঁহারই কৃত। রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষ ১৮৯১ সনের জুলাই মাসেই হরপ্রসাদকে পুথি-সংগ্রহ কার্য্যের পরিচালক (Director of the Operations in search of Sanskrit Mss.) পদে অভিষিক্ত করেন। তদবধি প্রায় সারা জীবনই তিনি পুথি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে ভারতের বিভিন্ন স্থান ও বিদ্যাকেন্দ্রগুলি পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে; এমন কি, নেপালের মত প্রত্যন্ত প্রদেশেও তিনি একবার নহে—চারি বার গমন করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু দুর্লভ পুথি তিনি নেপালে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যের ব্যাপকতা ও বিশালতা উপলব্ধি করা যায়—সোসাইটির সেক্রেটরীকে প্রদত্ত পুথি-সংক্রান্ত তাহার রিপোর্টগুলি হইতে, এগুলি নানা তথ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ। এই সকল রিপোর্টেব মধ্যে আমরা এই কয়খানির সন্ধান পাইয়াছি :—

1892. Report of the Operations in search of Sanskrit Mss. (Sep. 1888—1891), 8 pp.*

1895. Do. (1892—Nov. 1894), 20 pp.*

1901. Rep. on the search of Sanskrit Mss (1895—1900), 25 pp.

1905. Do. (1901—1902 to 1905—1906), 18 pp.

1911. Do. (1906—1907 to 1910—1911), 10 pp.

হরপ্রসাদের পুথি-সংগ্রহকার্য্যে পারদর্শিতা ও পুরাতত্ত্বে বহুজ্ঞতার কথা সরকারের অবিদিত ছিল না। এই জন্য ১৯০৮ সনে অক্সফোর্ড হইতে আগত প্রাচ্যবিৎ ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব যখন উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন, তখন তাঁহার সাহায্যকল্পে সহযাত্রী হইবার জন্য হরপ্রসাদই অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে হরপ্রসাদ অক্সফোর্ডে ম্যাক্সমূলর-স্মৃতিভবনের জন্য বহু দুষ্প্রাপ্য বৈদিক পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে আরও প্রায় ৭ হাজার দুর্লভ প্রাচীন পুথির সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে ক্রয় করিতে পারেন নাই; ১৯০৮, ফেব্রুয়ারি মাসে এই পুথি-সংগ্রহ দেখিয়া ম্যাকৃডোনেল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির তৎকালীন চ্যান্সেলর লর্ড কার্জনের নিকট আবেদন জানাইতে বিলম্ব করেন নাই। কার্জন নেপালের মহারাজাকে তার করেন। মহারাজা অক্সফোর্ডের বড্‌লিয়ান লাইব্রেরিকে উপহার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহারই অর্থে হরপ্রসাদকে পুথিগুলি ক্রয় করিতে বলেন। হরপ্রসাদ এই সকল পুথির তালিকা প্রণয়ন ও যথাস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড কার্জন হরপ্রসাদকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য :—

* এই দুইটি রিপোর্ট ১০ম খণ্ড, ২য় ভাগ ও ১১শ খণ্ড *Notices of Sanskrit Mss* -এর সহিত মুদ্রিত হইয়াছে।

1, Carlton House
Terrace, S. W.
5th January, 1910

My Dear Sir,

I have heard from Oxford of the invaluable part that you have played in arranging for the purchase, the cataloguing and the despatch to England, of the wonderful collection of Sanskrit manuscripts, which Maharaja Sir Chandra Shumshere Jung of Nepal has so generously presented to the Bodleian Library ; and I should like both as a former Viceroy and Chancellor of the University to send you a most sincere line of thanks for the great service which your erudition, good will and indefatiguable exertion have enabled you to render to us.

With the best wishes for the New year and with the hope that scholars like yourself may never be wanting in India.

I am,
Yours faithfully,
CURZON OF KEDDLESTON.

১৯০৯, ফেব্রুয়ারি মাসে এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিল রাজপুতানা ও গুজরাটে ভাট ও চারণ কবিদিগের পুথিগুলি অনুসন্ধান করিবার জন্য হরপ্রসাদের শরণাপন্ন হন। এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রথমে সার্ জর্জ গ্রীয়ার্সন ১৯০৪ সনে তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জনকে সচেতন করেন। কিন্তু চারি বৎসরের মধ্যে পত্রলেখালেখি ছাড়া পরিকল্পনাটি কার্য্যকর হয় নাই। এই কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হরপ্রসাদের চারি বৎসর লাগিয়াছিল। এ-বিষয়ে ১৯১৩ সনে তিনি সোসাইটিকে যে *Preliminary Report* on *the Operation in Search of Mss. Bardic Chronicles* দাখিল করেন, তাহাতে প্রকাশ :—

I have made three tours in Rajputana visiting some of the capitals and ancient towns therein and in Gujerat. I have submitted four Progress Reports since 1909 to the Society and I am

now submitting a General Report of my work for the last four years. In the first year I visited Jaipur, Jodhpur and Baroda. In the third year, I visited Jaipur, Jodhpur and Bikanir, and in the fourth, I visited Bharatpur, Bundi. Ujjain, Mandasore, Ajmere, Jodhpur and Bilad i.

উল্লিখিত চারিখানি Progress **Report**-এর সারাংশ সোসাইটির ১৯১০-১৪ সনের বার্ষিক বিবরণমধ্যে স্থান পাইয়াছে। রিরোর্টগুলি স্বতন্ত্রভাবেও মুদ্রিত হইয়াছিল, অন্ততঃ একখানির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; উহা—*Report of a Tour in Westeru India in Search of Mss. of Bardic Chronicles.* 6pp. এই সকল রিপোর্ট রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্ম ও সাহিত্য বিষয়ে রাজপুতানার ইতিহাসে নূতন আলোকপাত করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ১৩২১ সালে বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত হরপ্রসাদের "হিন্দুর মুখে আরঙ্গেবের কথা" প্রবন্ধটি পঠিতব্য।

কিন্তু কেবলমাত্র পুথি সংগ্রহ করিয়াই হরপ্রসাদ তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই। তিনি তৎকর্ত্তৃক পরীক্ষিত নানা স্থানের এবং নেপাল-দরবারের পুথিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী সহ তালিকা প্রস্তুত কার্য্যেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদনায় এই তালিকাগুলি প্রকাশিত হয়:—

Notices of Sanskrit Mss.

1892 :	First series :	Vol. X (2nd part).
1895 :		Vol. XI (Indices).
1898-1900 :	Second series :	Vol. I. pp. 432.
1898-1904 :		II. ,, 228.
1904-1907 :		III. ,, 253.
1911 :		IV. ,, 265.

1905. *A Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Mss. belonging to the Darbar Library, Nepal* Vol. I. (with a Historical Introduction by Cecil Bendall.)

1915. Do. Vol. II.

1915. *Catalogue of Manuscripts in the Bishop's College Library. Calcutta* (Under orders of the Government of Bengal.)

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনাকালে হরপ্রসাদের প্রচুর অবসর ছিল; তিনি সোসাইটির কার্য্যে—বিশেষ করিয়া পুথি-সংগ্রহ ও পুথি-সংরক্ষণ কার্য্যে যথেষ্ট সময় দিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হওয়া অবধি তাঁহার অবসর একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। তিনি দুঃখের সহিত সোসাইটিকে লিখিয়াছিলেন:— "My appointment to the Principalship of the Sanskrit College was rather unfortunate for my literary and scientific work." অগত্যা নিরলস কর্ম্মী হরপ্রসাদকে কলেজের ছুটির দিনগুলি দূরবর্ত্তী স্থানে পুথি-সংগ্রহ কার্য্যে অতিবাহিত করিতে হইত। ১৯০৮ সনের শেষ ভাগে সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি সত্যই স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি সোসাইটির কাউন্সিলের নিকট প্রস্তাব করেন যে, সোসাইটির গৃহে যে-সকল পুথি রক্ষিত আছে, তাহার একটি বিস্তৃত তালিকা—**Descriptive Catalogue** সঙ্কলন করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন। এই প্রস্তাবে সোসাইটি যে কেবল সম্মত হইয়াছিলেন তাহা নহে, এই কার্য্যের জন্য মাসিক দুই শত টাকা বৃত্তি দিবারও ব্যবস্থা

করিয়াছিলেন।* এই সময়ে সোসাইটির গৃহে পুথির সংখ্যা ছিল—১১,২৬৪ খানি ; ইহার মধ্যে ৩১৫৬ খানি রাজেন্দ্রলাল কর্ত্তৃক ও বাকী ৮১০৮ খানি হরপ্রসাদ কর্ত্তৃক ক্রীত। এ সম্বন্ধে হরপ্রসাদ লিখিয়াছেন :—

> This is the first of a long series of volumes of a descriptive catalogue of Sanskrit manuscripts belonging to the Government collection in the Asiatic Society's Rooms.—collected since the institution of the Search of Sanskrit Manuscripts under the order of Lord Lawrence's Government in 1868. The number of the collection stands at present at 11, 264 ; of these 3,156 were collected by my illustrious predecessor Raja Rajendralal Mitra, LL. D, C. I. E., and the rest by my humble self. Besides Sanskrit, it has manuscripts in Prakrit, Hindi, Marwari, Marhatti, Newari, and Bengali. But these form an insignificant part of the whole. The works relate to orthodox Hinduism, Buddhism of various yanas, Jainism of various schools. Vaisnavism. Saivaism, Tantrism and other systems of sectarian Hinduism. The various

* এই বৃত্তি সম্বন্ধে এশিয়াটিক সোসাইটির নথিপত্রে প্রকাশ :—

"Since 1909 Mm. Haraprasad Shastri has been in receipt of an allowance of Rs. 300. Of this Rs. 100 was debited under the head Salary of Officer in charge of Bureau of Information, and Rs. 200 under the head Sanskrit Mss. Fund. The Shastri was proposed as President in 1918 and elected in February, 1919. It was thought desirable that a President should not be in receipt of emoluments from the Society, The Shastri waived his claims to a remuneration during his term of Presidency which lasted during 1919 and 1920. In 1921 he was appointed a Professor in the Dacca University and he again waived any claim to receipt of the old allowance (his letters of 17th May and 7th June, 1821) till the termination of his appointment, end June 1924. He offered to continue his work on the Catalogue gratuitously and to let the Government grants accrue during this period to be utilised for expenditure on printing." ('হরপ্রসাদ-জীবনী,' পৃ. ১১৪)

branches of the knowledge of the Hindus are well represented in this collection. Manuscripts are writen in various scripts, Bengali, Devanagari, Udiya, Marwari, Kasmiri, Newari—both ancient and modern. Some of the ancient manuscripts go so far back as the 9th century A D. There is one unique manuscript in ancient Bengali hand, copied undoubtedly in the last years of the 10th century. There are numerous manuscripts, dated in the 11th century. The subsequent centuries are very well represented ......Besides unique manuscripts which open up vast vistas of research in history, religion and sciences of ancient India, whole literatures are revealed in this collection. For instance, there are numerous works of Vajrayana, Mantrayana, Kalacakrayana to be found here, which throw a flood of light on those later phases of Buddhism which developed out of the Mahayana system. But for these works, these phases of the religion would have remained only a name. (*A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Government Collection under the care of the Asiatic Society of Bengal.* Vol I Preface)

হরপ্রসাদ Descriptive Catalogue-এর সমগ্র অংশ সম্পাদন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার জীবিতকালে এই কয় খণ্ড, তথ্যপূর্ণ মুখবন্ধ সহ, প্রকাশিত হইয়াছিল :—

ইং ১৯১৭ : ১ম খণ্ড—বৌদ্ধ সাহিত্য
১৯২৩ : ২য় খণ্ড—বৈদিক সাহিত্য
১৯২৫ : ৩য় খণ্ড—স্মৃতি
১৯২৩ : ৪র্থ খণ্ড—ইতিবৃত্ত ও ভূগোল
১৯২৮ : ৫ম খণ্ড—পুরাণ
১৯৩১ : ৬ষ্ঠ খণ্ড—ব্যাকরণ ও অলঙ্কার

এই তালিকার অপরাপর খণ্ডের পাণ্ডুলিপি হরপ্রসাদেরই তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছিল ; এগুলি সোসাইটি কর্তৃক ক্রমশঃ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইতেছে। ইতিমধ্যেই

ইং ১৯৩৪ : ৭ম খণ্ড—কাব্য
১৯৩৯-৪০ : ৮ম খণ্ড – তন্ত্র (দুই ভাগ)
১৯৪১ : ৯ম খণ্ড—দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য
১৯৪৫, '৪৮ : ১০ম খণ্ড—জ্যোতিষ (দুই ভাগ)

মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বাকী কেবল—দর্শন, জৈন সাহিত্য, বৈদ্যক ও বিবিধ। ডক্টর সুশীলকুমার দে যথার্থই লিখিয়াছেন:— "কেবল সংখ্যায় ও বিষয়-বৈচিত্র্যে নহে, বহু অজ্ঞাত ও দুর্লভ পুথির আবিষ্কারেও হরপ্রসাদের এই সংগ্রহ আজ পৃথিবীর অন্যান্য বৃহৎ সংগ্রহের সমকক্ষ; এবং ইহাই হরপ্রসাদের পণ্ডিতোচিত জীবনের একটি বিরাট্ ও অবিনশ্বর কীর্ত্তি। একটি জীবনের পক্ষে এই বৃহৎ প্রচেষ্টাই পর্য্যাপ্ত।"

কিন্তু হরপ্রসাদের নিকট ইহা পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হয় নাই। তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত কতকগুলি দুর্লভ সংস্কৃত পুথি প্রধানতঃ এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন; সেগুলি—

ইং ১৮৮৮-৯৭ : বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ (বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা, নং ১২০)

১৮৯৪-১৯০০ : বৃহৎ স্বয়ম্ভু পুরাণ (বি. ই. নং ১৩৩)
(নেপালের স্বয়ম্ভূক্ষেত্রের বিবরণ-সম্বলিত বৌদ্ধপুরাণ)

১৮৯৮ : 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ' (জর্নাল ১৮৯৮)

১৯০৪ : আনন্দভট্ট-কৃত 'বল্লালচরিত' (বি. ই. নং ১৬৪)

১৯১০ : সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' (মেমোয়ার, ৩য় খণ্ড, নং ১)

১৯১০ : রত্নকীর্ত্তি, পণ্ডিত অশোক ও রত্নাকরশান্তি-রচিত ৬
খানি বৌদ্ধ ন্যায়ের পুথি (বি. ই. নং ১৮৫)

১৯১০ : অশ্বঘোষ-কৃত 'সৌন্দরনন্দ' কাব্য (বি. ই. নং ১৯২)

১৯১০ : কুমায়ুন-রাজ রুদ্রদেব-কৃত বাজপক্ষী-শিকার সম্বন্ধীয়
'শ্যৈনিক-শাস্ত্র,' ইংরেজী অনুবাদ সহ (বি. ই. নং ১৯৩)

১৯১৪ : আর্য্যদেব-কৃত 'চতুঃশতিকা' (মেমোয়ার, ৩য় খণ্ড, নং ৮)

১৯২৭ : 'অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ' (গায়কবাড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, নং ৪০)

এই সকল সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' ও আর্য্যদেবের 'চতুঃশতিকা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"তিনি কেবল প্রাচ্যবিদ্যার সংগ্রাহক বা ভাণ্ডারী ছিলেন না, এই বিদ্যার আহরণে ও সদ্ব্যবহারেও অসীম উৎসাহী ছিলেন। এই পুথিগুলি অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধ ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনেকগুলি নূতন গ্রন্থ সম্পাদন এবং বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।·· প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, ধর্ম্ম, ইতিবৃত্ত ও সংস্কৃতির কোন দিকৃই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই; এবং পঞ্চাশ বৎসরের অধিককালব্যাপী পরিশ্রম, আলোচনা ও বহুদর্শনের পরিণত ফল এই পুস্তক ও প্রবন্ধগুলির বহু সহস্র পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রধান আসক্তি ছিল দুইটি বিষয়ে—মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্যের আলোচনা এবং নানা দিক দিয়া কালিদাসের গ্রন্থাবলির গুণগ্রাহিতা।···প্রাচীন লিপি ও শিলালেখ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যুৎপত্তির পরিচয় *Epigraphia Indica* প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ পত্রিকায় পাওয়া যাইবে।···পথিকৃৎ হিসাবে এবং প্রাচীন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কারের জন্য প্রকৃত পণ্ডিত-সমাজে এই জ্ঞান-তপস্বীর মর্য্যাদা কোন কালে ক্ষুণ্ণ হইবার নহে। তিনি সাধারণ পণ্ডিত বা সাধারণ অধ্যাপক ছিলেন না। পশ্চিম-ভারতে যেমন রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, পূর্ব্ব ও উত্তর-ভারতে তেমনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচ্যবিদ্যার আধুনিক গবেষণার মূল পত্তন করিয়াছিলেন।·· তাঁহার সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা বলিয়াছিলেন: He, of all people, has been the real father of Oriental Research in North India." (ডঃ সুশীলকুমার দে: 'শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা,' ১৩৫৫)

সাহিত্য-পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের দেহান্ত হইলে বাংলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার পুঁথি খোঁজার ভার পড়ে হরপ্রসাদের উপর—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই উপলক্ষ্যে তিনি ক্রমশঃ প্রাচীন বাংলা পুঁথি সম্বন্ধেও সচেতন হন। ইহার কারণ সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

> যখন প্রথম চারি দিকে বাঙ্গালা স্কুল বসান হইতেছিল এবং লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, চরিতাবলী, কথামালা পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিতেছিল, তখন তাহারা মনে করিয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা। কারণ, তাহারা ইংরাজীর অনুবাদ মাত্র পড়িত, বাঙ্গালা ভাষার যে আবার একটা সাহিত্য আছে এবং তাহার যে একটা ইতিহাস আছে, ইহা কাহারও ধারণাই ছিল না। তার পর শুনা গেল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রামমোহন রায় ও গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালার অনেক বিচার করিয়া গিয়াছেন এবং সেই বিচারের বহিও আছে। ক্রমে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস ছাপা হইল। তাহাতে কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন কবির বিবরণ লিখিত হইল। বোধ হইল, বাঙ্গালা ভাষায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে খানকতক কাব্য লেখা হইয়াছিল ; তাহাও এমন কিছু নয়, প্রায়ই সংস্কৃতের অনুবাদ। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দেখাদেখি আরও দুই চারিখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস বাহির হইল, কিন্তু সেগুলি সব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাঁচেই ঢালা। এই সকল ইতিহাস সত্ত্বেও খৃষ্টাব্দের ৮০ কোটায় লোকের ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালাটা

একটা নূতন ভাষা, উহাতে সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না, অনুবাদ ভিন্ন উহাতে আর কিছু চলে না, চিন্তা করিয়া উহাতে নূতন বিষয় লিখা যায় না, লিখিতে গেলে কথা গড়িতে হয়, নূতন কথা গড়িতে গেলে হয় ইংরাজি, না হয় সংস্কৃত ছাঁচে ঢালিতে হয়, বড় কটমট হয়।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এইরূপ মনের ভাব লইয়া আমি বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হইলাম, কিন্তু সেখানে গিয়া আমার মনের ভাব ফিরিয়া গেল। কারণ, সেখানে গিয়া অনেকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে পাই। সে কালের ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণবদের একেবারে দেখিতে পারিত না। বিশেষ চৈতন্যের দলের উপর তাহাদের বিশেষ দ্বেষ ছিল। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের বাড়ী বৈষ্ণবের বহি একেবারে দেখা যাইত না। নৈয়ায়িকেরা ত আরও চটা ছিল। সুতরাং আমার অদৃষ্টে বৈষ্ণবদের বহি একেবারে পড়া হয় নাই। বেঙ্গল লাইব্রেরিতে আসিয়া দেখিলাম, বৈষ্ণবদের অনেক বহি ছাপা হইতেছে; শুধু গানের বহি আর সঙ্কীর্ত্তনের বহি নয়, অনেক জীবনচরিত ও ইতিহাসের বহিও ছাপা হইতেছে। বাঙ্গালা দেশে যে এত কবি, এত পদ ও এত বহি ছিল, কেহ বিশ্বাস করিত না। তাই ১৮৯১ সালে কম্বুলেটোলার লাইব্রেরির বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে একটি প্রবন্ধ পড়ি। ঐ প্রবন্ধে প্রায় ১৫০ জন কবির নাম এবং তাহাদের অনেকের জীবন-চরিত ও তাঁহাদের গ্রন্থের কিছু কিছু সমালোচনা করি। সভায় গিয়া দেখি, আমিও যেমন বাঙ্গালা সাহিত্য ও তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে বড় কিছু জানিতাম না, অধিকাংশ লোকই সেইরূপ, বাঙ্গালায় এত বহি আছে শুনিয়া

সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, অথচ আমি যে সকল বহির নাম করিয়াছিলাম, তাহা প্রায় সকলই ছাপা বহি, কলিকাতায়ই কিনিতে পাওয়া যাইত। একজন সমালোচক বলিলেন,—"আমি প্রবন্ধ সমালোচনা করিব বলিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সব কয়খানি ইতিহাস পড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমি এ প্রবন্ধ সামালোচনা করিতে পারিলাম না।" আর একজন প্রসিদ্ধ লেখক ঢাকা হইতে লিখিয়াছিলেন,—'আমি যেন একটা নূতন জগতে প্রবেশ করিলাম।'

এই সকল সমালোচনায় উৎসাহিত হইয়া আমি ভাবিলাম, যদি ছাপা পুথির উপর প্রবন্ধেই এত নূতন খবর পাওয়া গেল, হাতের লেখা পুথি খুঁজিতে পারিলে না জানি কত কি নূতন খবর দিতে পারিব। সুতরাং বাঙ্গালা পুথি খোঁজার জন্য একটা উৎকট আগ্রহ জন্মিল।

১৮৯৪ সন হইতে বাংলা পুথির অন্বেষণ কার্য্য আরম্ভ হয়। এই বৎসরের রিপোর্টে হরপ্রসাদ লিখিয়াছেন:—"The work of searching Bengali Mss. has only commenced." বাংলা পুথি খোঁজার প্রথম ও প্রধান সুফল একটি বাংলা প্রবন্ধের আকারে লাভ করেন—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পরিষদের জন্ম ১৮৯৪ সনের ২৯এ এপ্রিল তারিখে; প্রাচীন বাংলা পুথি সংগ্রহ ও প্রকাশ ইহারও উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই কারণে হরপ্রসাদ প্রতিষ্ঠানটির সহিত যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ১৩০৩ সালের ২রা চৈত্র (১৮৯৭, ১৪ মার্চ) পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। পরিষদের ইতিহাসে এই দিনটি স্মরণীয় বলিতে হইবে; কারণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাহিত্য-পরিষদে হরপ্রসাদ অনেক দিন ধ'রে আপন বহুদর্শী শক্তির প্রভাব প্রয়োগ করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র

পেয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলালের সহযোগিতায় এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্যাভাণ্ডারে নিজের বংশগত পাণ্ডিত্যের অধিকার নিয়ে তরুণ বয়সে তিনি যে অক্লান্ত তপস্যা করেছিলেন, সাহিত্য-পরিষৎকে তারই পরিণত ফল দিয়ে সতেজ ক'রে রেখেছিলেন।"

পরিষদের মুখপাত্র ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় হরপ্রসাদের পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধটি—'রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল' নামে ১৩০৪ সালের ১ম সংখ্যায় (ইং ১৮৯৭) প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি ইঙ্গিত করেন যে, বঙ্গদেশে ধর্ম্মঠাকুরের নামে যে পূজা প্রচলিত আছে, সেই "ধর্ম্মপূজার ব্যাপার বৌদ্ধধর্ম্মের ভগ্নাবশেষ বলিয়া বোধ হয়।" "অনেকে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। একজন বলিয়াছিলেন,—ছিঃ! জেলে মালারা যে-ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে, সে ধর্ম্মঠাকুর কি না বৌদ্ধ! ছিঃ!" প্রবন্ধটি যখন পরিষদের সভায় পঠিত (২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪) ও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, হরপ্রসাদ তখন নেপালে।* নেপাল হইতে ফিরিয়া তিনি ঐ বৎসরই "Discovery of Living Buddhism in Bengal" নামে একটি ইংরেজী প্রবন্ধের নূতন উপকরণের সাহায্যে তাঁহার মতটি আরও দৃঢ়তার সহিত সমর্থিত করেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলা পুথির আলোচনায় হরপ্রসাদ ইতিহাসে যে-সকল নূতন মত প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, এটি তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রসিদ্ধ।

হরপ্রসাদের গুণজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া পরিষৎ অচিরাৎ তাঁহাকে সহকারী সভাপতির পদে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রেরণায়, এশিয়াটিক সোসাইটি-প্রবর্ত্তিত বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকার আদর্শে, ১৩০৭

* পুথির অনুসন্ধানে হরপ্রসাদ প্রথম বার নেপাল গমন করেন ১৮৯৭ সনের মে মাসে, দ্বিতীয় বার অধ্যাপক বেণ্ডালের সহিত ১৮৯৮ সনের ডিসেম্বর মাসে, তৃতীয় বার ১৯০৭ সনে এবং চতুর্থ বার ১৯২২ সনে।

সাল হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 'প্রাচীন বাংলা গ্রন্থাবলী' নামে একখানি স্বতন্ত্র দ্বৈমাসিক পত্রের সৃষ্টি করিয়া উহার প্রতি সংখ্যায় দুই-তিনখানি প্রাচীন বাংলা পুথি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের আয়োজন করেন। হরপ্রসাদ এই পত্রের প্রধান সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রথম বর্ষের পত্রিকায় তাঁহার "বিদ্যাপতির পদাবলী" (অসম্পূর্ণ) মুদ্রিত হইয়াছিল। হরপ্রসাদের সম্পাদনায় 'প্রাচীন বাংলা গ্রন্থে'র এগারটি সংখ্যা প্রকাশের উল্লেখ বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় পাওয়া যায়, ১ম সংখ্যা ও ১০-১১শ যুগ্ম-সংখ্যার প্রকাশকাল যথাক্রমে—১৬ অক্টোবর ১৯০০ ও ১৯ নবেম্বর ১৯০২। ১৩০৯ সালে হরপ্রসাদ ইহার সম্পাদন-ভার ত্যাগ করেন; ৬ই চৈত্র তারিখে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি দুঃখের সহিত তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

কেন তিনি হঠাৎ এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সর্ব্বসম্পর্ক ছিন্ন করেন, পরিষদের পুরাতন নথিপত্রে তাহার উল্লেখ নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীগণপতি সরকার তাঁহার 'হরপ্রসাদ-জীবনী'তে লিখিয়াছেন :—

> হরপ্রসাদ 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' নাম দিয়া কবি কালিদাসের অমর কাব্য 'মেঘদূতে'র অনুবাদ প্রকাশ করেন।...এই বই লইয়া তাঁহাকে বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা রাজসরকারে প্রচার করেন যে, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্‌সিপল অশ্লীল পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে সরকার বাহাদুর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের মত গ্রহণ করেন। তাঁহারা ইহা 'অশ্লীলতার অমার্জ্জনীয় দোষে দুষ্ট' বলিয়া মত দিয়াছিলেন।...তখন হরপ্রসাদ বঙ্গীয়-সাহিত-পরিষদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কিন্তু পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যেরা ঐ পুস্তকের শ্লীলতা ও অশ্লীলতা লইয়া

তাঁহার বিপক্ষে যাওয়ায়, তিনি পরিষদের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি, কোন সভায় টাকীর মুন্সী জমীদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে পরিষদে না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন "আমি খেউড় গাই, আমি কি আপনাদের সঙ্গে একাসনে বসার জুগ্যি।" (পৃ. ৩০-৩১)

কিন্তু পরিষৎ-কর্তৃপক্ষ এই মনোমালিন্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে দেন নাই। হরপ্রসাদের ন্যায় মনীষী যে পরিষৎ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকেন, ইহা তাঁহাদের আদৌ অভিপ্রেত ছিল না। তাঁহারা হরপ্রসাদকে ১৩১৬ সালে সর্ব্বোচ্চ সম্মান "বিশিষ্ট সদস্য"-পদে নির্ব্বাচিত ও ১৩১৮-১৯ সালে পুনরায় সহকারী সভাপতি-পদে বরণ করিয়াছিলেন। পরিষদের গুণগ্রাহিতায় উদার ব্রাহ্মণ অনেকটা নরম হইয়া আসিতেছিলেন; এমন সময়ে পরিষদ্‌গতপ্রাণ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলেন। এই প্রসঙ্গে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য; তিনি লিখিয়াছেন :—

১৩২০ সালে শাস্ত্রী মহাশয় রামেন্দ্রবাবুকে ডাকিয়া 'রসকল্পদ্রুম' নামক সংগৃহীত অতি প্রাচীন পুথি পরিষদে রাখিবার জন্য অযাচিত ভাবে দান করেন। রামেন্দ্রবাবু উহা গ্রহণ করেন। এই দান ব্যাপার হইতে রামেন্দ্রসুন্দর বুঝিয়াছিলেন, পরিষদের প্রতি শাস্ত্রী মহাশয়ের এখনও মমত্ব বোধ রহিয়াছে। একটু চেষ্টা করিলেই যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে, তাহা দূর হইতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় বলি,—"সেই সময়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহিত্য-পরিষদের প্রতি বৈরাগ্য ছিল। এই অযাচিত দানে আমি বুঝিলাম, ঐ বৈরাগ্যের অন্তরালে তীব্র অনুরাগ ছাই-চাপা আগুনের মত জ্বলিতেছে। আমি সাধ্যমত ফুৎকার প্রয়োগে ছাই উড়াইয়া আগুন জ্বালাইতে চেষ্টার

ত্রুটি করি নাই ; সেই আগুনের আলো এবং তৎসঙ্গে হয়ত একটু উত্তাপ সাহিত্য-পরিষৎ এখন ভোগ করিতেছেন। সাহিত্য-পরিষৎ সমিধ্ যোগাইয়া যজ্ঞের আগুনের মত ইহা রক্ষা করিতে পারেন, পরিষদের ভাগ্য। ('আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর,' পৃ. ১৮৪)

পরিষদের ২০শ বর্ষে বা ১৩২০ সালে হরপ্রসাদ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই বৎসর কার্য্যনির্ব্বাহক-সভার ১ম অধিবেশনে (২৮ জ্যৈষ্ঠ) তিনি দীর্ঘ এগার বৎসর কাল পরে যোগদান করিয়াছিলেন। আর কখনও তিনি পরিষৎ ত্যাগ করেন নাই ; আমরণ ইহার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরিষদে তাঁহার কার্য্য-পরিচয় এইরূপ :—

সহ. সভাপতি	...	১৩০৪—১৩০৯
”		১৩১৮—১৩১৯
সভাপতি	...	১৩২০—১৩২২
সহ. সভাপতি	...	১৩২৩—১৩২৬, জ্যৈষ্ঠ
সভাপতি	...	১৩২৬, ২ আষাঢ়—১৩৩০
সহ. সভাপতি	...	১৩৩১
সভাপতি	...	১৩৩২—১৩৩৬
সহ. সভাপতি	...	১৩৩৭—১৩৩৮

পরিষদের কর্ণধার হইয়া হরপ্রসাদ বিবিধ উপায়ে ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। পরিষদে তিনি অনেকগুলি লোকরঞ্জক বক্তৃতা দিয়াছিলেন ; সেগুলি—

বাংলার লিপিকথা	... ১৩২৬, ২৭ চৈত্র ;
(ছায়াচিত্র সহযোগে)	১৩২৭, ১০ বৈশাখ
মহাদেব	... ১৩২৮, ২৬ জ্যৈষ্ঠ

ব্রাত্য কাহাকে বলে	... ১৩২৯, ৪ কার্ত্তিক
জয়দেব ও চণ্ডীদাস	... ১৩২৯, ১৫ পৌষ
বিদ্যাপতি	... ১৩৩০, ২৯ ভাদ্র
বৌদ্ধধর্ম্ম	... ১৩৩২, ৬ ও ১৩ চৈত্র ; ১৩৩৩, ১৫ জ্যৈষ্ঠ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে সভাপতি-রূপে তিনি যে-কয়টি ভাষণ দিয়াছিলেন, সেগুলি বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ্। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম অভিভাষণে (৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১) তিনি বৌদ্ধযুগের বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এদেশে পুথি-সাহিত্য অন্বেষণের বিস্তৃত ইতিহাস দিয়া তিনি পরিশেষে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য :—

> পুথি খোঁজার কথা বলিতে বলিতে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। বাঙ্গালা পুথি খোঁজা হইতে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই কয়টি উপকার হইয়াছে ;—১। বাঙ্গালা দেশে আজিও যে বৌদ্ধধর্ম্ম জীয়ন্ত আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। ২। মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্ব্বে যে বাঙ্গালা ভাষায় একটা প্রকাণ্ড সাহিত্য ছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। ৩। সে সাহিত্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু, দুই ধর্ম্মেরই উন্নতি হইয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি। ৪। অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙ্গালার ইতিহাসের মধ্যে কিঞ্চিৎ আলো প্রবেশ করিয়াছে। পুথি কিন্তু ভাল করিয়া খোঁজা হয় নাই। কত দিকে কত দেশে কতরকম পুথি যে পড়িয়া আছে, তাহার ঠিকানা নাই। নিউটন বলিয়াছেন,—আমরা সমুদ্রের ধারে ঝিনুক কুড়াইতেছি মাত্র। আমরা এই পুথি-সমুদ্রে ততটুকুও করিতে পারি নাই। পঁচিশ বৎসরের মধ্যে একটা জিনিস হইয়াছে, ইতিহাস জানিবার জন্য দেশের মধ্যে

একটা উৎকট আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। সে আগ্রহ কাব্য, ব্যাকরণ, ভাষাজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি জানিবার জন্য যে আগ্রহ, তাহাকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে। এখন লোকে ইতিহাসের কথা বলিলেই শুনে, অন্য কথা বলিলে বড় একটা শুনিতে চায় না। জিনিস কিন্তু ঠিক। সকলের আগে আমি কি, সেটুকু চেনা চাই, সেই চেনার জন্য আগ্রহ হইয়াছে। সেই আগ্রহটিকে ঠিক পথে চালান আমাদের বড়ই দরকার। সে বিষয়ে চেষ্টারও অভাব নাই, অর্থেরও অভাব নাই। বঙ্গদেশের ধনিগণ ইহার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, অর্থব্যয় করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। অভাব কেবল দুই জিনিসের; যাহারা পথ দেখাইয়া দিবে, তাহার অভাব ও যাহারা সেই পথে চলিয়া কাজ করিবে, তাহার অভাব।

এত উৎকট আগ্রহের উপরও যদি পথ দেখাইবার ও কাজ করিবার লোক না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কপাল মন্দ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যেরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যদি শিক্ষিত লোক সকলে নিত্য এক ঘণ্টা কাল ইতিহাস আলোচনা করেন, অনেক নূতন নূতন পথ বাহির হইবে, নানা উপায়ে আমরা আমাদিগকে, আমাদের সমাজকে, আমাদের ধর্ম্মকে, আমাদের দেশকে, আমাদের সাহিত্যকে এবং পূর্ব্ববৃত্তান্ত কি, তাহা বুঝিতে পারিব। যত দিন তাহা না বুঝিতে পারি, তত দিন আমাদের উন্নতির পথই দেখিতে পাইব না। আপনাকে জানিতে হইলে দেশের পুথি খোঁজার দরকার। তাহাতে পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে করিলে চলিবে না, অর্থকে অর্থ মনে করিলে চলিবে না। কায় মন চিত্ত লাগাইয়া পুথি খুঁজিতে হইবে ও পুথি পড়িতে হইবে।

তাঁহার লিখিত বহু মৌলিক প্রবন্ধ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র পৃষ্ঠা

অলঙ্কৃত করিয়াছে। তিনি 'বৌদ্ধগান ও দোহা,' মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল, রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন বাংলা পুথি আবিষ্কার করিয়া বাংলা-সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপনায় সহায়তা করিয়া গিয়াছেন; এই সকল গ্রন্থের কয়েকখানি তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে; এগুলির মধ্যে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের যে চর্য্যাপদগুলি স্থান পাইয়াছে, তাহা নানা দিক্ দিয়া বিশেষ মূল্যবান্; এগুলি কেবলমাত্র বাংলা ভাষার নহে, আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষার আদিম রূপ।

হরপ্রসাদ পরিষদের গঠন ও পরিচালন কার্য্যেও বিলক্ষণ সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রযত্নে পরিষৎ ঋণমুক্ত হইয়াছিল। পরিষদ্-মন্দির যখন সংস্কারাভাবে জীর্ণ, পড়-পড়, সেই দুর্দ্দিনে তিনিই অগ্রণী হইয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট হইতে ২৫ হাজার টাকা আদায় করিয়াছিলেন। অধিক দৃষ্টান্ত বাহুল্য। এক কথায় তাঁহার পরিচালনাধীনে পরিষদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত পরিষদের জন্য যে অনন্যসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার পরিষৎ-প্রীতি অতুলনীয় ছিল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনঃ ইহা পরিষদের একটি মহৎ অনুষ্ঠান। বঙ্গব্যবচ্ছেদ-আন্দোলনের সময় (১৩১২) পরিষদের তৎকালীন সহকারী সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথম এরূপ বার্ষিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করেন। ইহার প্রথম অধিবেশন হয় কাশিমবাজারে—১৩১৪ সালের কার্ত্তিক মাসে। এই

সময়ে হরপ্রসাদ পরিষৎ হইতে বিযুক্ত ছিলেন। তিনি পরিষদে ফিরিয়া আসিবার কয়েক মাস পরেই (চৈত্র ১৩২০) কলিকাতায় সাহিত্য-সম্মিলনের যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি যে অভিভাষণটি পাঠ করেন, তাহাতে কলিকাতা ও ২৪-পরগণার ইতিহাস এবং তথাকার সাহিত্যসেবকবৃন্দ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। পর-বৎসর ভাদ্র মাসে সম্মিলনের ৮ম অধিবেশন হয় বর্দ্ধমানে। হরপ্রসাদ এই অনুষ্ঠানের মূল সভাপতি এবং সাহিত্য-শাখার সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। মূল সভাপতির সম্বোধনে তিনি বাংলার প্রাচীন গৌরবের কতকগুলি কথা আলোচনা করেন। গৌরবগুলি এই :—

> ১। হস্তি-চিকিৎসা, ২। নানা ধর্ম্মমত, ৩। রেশম্ ৪। বাকলের কাপড়, ৫। থিয়েটার, ৬। নৌকা ও জাহাজ, ৭। বৌদ্ধ শীলভদ্র, ৮। বৌদ্ধ লেখক শান্তিদেব, ৯। নাথ-পন্থ, ১০। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, ১১। জগদ্দল মহাবিহার ও বিভূতিচন্দ্র, ১২। লুইপাদ ও তাঁহার সিদ্ধাচার্য্যগণ, ১৩। ভাস্করের কাজ, ১৪। বাঙ্গলায় সংস্কৃত, ১৫। বৃহস্পতি, শ্রীকর, শ্রীনাথ ও রঘুনন্দন, ১৬। ন্যায়শাস্ত্র, ১৭। চৈতন্য ও তাঁহার পরিকর, ১৮। তান্ত্রিকগণ, ১৯। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, ২০। কায়স্থ ও রাজা।

সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে তিনি তাঁহার অভিভাষণে যে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, আজিকার দিনেও তাহার মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাংলা-সাহিত্যের গতির কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া, তিনি বলিতেছেন :—

> অনেকের সংস্কার, বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের কন্যা। শ্রীযুক্ত

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সংস্কৃতকে বাঙ্গলা ভাষার ঠান্‌দিদি বলিয়াছেন। আমি কিন্তু সংস্কৃতকে বাঙ্গলার অতি-অতি-অতি-অতি-অতি-অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহী বলি। পাণিনির সময় সংস্কৃতকে ভাষা বলিত অর্থাৎ পাণিনি যে সময় ব্যাকরণ লেখেন, তখন তাঁহার দেশে লোকে সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা কহিত। তাঁহার সময় আর এক ভাষা ছিল, তাহার নাম "ছন্দস্"—অর্থাৎ বেদের ভাষা। বেদের ভাষাটা তখন পুরাণ; প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ভাষা চলিতেছে। পাণিনি কত দিনের লোক তাহা জানি না, তবে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ, সপ্তম শতকের বোধ হয়। তাহার অল্প দিন পর হইতেই ভাষা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরই তাঁহার চুলার ছাই কুড়াইয়া এক পাথরের পাত্রে রাখা হয়। তাহার গায়ে যে ভাষায় লেখা আছে, সে ভাষা সংস্কৃত নয়; তাহার সকল শব্দই সংস্কৃত হইতে আসা, কিন্তু সে ভাষা সংস্কৃত হইতে অনেক তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পরই অশোকের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর মিশ্রভাষা, ইহার কতক সংস্কৃত ও কতক আর এক রকম। একটি বাক্যে দু রকমই পাওয়া যায়। এ ভাষায় বইও আছে, শিলালেখও আছে। তাহার পর সুঙ্গ ও খারবেলদিগের শিলালেখের ভাষা। তাহার পর সাতকর্ণিদের শিলালেখের ভাষা তাহার পর পালি ভাষা। তাহার পর নাটকের প্রাকৃত। সকল প্রাকৃতের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই মাগধীর ও ওড্র মাগধীর সহিত আমাদের কিছু সম্পর্ক আছে। তাহার পর অনেক দিন কোন খবর পাওয়া যায় না। তাহার পর অষ্টম শতকের বাঙ্গলা। তাহার পর চণ্ডীদাসের বাঙ্গলা। তাহার পর বৈষ্ণব কবিদের বাঙ্গলা। সব শেষে আমাদের বাঙ্গলা।

সুতরাং সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গলার সম্পর্ক অনেক দূর। যাঁহারা বাঙ্গলাকে সংস্কৃতের পথে চালাইতে চান, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনাও খুব কম। সংস্কৃতের গতি একরূপ ছিল, এত দিনে বাঙ্গলার গতি আর একরূপ হইয়া গিয়াছে। এখন এই বাঙ্গলাকে সংস্কৃতের দিকে চালাইবার চেষ্টা, আর গঙ্গার স্রোতকে হিমালয়ের দিকে চালাইবার চেষ্টা একই রকম। সাত শত বৎসর মুসলমানের সহিত একত্র বাস করিয়া বাঙ্গলা মুসলমান হইতে অনেক জিনিস লইয়া ফেলিয়াছে। সে সব জিনিস বাঙ্গলার হাড়ে মাসে জড়িত হইয়াছে। এখন তাহাকে বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। মুসলমানেরা বাঙ্গলা ভাষাকে যেমন বদ্‌লাইয়া দিয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোন ভাষাকে সেরূপ পারে নাই। আমাদের বাঙ্গলার বিভক্তি 'রা' ও 'দের' মুসলানদের কাছ হইতে লওয়া। সে বিভক্তি তুমি ভাষা হইতে তাড়াইবে কি করিয়া। অথচ আমাদের পণ্ডিত লেখক মহাশয়েরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিবেন না। যে সকল শব্দ একেবারে আপামর সাধারণের ভিতর চলিয়া গিয়াছে লিখিবার সময় সেগুলি তাঁহারা ব্যবহার করিবেন না। "কলম" মুসলমানী শব্দ, তাঁহারা কলমের বদলে "লেখনী" শব্দ ব্যবহার করিবেন, অথচ "লেখনীর" অর্থ—উড়েদের তালপাতায় আঁচড় কাটিবার লোহার খুন্তি, তাহাতে কালি লাগে না। "কলম" ও "লেখনী" দুটি একেবারে ভিন্ন জিনিস। "দোয়াত" মুসলমানী কথা। দোয়াত লেখা হইবে না, "মস্যাধার" লিখিতে হইবে। "পাট্টা" মুসলমানী কথা। পাট্টা লিখিবেন না, "ভোগবিধায়ক পত্র" লিখিবেন। "আদালত" লিখিবেন না, লিখিবেন—"বিচারালয়"।

এইরূপে তাঁহারা বাঙ্গলাকে শুদ্ধ বা মার্জ্জিত করিয়া লইতে চান। তাঁহাদের সে চেষ্টা কখনই সফল হইবার নয়।

আবার এক দল আছেন, তাঁহারা চলিত কথা দেখিলেই নাক সিঁটকাইয়া উঠেন; বলেন—"ওটা ইতুরে কথা।" উহার বদলে তাঁহারা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে চান। আমরা বলি, "সময় আর কাটে না," তাঁহারা বলেন, "কাটে না, ছি!—ইতুরে কথা।" বলেন, "সময় কর্ত্তন হয় না।" আমরা কথায় বলি, "বাড়িয়ে গুছিয়ে লও।" তাঁহারা বলেন, "ছি! ও ইতুরে কথা। পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া লও।" আমরা বলি, "দল বাঁধিয়া কাজ করিতে হয়," তাঁহারা বলেন, "দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হয়।" আমরা কথায় বলি, "এটা গালগল্প," তাঁহারা বলেন, "স্বকপোল-কল্পিত।" আমরা বলি, "ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল," তাঁহারা বলেন, "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল।" এইরূপে তাঁহারা কেতাবের ভাষাকে কথা কওয়ার ভাষা হইতে অনেক দূরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। এখন ইংরাজী ও সংস্কৃত পড়িতে যত কষ্ট হয়, তাঁহাদের সাধু ভাষা পড়িতেও তত কষ্ট হয়।

আর এক দল আছেন, তাঁহারা পড়েন ইংরাজী, ভাবেন ইংরেজীতে, লিখিতে চান বাঙ্গলায়—সে এক রকম সাহেবী বাঙ্গলা হইয়া পড়ে। যথা—

"শিক্ষিবাসী যুবকগণ মহোৎসাহসহকারে এই কথা প্রচার করিয়া সত্যকে লুপ্ত করিবার মধ্যে আনিয়াছেন।"

"সুতরাং যদি পাশ্চাত্য শিক্ষা যদি কিছু অনিষ্ট করিয়া থাকে তাহার জন্য আমরা নিজ অদৃষ্টকেই ধন্যবাদ দিতে পারি।"

"যে যে ক্ষেত্রে তিনি কার্য্য করিয়াছেন, সেই সকল ক্ষেত্রেই প্রায় তিনি সমসাময়িকগণের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।"

"দেশের লোকের চিন্তা তাহার চিন্তা হইতে কত পশ্চাদ্বর্ত্তী ছিল।"

"দেখিলাম গরম পোলাও ও মাংস আমার আহারের অপেক্ষা করিতেছে।"

"হরমোহিনী এখন সুচরিতাকে তাহার পূর্ব্বের সমস্ত পরিবেষ্টন হইতে ছাড়াইয়া লইয়া সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্ত করিতে চান।"

আর অধিক তুলিয়া ভিজা কম্বল ভারি করিব না। মোট কথা দাঁড়াইয়াছে এই যে, বাঙ্গলা যখন একটা ভাল ভাষার মধ্যেই দাঁড়াইতেছে, তখন উহা কিছু পরিমাণে শিক্ষা করা আবশ্যক। উহার একটা স্বতন্ত্র ব্যাকরণ আছে, স্বতন্ত্র পদ-যোজনার প্রণালী আছে, পদ বাছিয়া লইবার প্রণালী আছে। সেগুলি নিপুণ হইয়া দেখা দরকার, তবে ত বাঙ্গলা লেখক হইবে? নহিলে বাঙ্গলা আমার মাতৃভাষা, আমি যাহাই লিখিব, তাহাই বাঙ্গলা—এই বলিয়া রাশি রাশি ইংরাজী ও সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয়া দিলে, তাহাকেও কি বাঙ্গলা বলিব? তাহা হইলে ত এটি খাসা বাঙ্গলা—

"আমি ল্যাণ্ডো গাড়িতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাওড়া ষ্টেশনে পঁহুছিয়া বেনারসের জন্য বুক করিলাম। ফাষ্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকাণ্ট ছিল না, আপার বার্থে বেডিংটা স্প্রেড্ করিয়া একটু সর্ট ন্যাপ্ দিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় হুইসিল দিয়া ট্রেণ ষ্টার্ট করিল।" ইহাকে কি আপনারা বাঙ্গলা বলিবেন?

দেশের লোকে যে সকল শব্দ বুঝে অথচ সত্য সত্য ইতুরে কথা

নয়, যে সব কথা ভদ্রলোকের কাছে কহিতে আমরা লজ্জিত হই না, সেই সকল কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিলে লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে, ভাষাও ভাল হইবে। "গালগল্প" লিখিতে আপত্তি কি? গালগল্পে যেমন অর্থ বোধ হয়, "স্বকপোলকল্পিত" বলিলে কি সে অর্থ বোধ হয়, না সকলে সহজে বুঝিতে পারে? সুতরাং এই সকল সোজা কথা ছাড়িয়া দিয়া তাহার জায়গায় অপ্রচলিত, কঠিন—অনেক সময় অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করার কি দরকার? একবার রবিবাবু বলিয়াছিলেন, "লেখ না সংস্কৃত! বাজারে তোমার বই কাটিবে না। তাহাতে তোমার কি ক্ষতি হইবে? পোকায় ত কাটিবে?" বাস্তবিকই বেশী সংস্কৃতওয়ালা বাঙ্গলা বই পোকাতেই কাটে!

এখন বাঙ্গলাকে এই সংস্কৃত ও ইংরাজীর হাত হইতে মুক্ত করিয়া সহজ করা, মিষ্ট করা ও সরল করা আবশ্যক হইয়াছে। এত দিন পণ্ডিত মহাশয়েরা ইচ্ছামত পারসী শব্দকে তাড়াইয়া দিতে পারিয়াছেন, কারণ বাঙ্গলার মুসলমানেরা বাঙ্গলা সাহিত্যে লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। এখন তাঁহারা বলিতেছেন, "চলিত মুসলমানী শব্দ তোমরা তাড়াইবে কেন? তাড়াইবার তোমাদের কি অধিকার আছে? যে সকল শব্দ তিন, চার, পাঁচ শত বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের ত ভাষায় থাকিবার কায়েমী স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। তোমরা সে স্বত্ব হইতে তাড়াইবার কে?" শুধু যে এই কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত আছেন তাহা নয়, তাঁহারা আরও বলিতেছেন, "তোমরা যদি মুসলমানী শব্দ তাড়াইয়া বড় বড় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কর, আর যদি বুঝিতে আমাদের বেশী কষ্ট হয়, তবে আমরা বড় বড় পারসী শব্দ, আরবী শব্দ ব্যবহার করিব; আমাদের ভাষা স্বতন্ত্র

করিয়া লইব—তোমাদের মুখাপেক্ষা করিব না।” সুতরাং ভাষার সমস্যাটি এখন বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে নবাব আলি চৌধুরী মহাশয় “বাঙ্গলা ভাষার গতি” নামে ঢাকায় যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, সেটি সকলেরই মন দিয়া দেখা উচিত। বাঙ্গলায় যখন অর্দ্ধেক মুসলমান, তখন তাহারা যে হিন্দুরা যাহা বলিবে, তাহাই করিবে—এরূপ আশা করা যায় না। এখন উভয়ে মিলিয়া বাঙ্গলা কি হইবে স্থির করিয়া লওয়া উচিত। উহার একটা ব্যাকরণ ও অভিধান স্থির করিয়া লওয়া উচিত। লেখকদিগের স্বেচ্ছাচারিতার উপর ভাষার উন্নতি আর নির্ভর করিতে পারে না। যত দিন যাইতেছে, কথাটা ক্রমেই শক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমি বলি; যাহা চল্‌তি, যাহা সকলে বুঝে—তাহাই চালাও; যাহা চল্‌তি নয়, তাহাকে আনিও না। যাহা চল্‌তি, তাহা ইংরাজীই হউক, পারসীই হউক, সংস্কৃতই হউক—চলুক। তাহাকে বদ্‌লাইয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিবার দরকার নাই। “রেলওয়েকে” “লৌহবর্ত্ম” করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। একজন সে দিন বড় রাস্তাকে “রাজমার্গ” ও বাঁশ লইয়া যাওয়াকে “বংশপরিচালনা” লিখিয়া বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর একজন শ্বশুর শব্দটাকে ইতুরে মনে করিয়া তাহার বদলে “শ্বশ্রূ মহাশয়” লিখিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। এরূপ করা বড়ই অন্যায়।

ভাষাকে সোজা পথে চালান উচিত, এই ত গেল এক কথা। তাহার পরে আর একটা কথা আছে—এই আমার শেষ কথা, সেটা, নূতন কথা গড়া। বাঙ্গলার সমাজ এখন আর নিশ্চল নয়। যে ভাবে বহু শত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, সে ভাবে এখন আর কাটিতেছে না। নানা দেশ হইতে নানা ভাব আসিয়া বাঙ্গলায় জুটিতেছে। যে সকল

ভাব প্রকাশ করিবার কথা বাঙ্গলায় নাই, তাহার জন্য কথা গড়িতে হইতেছে। যাহাদের চলিত ভাষার কথা লইয়াই গোলযোগ, নূতন ভাবে নূতন কথা গড়িতে তাহাদের আরও কষ্ট পাইতে হইবে, আরও বেগ পাইতে হইবে—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। পূর্ব্বে দেশে "মিউজিয়ম" ছিল না, এখন হইয়াছে। মিউজিয়মকে কি বলিব? সংস্কৃত পণ্ডিত বলিলেন, "চিত্রশালিকা"। কথাটা কেহ বুঝিলও না, মিউজিয়মের ভাবও উহাতে প্রকাশ হইল না। চিত্রশালিকা বলিলে ছবির ঘর বুঝায়, সুতরাং মিউজিয়ম বুঝাইল না। এ জায়গায় "মিউজিয়ম" শব্দ লইতে দোষ কি? দেশের লোকে কিন্তু চট্ করিয়া উহার একটা নাম দিয়া বসিয়াছে। তাহারা উহাকে "যাদুঘর" বলে। সুদূর পশ্চিমে উহাকে "আজবঘর" বলে। চিত্রশালিকার চেয়ে এ দুটা কথাই ভাল। উহার একটা চালাইলে দোষ কি? বাঙ্গলায় আকাশে তাবা মাপিবার যন্ত্রঘর ছিল না। যখন কলিকাতায় সেই ঘর হইল, পণ্ডিত মহাশয়েরা তাহার তর্জ্জমা করিলেন, "পর্য্যবেক্ষণিকা"। কথাটা একে ত চোয়ালভাঙ্গা, তাহাতে আবার কঠিন সংস্কৃত—শুদ্ধ কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ। হিন্দুস্থানী গাড়োয়ানেরা অত শত বুঝে না,—তাহারা উহার নাম রাখিল "তারা-ঘর," মোটামুটি উহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিল কথাটি শুনিতেও মিষ্ট। তবে উহা চালাইতে দোষ কি? এইরূপ অনেক নূতন জিনিস, নূতন ভাব নিত্যই আসিতেছে; তাহাদের জন্য কথা গড়া একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার বোধহয়, বাঙ্গলা হইতেই ঐ সমস্যার পূরণ হওয়া ভাল, বাঙ্গলা কথা দিয়াই নূতন কথা গড়া উচিত। নিতান্ত না পারিলে, আসামী, উড়িয়া ও হিন্দী খুঁজিয়া দেখা উচিত; তাহাতেও না হইলে যে ভাষার ভাব, সেই দেশের কথাতেই লওয়া উচিত। আমরা ত

চিরকালই তাহাই করিয়া আসিতেছি, নহিলে "বাতাবী লেবু," "মর্ত্তমান কলা," "চাঁপা কলা" কোথা হইতে পাইলাম? সেইরূপ এখনও সোজা বাঙ্গলায়, সোজা কথায় এই সকল নূতন জিনিসের নাম দেওয়া ও নূতন ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা উচিত; নহিলে কতকগুলা দাঁতভাঙ্গা কট্‌কটে শব্দ তৈয়ার করিয়া লইলে ভাষার সঙ্গে তাহা খাপ খাইবে না। যে দিকেই হউক, ভাষা লইয়া স্বেচ্ছাচারিতা করাটা ঠিক নয়। ফরাসীরা যেমন একটা একাডেমি করিয়া কোন্ কোন্ শব্দ ভাষায় চলিবে, কোন্ কোন্ শব্দ চলিবে না ঠিক করিয়াছিলেন, আমাদেরও সেইরূপ একটা করিয়া লওয়া উচিত; নহিলে কথার সংখ্যায় আমাদের অভিধান অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে এবং কথার ভারে ভাষা অতল জলে ডুবিয়া যাইবে।

১৩৩১ সালের বৈশাখ মাসে রমেমোহন রায়ের জন্মভূমি রাধানগরে সম্মিলনের ১৫শ অধিবেশন হয়। এবারও হরপ্রসাদ মূল সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে প্রধানতঃ খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজের ইতিহাস আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন।

হরপ্রসাদ আরও কয়েকটি সাহিত্যিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন; দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৩২৪ সালে অনুষ্ঠিত মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মিলন ও মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন এবং ১৩২৬ সালের ৪ঠা মাঘ হেতমপুরে অনুষ্ঠিত বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলনের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সাহিত্য-পরিষদের গুণগ্রাহিতা: পরিষৎ ১৩১৬ সালে (১৫ আগষ্ট ১৯০৯) সর্ব্বোচ্চ সম্মান "বিশিষ্ট সদস্য"-পদে হরপ্রসাদকে নির্ব্বাচিত করিয়া যথার্থই গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯২১ সনে বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে বিশেষ গৌরবকর

"অনারারি মেম্বর" পদে বরণ করিলে পরিষৎ তাঁহার সম্বর্দ্ধনা (১৩ আষাঢ় ১৩২৯) করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহাকে একটি পিতলের থালায় গরদের জোড়, একটি সোনার আংটি ও রূপার চন্দনের বাটি উপঢৌকন দেওয়া হয়। তাঁহার পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিনের স্মারক-রূপে পরিষদের সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বহু বিদ্বজ্জনলিখিত ভারত-তত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধ-সংগ্রহ—'হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখামালা'র ১ম খণ্ড ও "অমুদ্রিত ২য় খণ্ডের প্রবন্ধাবলি কারুকার্য্যখচিত একখানি রৌপ্যপাত্রে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়কে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বাঙ্গালী জাতির পক্ষ হইতে মাল্য-চন্দন-বিভূষিত করেন ও ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহাকে শুদ্ধ খদ্দরের ধুতি ও চাদর উপহার দেন" (১৪ ভাদ্র ১৩৩৮)।

প্রতিভার সম্মান

হরপ্রসাদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারি দিকে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। স্বদেশের ও বিদেশের বিদ্বৎসমাজ—এমন কি, রাজসরকারের নিকট হইতেও তিনি বহু অযাচিত গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে; এখানে আরও কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি :—

ইং ১৮৮৮ : কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (আজীবন); সেনট্রাল টেক্সট্ বুক কমিটির সভ্য।

১৮৯৫ : Buddhist Text and Research Society-র সম্পাদক।

১৮৯৮ : মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্তি।*

* শ্রীগণপতি সরকার লিখিয়াছেন, "তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম যে, Age of Consent Bill সম্বন্ধে তিনি যে note দিয়াছিলেন, তাহাতে সরকার সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই উপাধি প্রদান করেন।"

১৯০৩ : বুদ্ধগয়ার মন্দির-সংক্রান্ত কমিশনের অন্যতর সদস্য।*

১৯১১ : সি. আই. ই. উপাধি লাভ।

১৯১৬, মার্চ মথুরায় অখিলভারতীয় সংস্কৃত মহাসম্মেলনের সভাপতি।

১৯২১ : বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির 'অনরারি মেম্বর' বা সম্মানিত সদস্য।

১৯২২ : কলিকাতায় ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সের ২য় অধিবেশনে সংস্কৃত ও প্রাকৃত বিভাগের সভাপতি।

১৯২৩ : কলিকাতায় আহূত অখিল-ভারত-হিন্দুসভার সভাপতি।

১৯২৮ : লাহোরে অনুষ্ঠিত ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সের ৫ম অধিবেশনে প্রধান সভাপতি।

১৯৩০ : বৃহত্তর ভারত-পরিষদের (Greater India Socy.) সভাপতি।

ইহা ছাড়া তিনি বিহার ও উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির "অনরারি মেম্বর" নির্ব্বাচিত ও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের এক জন ট্রাষ্টি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মৃত্যু

১৯০৮ সনে হরপ্রসাদ যখন অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলের সহিত ভারত-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, সেই সময় তাহার পত্নীবিয়োগ হয়। স্ত্রীর মৃত্যুকালে তিনি নিকটে ছিলেন না—এ আক্ষেপ তাঁহার চিরদিন ছিল। "যতই দিন যায় স্ত্রীর শোক যেন ততই দীর্ঘ হয়"—ইহা

---

* ১৭ জুলাই ১৯০৩ তারিখে ছোট লাট Bourdillon হরপ্রসাদকে লিখিয়াছিলেন :—"...allow me to express to you the acknowledgment of Government for the complete, erudit, valuable memorandum which you have prepared...In any case it will remain a monument of your learning, assiduity and impartiality."

তাঁহারই কথা। বিপত্নীক অবস্থায় একরূপ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিয়া এই জ্ঞান-তপস্বী আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভারতীর সেবায় নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। ১৩৩৮ সালের ১লা অগ্রহায়ণ (১৭ নবেম্বর ১৯৩১) রাত্রি ১১টার সময় হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়, পুত্রগণের কেহই নিকটে ছিলেন না। তাঁহার শবদেহ কলিকাতা পটলডাঙ্গার বাড়ী হইতে নৈহাটি লইয়া গিয়া গঙ্গাতীরে সৎকার করা হয়।

রচনাবলী—বাংলা

যে-কয়টি বিষয়ের চচায় হরপ্রসাদ প্রায় সারাজীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, মোটামুটি বলিতে গেলে সেগুলি—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, কালিদাসের কাব্যসমালোচনা ও বৌদ্ধধর্ম্ম, এই সঙ্গে পুথি-সংগ্রহ ও তালিকা-প্রণয়ন কার্য্যেরও উল্লেখ করিতে হইবে।

রচিত পুস্তক-পুস্তিকাঃ হরপ্রসাদের রচিত পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা মোটেই বেশী নহে, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির বিবরণ হইতে গৃহীত :—

১। ভারতমহিলা। কাঁটালপাড়া ১২৮৭ (২০ জুন ১৮৮১)। পৃ. ৯৬।

"মহারাজা হোলকারদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত।" ১২৮২, মাঘ-চৈত্র 'বঙ্গদর্শন' হইতে পুনর্ম্মুদ্রিত।

২। বাল্মীকির জয়। ১২৮৮ সাল (২৯ ডিসেম্বর ১৮৮১)। পৃ. ৯৭।

১২৮৭, পৌষ, মাঘ ও চৈত্র-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' আংশিক প্রকাশিত। ১৯০৯ সনে R. R. Sen, B. L. চট্টগ্রাম হইতে

ইহার ইংরেজী অনুবাদ *The Triumph of Valmiki* নামে প্রকাশ করেন।

৩। সচিত্র রামায়ণ। ইং ১০৮২।

বাল্মীকি রামায়ণের সরল অনুবাদ। ইহা খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল; বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় ৪র্থ—১১শ খণ্ডের (জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৮৮২) উল্লেখ আছে। অঘোরনাথ বরাট ইহার প্রকাশক ছিলেন।

৪। মেঘদূত ব্যাখ্যা। ১৩০৯ সাল (২৫ জুন ১৯০২)। পৃ. ৮৮।

৫। কাঞ্চনমালা (উপন্যাস)। ফাল্গুন ১৩২২ (২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬)। পৃ. ২৫৮।

১২৮৯, আষাঢ়-মাঘ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত।

৬। বেণের মেয়ে (উপন্যাস)। ১৩২৬ সাল (২ ফেব্রুয়ারি ১৯২০)। পৃ. ২২৮।

১৩২৫ কার্ত্তিক—১৩২৬ অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'নারায়ণে' প্রকাশিত।

৭। কলিকাতা মহানগরীতে আহূত ভারত-হিন্দু-সভার প্রথম মহাধিবেশনে [২১ মাঘ ১৩২৯] সভাপতি মহোদয়ের সম্বোধন। ইং ১৯২৩। পৃ. ১৬।

[মৃত্যুর পরে]

৮। প্রাচীন বাংলার গৌরব (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ—নং ৫৪)। আশ্বিন ১৩৫৩ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬)। পৃ. ৬৪।

ইহা বর্দ্ধমানে অনুষ্ঠিত ৮ম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের (চৈত্র ১৩২১) মূল সভাপতির অভিভাষণ।

৯। বৌদ্ধধর্ম্ম। আষাঢ় ১৩৫৫ (২৩ জুলাই ১৯৪৮)। পৃ. ১৪৭।

১৩২১-২৪ সালের 'নারায়ণে' প্রকাশিত বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ক প্রবন্ধগুলির সমষ্টি।

পাঠ্য পুস্তক : হরপ্রসাদ কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তকও রচনা করিয়া গিয়াছেন ; উহা—

বাঙ্গালা প্রথম ব্যাকরণ। (৫ই এপ্রিল ১৮৮২)। পৃ. ৩৮।

ভারতবর্ষের ইতিহাস। ইং ১৮৯৫ (১৪ ফেব্রুয়ারি)। পৃ. ৩৩৬।

"প্রাচীন আর্য্য হইতে লর্ড ল্যান্সডাউন পর্য্যন্ত।"

প্রথম শিক্ষা ভারতবর্ষের ইতিহাস। ইং ১৯১২। পৃ. ১৮৮।

ইহাই পরিবর্ত্তিত আকারে ১৯২২ সনে 'প্রাথমিক ভারতবর্ষের ইতিহাস' (পৃ. ২০০) নামে প্রকাশিত হয়।

প্রসাদ-পাঠ, ১ম ও ২য় ভাগ।

সম্পাদিত গ্রন্থ : হরপ্রসাদের সম্পাদিত গ্রন্থগুলির তালিকা—

বাংলা : 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' : মাণিক গাঙ্গুলি-বিরচিত (পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী —৮)। ১৩১২ সাল।

হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় 'বৌদ্ধগান ও দোহা' (পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—৫৫)। শ্রাবণ ১৩২৩ (ইং ১৯১৬)।

'মহাভারত (আদিপর্ব্ব) : কাশীরাম দাস (পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—৭৫)। ১৩৩৫ সাল (২৫ জুলাই ১৯২৮)।

মৈথিলী : 'কীর্ত্তিলতা' : মহাকবি বিদ্যাপতি-বিরচিত (বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ সমেত); ১৩৩১ সাল (১০ জানুয়ারি ১৯২৫)।

ভূমিকা : হরপ্রসাদ অনেকগুলি বাংলা গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা এই কয়খানির সন্ধান পাইয়াছি—

'জয়দেব চরিত্র': কবি বনমালী দাস-বিরচিত। ১৩১২ সাল। (পরিষৎ)।

'পাখীর কথা': শ্রীসত্যচরণ লাহা। আষাঢ় ১৩২৮।

'সৌন্দরনন্দ কাব্য': শ্রীবিমলাচরণ লাহা-অনূদিত। আষাঢ় ১৩২৯।

'কালিকা-পুরাণীয়-দুর্গাপূজাপদ্ধতি': শ্রীগণপতি সরকার ও আশুতোষ তর্কতীর্থ-সম্পাদিত। ১৩৩০ সাল (ইং ১৯২৩)।

'বীরভূম-বিবরণ,' ৩য় খণ্ড: শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। শ্রাবণ ১৩৩৪ (জুলাই ১৯২৭)।

'পরিমল' (কবিতা): পরিমল দেবী। ১৩৩৪ সাল।

'মেঘদূত': শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ। ভাদ্র ১৩৪১। হরপ্রসাদ-লিখিত পূর্ব্বাভাষের তারিখ—জানুয়ারি ১৯৩০।

'গোগৃহ' (কাব্য): শ্রীবিধুভূষণ সরকার। বৈশাখ ১৩৩৭।

'কালিকামঙ্গল': বলরাম কবিশেখর-বিরচিত। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী-সম্পাদিত। চৈত্র ১৩৩৭।

'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ': শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈশাখ ১৩৩৮।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা: হরপ্রসাদের প্রাথমিক রচনাগুলি প্রধানতঃ বঙ্কিম-সঞ্জীব-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন: "তিনি আমাকে লিখিতে সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন। বঙ্কিমবাবুর উপর তখন আমার এরূপ টান যে, প্রতি মাসেই তাঁহাকে এক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিতাম। প্রবন্ধ লিখিয়া নাম করিব, এ মতলব আমার একেবারেই ছিল না, সে জন্যে কখনও প্রবন্ধে নাম সহি করিতাম না। একটা ইচ্ছা ছিল—হাত পাকাইব, আর এক ইচ্ছা—

বঙ্কিমবাবুকে খুশী করিব" ('নারায়ণ,' আষাঢ় ১৩২৫)। মাত্র একটি প্রবন্ধ ছাড়া, 'বঙ্গদর্শনে' মুদ্রিত আর কোন রচনায় হরপ্রসাদের নাম ছিল না। প্রকৃত কথা বলিতে কি, আজিকার দিনে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হরপ্রসাদের প্রাথমিক রচনাগুলি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা দুরূহ। 'বঙ্গদর্শন'-প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "আমি প্রায়ই লিখিতাম, কিন্তু কখনও নাম সই করি নাই। সেই জন্য এখন সেই সকল লেখা যে আমার, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইয়াছে।" যে-সময়ে তিনি এই কথাগুলি লেখেন, তাহার পর-বৎসরে (ইং ১৯১৬) হেয়ার প্রেস হইতে *Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri*, M. A., C. I. E., F A. S. B. নামে ২০ পৃষ্ঠার একখানি ইংরেজী পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ইহাতে হরপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ছাড়া, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার ইংরেজী-বাংলা প্রবন্ধগুলির তালিকাও আছে। বাংলা প্রবন্ধের তালিকায় 'বঙ্গদর্শন,' 'আর্য্যদর্শন,' 'নারায়ণ' ও 'বিভা'য় মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির নামের ইংরেজী অনুবাদ আছে। পুস্তিকাখানি আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে বিতরণের জন্যই মুদ্রিত হইয়াছিল।* ইহা যে হরপ্রসাদেরই রচনা, সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। ইহারই প্রসাদে আমরা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত তাঁহার রচনাগুলির নাম জানিতে পারিতেছি।†

---

* এই পুস্তিকাখানি আমি 'মডার্ণ রিভিয়ু' (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৪৯) পত্রে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি।

† "1. Bharat Mahila, 2. Two periods of our glory, 3. Kalidas and Shakespeare, 4. Why do we pay rent? 5. The aims and objects of human Life, 6. Sankaracharya, what was he? 7. The heroism of a Bengali Governor, 8. The vacant heart, 9. The Manusyatva of ancient Bengal and "Shining" in modern Bengal, 10. College Education, 11. Coining of new terms, 12. The Bengali Language,

আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হরপ্রসাদের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংলা রচনাগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :

১২৮৪	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ	'বঙ্গদর্শন'	* আমাদের গৌরবের দুই সময়
	জ্যৈষ্ঠ	'আর্য্যদর্শন'	যৌবনে সন্ন্যাসী
	শ্রাবণ	ঐ	প্রকৃত প্রণয় ও বিবাহ ["শ্রীশরৎ" স্বাক্ষরিত]
	শ্রাবণ	'বঙ্গদর্শন'	* ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ
	আশ্বিন	ঐ	* শঙ্করাচার্য্য কি ছিলেন ?
	পৌষ	ঐ	* বেদ ও বেদব্যাখ্যা
	পৌষ	'আর্য্যদর্শন'	ইক্ষু ["একজন চাষা" স্বাক্ষরিত] †
১২৮৫	বৈশাখ	'বঙ্গদর্শন'	* কালিদাস ও সেক্ষপীয়র
	আষাঢ়	ঐ	একজন বাঙ্গালি গবর্ণরের অদ্ভুত বীরত্ব
		ঐ	* সমাজের পরিবর্ত্ত কয় রূপ ?
	পৌষ	ঐ	* বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি
	ফাল্গুন	ঐ	* মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য
	চৈত্র	ঐ	* একসচেঞ্জ
		ঐ	* তৈল
১২৮৭	বৈশাখ	ঐ	স্বাধীন বাণিজ্য ও রক্ষা-কর

---

what it should be? 13. The Vedas and their interpretation, 14. The Bengali youth and three poets (Byron, Kalidas and Bankim), 15. The art of oiling, 16. Kalidas' Raghuvansa (in two issues), 17. Meghaduta (in two issues), 18. The Calcutta Review on the Tenancy Bill, 19. Bengali Literature (19th Century), 20. The system of paying Honoraria to Pandits, 21. Brahmanas and Sramanas, 22. Exchange, 23. Changes in Society, 24. Self Government, 25. Free trade and protection, 26. Education."

† ১৯১৬ সনে মুদ্রিত ইংরেজী পুস্তিকায় এই রচনার উল্লেখ নাই।

১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ	'বঙ্গদর্শন'	খাজনা কেন দিই ?
আষাঢ়	ঐ	* শিক্ষা
শ্রাবণ	ঐ	হৃদয়-উদাস
ভাদ্র	ঐ	* কালেজী শিক্ষা
কার্ত্তিক	ঐ	নূতন খাজানার আইন সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউর মত
অগ্রহায়ণ	ঐ	* ভট্টাচার্য্য-বিদায় প্রণালী
পৌষ	ঐ	যার কাজ সেই করুক†
ফাল্গুন	ঐ	* বাঙ্গালা সাহিত্য (বর্ত্তমান শতাব্দীর)। (ইহা যে হরপ্রসাদ কর্ত্তৃক সাবিত্রী লাইব্রেরিতে পঠিত, তাহার উল্লেখ আছে)
?	'কল্পনা'	* মোহিনী (খণ্ডকাব্য)
?	ঐ	* স্ত্রী-বিপ্লব
১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ	'বঙ্গদর্শন'	* নূতন কথা গড়া
আষাঢ়	ঐ	* সাবেক "মনুষ্যত্ব" ও হালের "সাইন করা"
শ্রাবণ	ঐ	* বাঙ্গালা ভাষা

† পূর্ব্বোল্লিখিত ইংরেজী পুস্তিকায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত Self Government নামে হরপ্রসাদের একটি রচনার উল্লেখ আছে। ইহা যে "যার কাজ সেই করুক" নামে প্রবন্ধ, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দিগ্ধ। প্রবন্ধের শেষ কয় পংক্তি এইরূপ :—"অতএব যেখানে যেখানে স্থানীয় মিউনিসিপাল শাসন আছে, নিজে মেম্বরনির্ব্বাচন করিবার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক, নহিলে কমিটী তোমাদের অর্থ শোষণ করিবে, তোমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে, তোমাদের কাছে বড় হইয়া, কর্ত্তার কাছে হাতযোড় থাকিবে। আর তোমাদের কোন কাজ হইবে না। তাই বলি যার কাজ সেই করুক। তোমাদের কমিশনর তোমরাই নির্ব্বাচন কর এ বিষয়ের আইনও আছে।" ঠিক এই বৎসরেই (ইং ১৮৮০) হরপ্রসাদ নৈহাটি মিউনিসিপালিটির কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১২৮৯	অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফাল্গুন	ঐ	মেঘদূত (সমালোচনা) +
১২৯০	কার্ত্তিক	'নব্যভারত'	* কলিকাতা দুই শত বৎসর পূর্ব্বে
	কার্ত্তিক, পৌষ	'বঙ্গদর্শন'	রঘুবংশ
১২৯৪	আশ্বিন, অগ্রহায়ণ	'বিভা'	কুশীনগর
	ফাল্গুন	ঐ	* মুসলমানী বাঙ্গালা (গুল্জু উজাল বিবীর কেচ্ছা)
১২৯৫	আষাঢ়	ঐ	* ভারতের লুপ্ত রত্নোদ্ধার (বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা)
	মাঘ, ফাল্গুন	ঐ	মুসলমানগণের সংস্কৃত চর্চ্চা
১৩০০	জ্যৈষ্ঠ	'সাহিত্য'	* কবি কৃষ্ণরাম
১৩০৪	১ম সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' (ত্রৈমাসিক)	রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল
	৪র্থ সংখ্যা	ঐ	কাঁটোযার নিকট প্রাপ্ত জৈন-পিত্তল-ফলক
১৩০৫	৩য় সংখ্যা	ঐ	ধোয়ী কবির পবনদূত
১৩০৭		'প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী'	বিদ্যাপতির পদাবলী (অসম্পূর্ণ)
১৩০৮	১ম সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	বাঙ্গালা ব্যাকরণ
১৩১৭	২য় সংখ্যা	ঐ	বৌদ্ধ-ঘণ্টা ও তাম্রমুকুট
১৩২১	বৈশাখ, আষাঢ়	'মানসী'	কলিকাতা-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ
	১ম সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	[পরিষদের] সভাপতির অভিভাষণ

+ ১৩০৯ সালে প্রকাশিত 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' পুস্তকের প্রারম্ভে হরপ্রসাদ লিখিয়াছেন—"অদ্য মেঘদূতের ব্যাখ্যা করিব। বিশ বছর পূর্ব্বে, একবার বঙ্গদর্শনে এই ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম।"

৪র্থ সংখ্যা	ঐ	সাহিত্য শাখার সভাপতির সম্বোধন (অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, বৰ্দ্ধমান)
	ঐ	হিন্দুর মুখে আরঙ্গেবের কথা
১৩২২ বৈশাখ	'নারায়ণ'	বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়
	ঐ	বাঙ্কমবাবু ও উত্তর-চরতি
ভাদ্র	ঐ	কালিদাসের মেয়ে দেখান
আশ্বিন	ঐ	সীতার স্বপ্ন
২য় সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	সম্বোধন [পরিষদের সভাপতির]
কার্ত্তিক	'নারায়ণ'	দুর্গোৎসবে নবপত্রিকা
অগ্রহায়ণ, বৈশাখ ১৩২৩	ঐ	রাধামাধবোদয়
ফাল্গুন	ঐ	কালিদাসের বসন্ত বর্ণনা
১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ	'নারায়ণ'	ইরাবতী
আষাঢ়	ঐ	পাৰ্ব্বতীর প্রণয়
ভাদ্র, আশ্বিন	ঐ	তীর্থ-ভ্রমণ (সমালোচনা)
আশ্বিন	'নারায়ণ'	দুর্গাপূজা
১৩২৩ ২য় সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	সম্বোধন [পরিষদের সভাপাতর]
ফাল্গুন	'নারায়ণ'	উর্ব্বশী-বিদায়
১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ	'নারায়ণ'	বিরহে পাগল
আষাঢ়	'নারায়ণ'	কোমলে কঠোর
	'উদ্বোধন'	বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম
শ্রাবণ	'নারায়ণ'	কণ্বের কোমল মূর্ত্তি
ভাদ্র	'নারায়ণ'	মেদিনীপুর পরিষদে সভাপতির কথা
আশ্বিন-কার্ত্তিক	'নারায়ণ'	কণ্বের কঠোর মূর্ত্তি
	'নারায়ণ'	শকুন্তলার মা
অগ্রহায়ণ	'নারায়ণ'	দুষ্মন্তের ভাঁড়ঃমাধব্য
পৌষ	'নারায়ণ'	দুর্ব্বাসার শাপ

১৩২৪	মাঘ	'নারায়ণ'	শকুন্তলার হিঁদুয়ানী
	ফাল্গুন	ঐ	এক এক রাজার তিন তিন রাণী
১৩২৫	বৈশাখ	ঐ	অগ্নিমিত্রের ভাঁড়
	জ্যৈষ্ঠ	ঐ	কুমারসম্ভব—সাত না সতেরো সর্গ
	আষাঢ়	ঐ	বঙ্কিমচন্দ্র
	শ্রাবণ	ঐ	রঘুবংশের গাঁথুনি
	ভাদ্র	ঐ	রঘুতে নারায়ণ
	আশ্বিন	ঐ	রঘু আগে কি কুমার আগে ?
	কার্ত্তিক	ঐ	অজবিলাপ ও রতিবিলাপ
	অগ্রহায়ণ	ঐ	রঘুকাব্য বড় কিসে ?
	পৌষ	ঐ	রঘুবংশে বাল্যলীলা
	ফাল্গুন	ঐ	রামের ছেলেবেলা
	চৈত্র	ঐ	রঘুবংশে প্রেম
১৩২৬	জ্যৈষ্ঠ	ঐ	রঘুবংশে প্রেম—বিরহ
	ভাদ্র	'সাহিত্য'	রামেন্দ্রবাবু
	পূজা-বার্ষিকী	'আগমনী'	বামুনের দুর্গোৎসব
	২য় সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	চণ্ডীদাস
১৩২৭	১ম সংখ্য	ঐ	বাঙ্গালার পুরাণ অক্ষর
	শ্রাবণ	'প্রবাসী'	লাইব্রেরী
	কার্ত্তিক	'মানসী ও মর্ম্মবাণী'	অর্দ্ধেন্দু-কথা
১৩২৮	৩য় সংখ্যা	'সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা'	'ব্রহ্মা' প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা
		ঐ	মহাদেব
১৩২৯	জ্যৈষ্ঠ	'মাসিক বসুমতী'	নাট্যকলা
	১ম সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,	[পরিষদের] সভাপতির অভিভাষণ
	শ্রাবণ, ভাদ্র	'মাসিক বসুমতী'	বঙ্কিমচন্দ্র
	ভাদ্র	'প্রবাসী'	কান্তকবি রজনীকান্ত (সমালোচনা)
		'ভারতী'	স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার
	৪র্থ সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	চণ্ডীদাস

১৩৩০ শ্রাবণ	'প্রাচী'	ডাক ও খনা
ভাদ্র	ঐ	বিদ্যাপতি
কার্ত্তিক	'প্রবর্ত্তক'	পালবংশের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থা
অগ্রহায়ণ	'প্রাচী'	ব্রাত্য
১৩৩১ বৈশাখ	'সুবর্ণবণিক্ সমাচার'	৺দেবেন্দ্রবিজয় বসুর কথা (পৃ. ২৩০-৩১)
৯ জ্যৈষ্ঠ, ২৭ আষাঢ়	'নাচঘর' (সাপ্তাহিক)	অর্দ্ধেন্দুশেখর
২য় সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ
কার্ত্তিক	'মানসী ও মর্ম্মবাণী'	থানাকুল-কৃষ্ণনগর (রাধানগর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে মূল সভাপতির অভিভাষণ)
৪র্থ সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	৺প্যারীচাঁদ মিত্র
১৩৩২ শ্রাবণ	'মাসিক বসুমতী'	বাঙ্গালা সাহিত্যে চিত্তরঞ্জন
২০ চৈত্র	'নবযুগ' (সাপ্তাহিক)	কয়টী তারিখ (নৈহাটি সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত)
৪র্থ সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	আমাদের ইতিহাস
১৩৩৩ ১ম সংখ্যা	ঐ	৺রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
শ্রাবণ	'মানসী ও মর্ম্মবাণী'	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে শোক-সভা
	'ভারতবর্ষ'	শ্রীকৃষ্ণ (সমালোচনা)
পূজা-বার্ষিকী	'বার্ষিক বসুমতী'	পাঁচ ছেলের গল্প
২য় সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন ?
অগ্রহায়ণ	'ভারতবর্ষ'	ঋষির মেয়ে (সমালোচনা)
	'প্রবাসী'	বৃহত্তর ভারত-পরিষদে আশীর্ব্বাদ-পত্র
অগ্রহায়ণ-পৌষ	'মাসিক বসুমতী'	গুরুদাস-স্মৃতি

১৩৩৪ পূজা-বার্ষিকী	'বার্ষিক বসুমতী'	ব্যাবোগী টিব্বা
কার্ত্তিক	'মাসিক বসুমতী'	ঝিল্লী
অগ্রহায়ণ	'সুবর্ণবণিক্ সমাচার'	৺অধরলাল সেন
১৩৩৫ ১ম সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	[পরিষদের] সভাপতির অভিভাষণ—ভারতবর্ষের ইতিহাস কোথা হইতে আরম্ভ করা উচিত ?
১৩৩৬ আষাঢ়	'পঞ্চপুষ্প'	ভরতের নাট্যশাস্ত্র
১ম সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	[পরিষদের] সভাপতির অভিভাষণ—বাঙ্গালার বৌদ্ধ সমাজ
মাঘ	'মাসিক বসুমতী'	কামন্দকীয় নীতিসার
	'প্রবাসী'	কালিদাসের অভিধান
১৩৩৭ ভাদ্র	'পঞ্চপুষ্প'	ভরত মল্লিক
আশ্বিন	'প্রবাসী'	অভিধান (সমালোচনা)
২য় সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	[পরিষদের] সভাপতির অভিভাষণ
৩য় সংখ্যা	ঐ	চিরঞ্জীব শর্ম্মা
৪র্থ	ঐ	কাশীনাথ বিদ্যানিবাস
১৩৩৮ ১ম সংখ্যা	ঐ	রত্নাকরশান্তি
২য় সংখ্যা	ঐ	বৃহস্পতি রায়মুকুট
৩য় সংখ্যা	ঐ	বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার
পৌষ	'মাসিক বসুমতী'	এস, এস বঁধু এস—আধ আঁচরে ব'স
মাঘ-ফাল্গুন	ঐ	ভবভূতি
চৈত্র	ঐ	মহামহোপাধ্যায় মহাকবি মুরারিদান
৪র্থ সংখ্যা	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার

১৩৩৯ ১ম সংখ্যা	‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’	পুরুষোত্তমদেব
কার্ত্তিক	‘পঞ্চপুষ্প’	সিংহল-দ্বীপ
মাঘ	‘বঙ্গশ্রী’	ভারতবর্ষের ধর্ম্মের ইতিহাস
১৩৪০ মাঘ	ঐ	পুরাণ বাঙ্গালার একটা খণ্ড

তারকা-চিহ্নিত রচনাগুলি ১৯৩২ সনের ডিসেম্বর মাসে বসুমতী-কার্য্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ‘হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী’তে (৫ খানি বাংলা গ্রন্থের সহিত) মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা ‘বঙ্গদর্শনে’ মুদ্রিত “বাঙ্গালা ভাষা” নামে একটি প্রবন্ধও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। এই প্রবন্ধটির উল্লেখ কিন্তু ইংরেজী পুস্তিকায় ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত হরপ্রসাদের প্রবন্ধ-তালিকায় নাই। থাকিবার কথাও নহে; ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯২ সনে তাঁহার ‘বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগে’ ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলীর সঙ্কলনকর্ত্তা যিনিই হউন, ইহা আদৌ লক্ষ্য করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বগামীর অনবধানতাই তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। পরলোকগত প্রত্নতাত্ত্বিক রমাপ্রসাদ চন্দই এই মারাত্মক ভুলের স্রষ্টা (‘পঞ্চপুষ্প,’ কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৮, পৃ. ৯০৮ দ্রষ্টব্য)। ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা (*Indian Hist. Quarterly*, ix. 380) ও আরও কেহ কেহ ইহার প্রভাবমুক্ত হইতে পারেন নাই।

রচনাবলী—ইংরেজী

পুস্তক-পুস্তিকা: হরপ্রসাদের রচিত যে কয়েকখানি ইংরেজী পুস্তক-পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি—

1891. *Vernacular Literature of Bengal before the Introduction of English Education.* 16 pp.

কম্বুলিয়াটোলা রীডিং ক্লাবে প্রদত্ত বক্তৃতা।

1897. *Discovery of Living Buddhism in Bengal.* 31 pp.
The Study of Sanskrit 16 pp. A paper read at a meeting of the Calcutta University Teachers' Association.

1907. *Malavikagnimitra.* 17 pp.

1916. *The Educative Influence of Sanskrit.* 31 pp.
কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর-স্থাপন উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা।

1917. *Bird's-Eye View of Sanskrit Literature.* 32 pp.

1922. *Presidential Address, Sanskrit and Prakrit Section.* Second Oriental Conference, Calcutta. 14 pp.

1923. *Magadhan Literature.* 133 pp.
১৯২০-২১ সনে পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ছয়টি বক্তৃতা।

1925. *Lokayata.* 6 pp. Dacca University Bulletin No. I.

1926. *Absorption of the Vratyas.* 9 pp. Dacca University Bulletin No. 6.

1928. *Sanskrit Culture in Modern India.* 43 pp.
লাহোরে অনুষ্ঠিত ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সের ৫ম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ।

পাঠ্য পুস্তকঃ হরপ্রসাদের লিখিত ইংরেজী পাঠ্য পুস্তকগুলির মধ্যে ১৮৯৫ সনে প্রকাশিত *History of India* বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রবন্ধাবলী ও ভূমিকাঃ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ পত্রিকায়—বিশেষ করিয়া এশিয়াটিক সোসাইটির জর্নাল, প্রোসিডিংস্ ও মেমোয়ারে

(১৮৯০-১৯২৯), এবং বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির জর্নালে (১৯১৫-৩৮) পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত হরপ্রসাদের বহু প্রবন্ধ আত্মগোপন করিয়া আছে। তাঁহার সমগ্র ইংরেজী রচনার তালিকা ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা ১৯৩৩ সনের *Indian Historical Quarterly* পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

হরপ্রসাদ কোন কোন ইংরেজী গ্রন্থেরও ভূমিকা লিখিয়াছেন। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে ১৯১১ সনে প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথ বসুর *The Modern Buddhism and its Followers in Orissa*-র নমোল্লেখ করা যাইতে পারে।

উপসংহার

হরপ্রসাদের সম্পূর্ণাঙ্গ জীবনী এখনও রচিত হইবার অপেক্ষায় আছে। আমরা যথাসাধ্য উপকরণ সংগ্রহ করিলাম। 'হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা'র (২য় খণ্ড) সম্পাদকীয় নিবেদনে সত্যই বলা হইয়াছে—"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙ্গালী জাতির পূর্ব্বকথা, তথা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও চর্য্যা আলোচনায় শাস্ত্রী মহাশয় অনন্যসাধারণ প্রতিভা এবং কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।" সে পরিচয় এখনও পূরাপূরি উদ্ঘাটিত হয় নাই। বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি—ইহা তাঁহারই কথা। আমরা ধীরে ধীরে আত্মসচেতন হইতেছি, সুতরাং ভরসা আছে, হরপ্রসাদও এক দিন পূর্ণ মহিমায় প্রতিভাত হইবেন।

হরপ্রসাদের ভাষাবৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। সহজ প্রাঞ্জল ভাষার তিনি অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন, দেশজ শব্দ পাইলে তৎসম বা তৎভব শব্দ ব্যবহার করিতেন না। ভাষা ও বাক্যরীতিতে তিনি

যথাসাধ্য জটিলতা পরিহার করিয়া চলিতেন। তাঁহার সাহিত্যবুদ্ধি প্রখর ছিল, সৃষ্টিপ্রতিভা ছিল এবং সর্ব্বোপরি ছিল স্বজাতি ও স্বদেশ-প্রীতি। বাঙালী জাতির প্রাচীন কীর্ত্তি ও মহিমা আবিষ্কারে তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। একটি আশীর্ব্বাদ-পত্রের মধ্যে আমরা শাস্ত্রী-মহাশয়ের সুগভীর দেশপ্রেমের পরিচয় পাই। সেটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

> যাহারা নিজের উন্নতি করিতে চায় তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি। যাহারা বাঙ্গালাভাষার উন্নতি করিতে চেষ্টা করে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি। যাহারা দেশের জন্য কাঁদে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি। যাহারা দেশের জন্য ভাবে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি। যাহারা দেশের জিনিষ ব্যবহার করে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি। যাহারা আপনার দেশকে সকলের চেয়ে বড় বলিয়া মনে করে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি। যাহারা আপনার দেশের পুরাণ কথা লইয়া আলোচনা করে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি। যাহারা হিন্দু ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি। আর যাহারা ছেলেবেলা হইতে দল বাঁধিয়া দেশের কার্য্য করিবার জন্য উদ্যোগ করে মনের সহিত তাহাদের আশীর্ব্বাদ করি। ('ধ্রুবতারা,' আশ্বিন ১৩৫৫)

'হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা'য় মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত শাস্ত্রী-মহাশয়ের তুলনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> এখানে রাজেন্দ্রলালের উল্লেখ করবার কারণ এই যে, আমার মনে এই দুই জনের চরিত-চিত্র মিলিত হয়ে আছে। উভয়েরই অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা একই শ্রেণীর। উভয়েরই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল পারদর্শিতা,—যে কোনো বিষয়ই তাঁদের আলোচ্য ছিল, তার জটিল গ্রন্থিগুলি অনায়াসেই মোচন ক'রে দিতেন। জ্ঞানের গভীর

ব্যাপকতার সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার যোগে এটা সম্ভবপর হয়েছে। তাদের বিদ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধন-প্রণালী সম্মিলিত হয়ে উৎকর্ষলাভ করেছিল। অনেক পণ্ডিত আছেন, তারা কেবল সংগ্রহ করতেই জানেন, কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন না; তাঁরা খনি থেকে তোলা ধাতুপিণ্ডটার সোনা এবং খাদ অংশটাকে পৃথক্ করতে শেখেন নি ব'লেই উভয়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল বোঝা ভারী করেন। হরপ্রসাদ যে যুগে জ্ঞানের তপস্যায় প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন, সে যুগে বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানের উপাদানগুলি শোধন ক'রে নিতে শিখেছিল। তাই স্থূল পাণ্ডিত্য নিয়ে বাঁধা মত আবৃত্তি করা তাঁর পক্ষে কোনোদিন সম্ভবপর ছিল না। বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা নেই, এইটেই আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখতে পাই,—অধিকাংশ স্থলেই আমরা কম শিক্ষায় বেশী মার্কা পাবার অভিলাষী। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সাধকের দলে, এবং তাঁর ছিল দর্শনশক্তি।

যে কোনো বিষয় শাস্ত্রী মহাশয় হাতে নিয়েছেন, তাকে সুস্পষ্ট ক'রে দেখেছেন এবং সুস্পষ্ট ক'রে দেখিয়েছেন। তাঁর রচনায় খাঁটি বাংলা যেমন স্বচ্ছ ও সরল এমন তো আর কোথাও দেখা যায় না। বিদ্যার সংগ্রহ ব্যাপাব অধ্যবসায়ের দ্বারা হয়, কিন্তু তাকে নিজের ও অন্যের মনে সহজ ক'রে তোলা ধী-শক্তির কাজ। এই জিনিষটি বড়ো বিরল। তবু, জ্ঞানের বিষয় প্রভূত পরিমাণে সংগ্রহ করার যে পাণ্ডিত্য তার জন্যেও দৃঢ় নিষ্ঠার প্রয়োজন; আমাদের আধুনিক শিক্ষাবিধির গুণে সেই নিষ্ঠার চর্চ্চাও শিথিল। ধ্বনি দ্বিগুণিত করার এক রকম যন্ত্র আজকাল বেরিয়েছে, তাতে স্বাভাবিক গলার জোর না থাকলেও আওয়াজে আসর ভরিয়ে দেওয়া যায়। সেই রকম উপায়েই অল্প জানাকে তুমুল ক'রে ঘোষণা করা এখন সহজ হয়েছে। তাই বিদ্যার সাধনা হাল্‌কা হয়ে উঠল, বুদ্ধির তপস্যাও ক্ষীণবল। যাকে বলে মনীষা, মনের যেটা চরিত্রবল, সেইটের অভাব ঘটেছে।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৭৪

গোবিন্দচন্দ্র দাস

১৮৫৫—১৯১৮

গোবিন্দচন্দ্র দাস

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩৷১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস স্বাভাবিক কবি-প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ঘটনাবহুল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ; সারা জীবন দুঃখ-দৈন্যের সহিত সংগ্রামে তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত হইতে হইয়াছে। জীবিতকালে দেশবাসী তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত সমাদর করে নাই। কিন্তু শত প্রতিকূলতাসত্ত্বেও তাঁহার সাহিত্য-সাধনা আমৃত্যু অক্ষুণ্ণ ছিল। গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যের তাৎপর্য্য সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে হইলে তাঁহার দুঃখ-দৈন্য-পীড়িত জীবনের ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক; কারণ, তাঁহার কাব্যপ্রেরণা, ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনের অনেক ছোটখাটো ঘটনা ও সুখ-দুঃখকে কেন্দ্র করিয়া উৎসারিত হইয়াছে।

জন্ম : শৈশব-শিক্ষা

গোবিন্দচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষদের নিবাস ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহেশ্বরদী পরগণার একটি ক্ষুদ্র গ্রামে। তাঁহার পিতামহ—শূদ্রবংশ-সম্ভূত ভোলানাথ দাস ঋণের দায়ে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভাওয়াল-জয়দেবপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। অরণ্যসঙ্কুল ভাওয়াল প্রদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। এখানকার সুদূর-প্রসারিত নিবিড় অরণ্যানীসমূহ দীর্ঘকায় গজারি-বৃক্ষে পরিপূর্ণ। বনের মাঝে মাঝে ছোট ছোট টিলা। ঘন বনের ভিতর দিয়া স্বল্পতোয়া চিলাই নদী প্রবহমাণ। প্রকৃতির এই লীলানিকেতন ভাওয়ালের জয়দেবপুরে ১৮৫৫ সনের ১৬ই জানুয়ারি (৪ মাঘ ১২৬১) গোবিন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশবে জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবনে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর

লীলা সুরু হইল। তাঁহার বয়স যখন মাত্র পাঁচ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা রামনাথ দাসের মৃত্যু হয়। তাঁহাদের পরিবারটি নেহাৎ ছোট ছিল না। গোবিন্দচন্দ্রের পিতামহ ও পিতামহী তখনও বর্ত্তমান। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর জগচ্চন্দ্র দাস (জগদ্বন্ধু দাস) তখন সূতিকাগারে। গোবিন্দচন্দ্রের পিতাই ছিলেন পরিবারের এক মাত্র উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি ; তাঁহার মৃত্যুতে গোবিন্দচন্দ্রের বিধবা মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, নাবালক পুত্র এবং নবজাতকটিকে লইয়া যেন অকূল পাথারে পড়িলেন, তাঁহাদের দু-বেলা দু-মুঠা অন্ন জোটাই দুষ্কর হইয়া উঠিল। এই দরিদ্র পরিবারের শোচনীয় দুরবস্থা দেখিয়া ভাওয়ালের ভূস্বামী উদারহৃদয় কালীনারায়ণ রায় বিচলিত হইলেন। তিনি এই পরিবারকে মাসিক চার টাকা সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিলেন। কিছু কাল পরে এই বৃত্তির পরিবর্ত্তে তিনি তাঁহাদিগকে কতক নিষ্কর জমি প্রদান করেন।

নানা কারণে গোবিন্দচন্দ্রের লেখাপড়া বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিবার পর তাঁহার অক্ষর-পরিচয় আরম্ভ হয়। কিন্তু লেখাপড়ায় এই পল্লী-বালকের বড়-একটা মনোযোগ ছিল না—খেলা-ধূলার প্রতি ছিল তাঁহার প্রবল আসক্তি।

ভাওয়াল-রাজপরিবারের সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের জীবন অবিচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত। রাজা কালীনারায়ণের অনুগ্রহে শৈশবকাল হইতেই রাজবাটীর সহিত গোবিন্দচন্দ্রের যোগাযোগের সূত্রপাত হয়। দরিদ্রের সন্তান গোবিন্দচন্দ্র রাজবাড়ীতে রাজদুহিতা কৃপাময়ী দেবীর সঙ্গে কলাপাতায় লেখা অভ্যাস করেন। কৃপাময়ী গোবিন্দচন্দ্রকে নিজের ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করিতেন, হাতে ধরিয়া তাঁহাকে লিখিতে শিখাইতেন। এই রাজদুহিতার অপার স্নেহপ্রীতির কথা স্মরণ

করিয়া উত্তর-জীবনে গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার 'প্রেম ও ফুল' কাব্যে লিখিয়াছিলেন :—

আজিও কি আছে মনে ভোল নি ভগিনি !
দুই জন এক সাথে, লিখেছি কলার পাতে,
হাতে ধরি শিখায়েছ আদরে আপনি !
কেবল তোমার স্নেহে, আজো প্রাণ আছে দেহে,
কৃপাময়ি করুণার তুমি নির্ঝরিণী !

তখন সবে মাত্র রাজা কালীনারায়ণের চেষ্টায় জয়দেবপুরে বাংলা ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। ঐ বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য গোবিন্দচন্দ্রের একান্ত আগ্রহ জন্মিল। তিনি স্কুলে পড়িবেন বলিয়া বায়না ধরিলেন। তাঁহার মা ও পিতামহী মহা দুর্ভাবনায় পড়িলেন— স্কুলের বেতন দু-পয়সা আর 'শিশুশিক্ষা'র দাম এক আনা, এই দেড় আনা পয়সা জোগাড় হয় কি করিয়া! এই সংবাদ যখন রাজবাড়ীতে রাণী সত্যভামার নিকট গিয়া পৌছিল, তখন তিনি এই দরিদ্র বালকের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এই পিতৃহারা বালককে তিনি তাঁহাদের পর্ণকুটীর হইতে রাজপ্রাসাদে লইয়া গিয়া পরম যত্নে আশ্রয় দিলেন। রাজবাড়ীতে তাঁহার আহারের এবং কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের সহিত শয়নের ব্যবস্থা হইল। রাণী সত্যভামা বালক গোবিন্দচন্দ্রকে নিজের সন্তানের মত ভালবাসিতেন, কখন কখন খাওয়ার সময় নিজের হাতে ভাতের গ্রাস মাখিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিতেন। সত্যভামা শীঘ্রই তাঁহাকে স্কুলে ভর্তি করাইয়া দিয়া তাঁহার বিদ্যালাভের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার পথ করিয়া দিলেন। এমনই ভাবে রাজপুরীতে রাণী-মায়ের স্নেহচ্ছায়াতলে

গোবিন্দচন্দ্র মানুষ হইতে লাগিলেন। রাজপ্রাসাদেই তাঁহার শৈশব কাল অতিক্রান্ত হইল।

অতি অল্প বয়সেই গোবিন্দচন্দ্রের কবিত্বশক্তির উন্মেষ হইয়াছিল। তাঁহার বয়স যখন তেরো-চৌদ্দ, তখনই তিনি জয়দেবপুর স্কুলের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'য় স্বরচিত কবিতা পাঠ করিতেন। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যালয় ছাড়িবার পর রাজা কালীনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত 'প্রজাহিতৈষিণী সভা'তেও গোবিন্দচন্দ্র নিজের লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। কবিতা-পাঠ শুনিয়া গুণগ্রাহী রাজা কালীনারায়ণ বুঝিতে পারিলেন যে, এই বালকের মধ্যে প্রতিভার বীজ সুপ্ত রহিয়াছে; দারিদ্র্যনিবন্ধন উপযুক্ত শিক্ষালাভের সুযোগ না ঘটিলে তাহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। তিনি গোবিন্দচন্দ্রের অধ্যয়নের জন্য মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই সাহায্য পাইয়া গোবিন্দচন্দ্র ঢাকা নর্ম্যাল স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। এখানে তিনি কিছু সংস্কৃতও শিখিয়াছিলেন।

বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দচন্দ্র বাড়ীতে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু বেশী দিন তাঁহাকে বেকার থাকিতে হইল না। রাজা কালী-নারায়ণ তাঁহাকে ভাওয়ালের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগ্রামে নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গবিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

কিন্তু পণ্ডিতি বেশী দিন তাঁহার ভাল লাগিল না। মাত্র মাস-কয়েক কাজ করিবার পর নিজের ইচ্ছায় ঐ চাকুরী ছাড়িয়া তিনি ঢাকায় সদ্যপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। রাণী সত্যভামা এখানে তাঁহার অধ্যয়নের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেন। এই বিদ্যালয়ে শবব্যবচ্ছেদের ব্যাপারটা তাঁহার বরদাস্ত হইল না, এবং কিছু

দিন পরেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই তিনি মেডিক্যাল স্কুল ছাড়িয়া দিলেন। নিজের দোষে গোবিন্দচন্দ্রের শিক্ষালাভ আশানুরূপ হইতে পারে নাই। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অব্যবস্থিতচিত্ত লোক, কোন কিছুতে বেশী দিন লাগিয়া থাকা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

রাজসংসারের সংস্রব বর্জন

বৃদ্ধ হওয়ায় রাজা কালীনারায়ণ এক মাত্র পুত্র ও রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী, অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজেন্দ্রনারায়ণের মুখ চাহিয়া এক জন উপযুক্ত প্রতিনিধি এবং অভিভাবকের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি পড়িল—'বান্ধব'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের উপর; তাঁহার প্রখর বুদ্ধি ও বিদ্যাবত্তার কথা জয়দেবপুরে অবিদিত ছিল না, বিশেষতঃ তিনি কুমারেরও শ্রদ্ধার পাত্র; কুমার তাঁহারই সভাপতিত্বে জয়দেবপুরে সাহিত্য-সমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন (ইং ১৮৭৬)। রাজা কালীনারায়ণ ভাবিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিলে রাজেন্দ্রনারায়ণ উপযুক্ত শিক্ষালাভ ও রাজকার্য্য-পরিচালনায় পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবে। কালীপ্রসন্ন তখন ঢাকা ছোট আদালতের হেড ক্লার্ক। রাজার আমন্ত্রণে তিনি সে-কাজ ছাড়িয়া ভাওয়ালে আসিলেন। কালীনারায়ণ তাঁহাকে ভাওয়ালের সর্ব্বপ্রধান রাজকর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করিলেন (২৮ মার্চ ১৮৭৭) এবং কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণকেও তাঁহারই হাতে সঁপিয়া দিলেন। অতঃপর নিশ্চিন্ত মনে বৃদ্ধ রাজা কলিকাতা যাত্রা করেন এবং চক্ষু-চিকিৎসা করাইয়া তথা হইতে তীর্থপর্য্যটনে বাহির হন।

রাজার অনুপস্থিতিকালে ভাওয়াল-রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা

দিল। রাজকার্য্যে কুমারের অমনোযোগ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। যাবতীয় রাজকার্য্য পরিচালনার ভার তিনি কালীপ্রসন্নের হস্তে অর্পণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে কালীপ্রসন্নই ভাওয়াল-রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে রাজার এই অবহেলার ফল অচিরেই শোচনীয়ভাবে দেখা দিল। রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচার-উৎপীড়নে প্রজারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তদুপরি সমগ্র রাজ্য জুড়িয়া সুরু হইল দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবলীলা। প্রজাদেব দুর্গতির আর পরিসীমা রহিল না। রাজা রাজ্যের দুর্দ্দশায় অবিচলিত, প্রজাদের দুঃখ-দুর্গতি প্রতিকারের কোনও আশা নাই।

প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভাওয়ালের এই দুরবস্থা দেখিয়া গোবিন্দচন্দ্রের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—তিনি রাজা কালীনাবায়ণেব অনুপস্থিতিকালে কুমারের প্রাইভেট সেক্রেটরি বা পার্শ্বচর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কুমাবকে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিবাব জন্য বার বার তিনি তাঁহার গুরু দায়িত্বের কথা স্মবণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। যথাসময় এ কথা কালীপ্রসন্নের কানে গিযা পৌছিল। ইহাতে তিনি গোবিন্দচন্দ্রের উপর অত্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের নিজের কথায়—

"আমাকে কিরূপে রাজার নিকট হইতে তাড়াইয়া, তাহার অনুগত ও বাধ্য লোক রাজার নিকটে আমার কার্য্যে নিযুক্ত করিবে, এখন তাহার সেই চেষ্টা হইল। কিন্তু আমার কোন ত্রুটি না পাইলেও অন্য কারণে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল" (পত্র)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রাজা কালীনারায়ণ পুত্রের উপর রাজকার্য্য পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া তীর্থভ্রমণে চলিয়া যান। বৃদ্ধ রাজার অনুপস্থিতিতে তাঁহার কোন কোন আত্মীয় নিঃশঙ্কচিত্তে নানাবিধ পাপাচরণে লিপ্ত হইলেন। এক দিন শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়)

শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ছোট) এবং ব্যাঙ্গা নামে এক খানসামা —এই তিন জনে একত্রে প্রচুর মদ্য পান করিয়া মাতাল-অবস্থায় কুঅভিপ্রায়ে গ্রামবাসী বেচু শিকদারের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়। বেচু তখন বাড়ীতে ছিলেন না। দুর্বৃত্তেরা ঘরের দেওয়ালে বার বার আঘাত করিতে থাকে এবং দরজা খুলিয়া দিতে হুকুম করে। বেচুর স্ত্রী ইহাতে অত্যন্ত ভয় পাইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। বেচুর এক ভৃত্য দুর্বৃত্তদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলে তাহারা সে বেচারাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিয়া পলায়ন করে।

বেচু শিকদার বাড়ী ফিরিয়া আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং পর-দিন রাজদরবারে হাজির হইয়া রাজার আত্মীয়দ্বয় এবং ব্যাঙ্গা খানসামার বিরুদ্ধে নালিশ করিলেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষের উপর বিচারের ভার পড়িল। তিনি শ্যামাচরণ-দ্বয়কে বেকসুর খালাস দিয়া এবং ব্যাঙ্গা খানসামার মাত্র পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড করিয়া ন্যায়বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন! এই অভিনব বিচারে ভাওয়ালের প্রজাদের বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিল। বেচুর কাতর ক্রন্দনে কোমলহৃদয় গোবিন্দচন্দ্র বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং এই অপরাধিত্রয়ের পুনর্বিচারের ব্যবস্থা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই ব্যাপারে স্বয়ং রাজা ও রাজকর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে এক সামান্য প্রজার পক্ষ সমর্থন করিয়া গোবিন্দচন্দ্র যে তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। তাহা ছাড়া প্রজাদের সংঘবদ্ধভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে যে-ভাবে তিনি অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার কুসুমকোমল কবি-হৃদয় যে অবস্থা-বিশেষে বজ্রের মত কঠোর হইতে পারিত এবং তিনি যে কিরূপ জেদী প্রকৃতির ছিলেন, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন—

"যথাসময়ে আমি চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম। রাজাকে আমি অনেক বলিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুই ফল হইল না। তখন রাজাকে বাধ্য করিয়া বিচার করাইবার জন্য আমার জিদ্ হইল। আমি জয়দেবপুরের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধোপা, নাপিত, চণ্ডাল প্রভৃতি সর্ব্বজাতির ও সর্ব্বশ্রেণীর লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলাম, আজ বেচুর বাড়ী যে ঘটনা হইয়াছে, অপরাধীরা যদি তাহার জন্য উপযুক্তরূপে দণ্ডিত না হয়, তবে কাল তোমাদের বাড়ীতে যে সেই কাণ্ড করিবে না, তাহার বিশ্বাস কি? ভবিষ্যতে নিজের মান ইজ্জত রক্ষার জন্য, বেচুর বাড়ীর এই ঘটনার উপযুক্ত প্রতিকার করার জন্য, সকলেরই প্রাণপণে যত্ন-চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সভা-সমিতি করিয়া জয়দেবপুরবাসী সকলকে এ কথা বুঝাইয়া একদলভুক্ত করিলাম এবং সকলকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিলাম যে, রাজা যদি পুনরায় ইহার ন্যায়বিচার না করেন, তবে আমরা নিজে ইহার বিচার-ভার গ্রহণ করিয়া ব্যাঙ্গা ও শ্যামাচরণদ্বয়কে উপযুক্ত শাস্তি দিব এবং ভবিষ্যতে আর কোন ভাওয়ালবাসী প্রজা যেন রাজবাড়ী বিচারপ্রার্থী না হয়, তাহার জন্যও বিহিত উপায় অবলম্বন করিব" (পত্র)।

গোবিন্দচন্দ্র অনতিবিলম্বে স্বীয় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে ভাওয়ালের প্রজাসাধারণ এক দিন রাজবাটীতে সরাসরি স্বয়ং রাজার নিকট গিয়া হাজির হইল। প্রজাদের এই সংহতি দেখিয়া এবং তাহাদের দৃঢ় সংকল্পের কথা শুনিয়া রাজা রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন এবং পুনর্বিচারের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হইলেন।

এবার রাজা স্বয়ং এবং কালীপ্রসন্ন—এই দুই জনে মিলিয়া বিচার করিলেন। বিচারফলে শ্যামাচরণদ্বয় চিরতরে কর্ম্মচ্যুত হইলেন।

ব্যাঙ্গার ৫০০৲ অর্থদণ্ড হইল এবং তাহাকে এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইল যে, যত দিন তাঁহার সচ্চরিত্রতা প্রমাণিত না হয়, তত দিন একটা নির্দ্দিষ্ট চতুঃসীমার মধ্যে সে ছাতা-মাথায়, জুতা পায়ে বিচরণ করিতে পারিবে না।

প্রথম অপরাধের বিচার হিসাবে এই শাস্তিকে খুব লঘু দণ্ড বলা যায় না। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। বেচুর অপমানে তাঁহার মর্ম্মস্থলে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছিল, অপরাধিত্রয়ের এই শাস্তি তাহাতে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে পারিল না। তাঁহার আত্মসম্মানজ্ঞান ছিল প্রবল। বেচুর অপমানকে নিজের, তথা সমগ্র ভাওয়ালের প্রজাসাধারণের অপমান বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। তাই যেখানে পাপাচরণকারীর উপযুক্ত শাস্তি বিধান হয় না, সেই রাজসরকারের চাকরিতে ইস্তফা দেওয়াই তিনি স্থির করিলেন। তাঁহার ভাষায়—

> "সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে রাজার চাকরি ইস্তফা দিলাম।...আমার জিম্মায় রাজার যে সকল কাগজপত্র, টাকাকড়ি, নোট ইত্যাদি ছিল, তাহা ঐ প্রকাশ্য সভায় বুঝাইয়া দিয়া, রাজার নিকট বাক্সের চাবি দিলাম। এই হইতে জয়দেবপুরের চাকরি আমার ক্ষান্ত হইল।...প্রকারান্তরে কালীপ্রসন্ন ঘোষের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সে তাহার অনুগত লোক, রাজার নিকট আমার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিল।"

গোবিন্দচন্দ্র রাজগৃহের কর্ম্মত্যাগ করিবার অনতিকাল পরেই রাজা কালীনারায়ণ রায়ের মৃত্যু হইল (১৬ জুন ১৮০৮)। রাজেন্দ্রনারায়ণ তখন রাজ্যের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। এখন রাজকার্য্যে তাঁহার অধিকতর অমনোযোগ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। নিজের

বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ করাই যেন তাঁহার জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। এক পক্ষ কাল পরে তিনি একখানি দলিল সম্পাদন-পূর্ব্বক কালীপ্রসন্ন ঘোষকে ভাওয়াল-রাজ্যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী করিয়া দিলেন।

অন্ন-সংস্থানে প্রবাসযাত্রা

পনর বৎসর বয়সে গোবিন্দচন্দ্রের বিবাহ হয়। জয়দেবপুরেই তাঁহার পত্নী সারদাসুন্দরীর পিত্রালয়। গোবিন্দচন্দ্রের নিজ বাটী এবং তাঁহার শ্বশুরালয়ের মধ্যে ব্যবধান একটি মাত্র দীর্ঘিকার। সারদাসুন্দরী অল্প কয় দিনের জন্য যখন পিত্রালয়ে যাইতেন, তখন এই পত্নীপ্রেমিক কবি বিরহে ব্যাকুল হইয়া দীঘির এ-পার হইতে ও-পারে চাহিয়া থাকিতেন—যদি দৈবক্রমে একবার প্রিয়ার মুখচ্ছবি দেখিতে পান, এই আশায়। কবি-পত্নীও স্বামীর সহিত সাময়িক বিচ্ছেদে একান্ত অধীর হইয়া পড়িতেন। সারদাসুন্দরীর গর্ভে গোবিন্দচন্দ্রের প্রমদা ও মণিকুন্তলা নামে দুইটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। ইহাদের জন্মের পূর্ব্বেই তাঁহার মাতা ও পিতামহীর মৃত্যু হইয়াছিল। স্ত্রী-কন্যাকে দেখাশুনা করিবার কেহ না থাকায় তিনি তাহাদিগকে লইয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

রাজসরকারে চাকুরী ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই গোবিন্দচন্দ্রের দুঃখ-দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম সুরু হইয়াছিল। তাঁহার শ্বশুরের অবস্থাও তেমন সচ্ছল ছিল না। এখন এতগুলি প্রাণীর ভরণপোষণ কি করিয়া হয়, সে এক বিষম সমস্যা। তদুপরি ভাওয়ালে তখন নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত এমন অবস্থার উদ্ভব হইল যে, এই

দরিদ্র পরিবারের দিনান্তে এক মুঠা অন্ন জোটাই ভার হইয়া উঠিল। অনন্যোপায় হইয়া গোবিন্দচন্দ্র চাকুরীর সন্ধানে বিদেশযাত্রা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, যদিও স্ত্রী-কন্যা ছাড়িয়া বিদেশ-বিভুঁয়ে চলিয়া যাইতে কিছুতেই তাঁহার মন সরিতেছিল না। কিন্তু অনশনক্লিষ্ট স্ত্রী-কন্যার অভাবের জ্বালা ঘুচাইতে হইলে বিদেশগমন ছাড়া গত্যন্তর নাই। সে জন্য তিনি এক রকম নিঃসম্বল অবস্থায় জয়দেবপুর হইতে ময়মনসিংহের উদ্দেশে রওনা হইলেন (২৩ ডিসেম্বর ১৮৭৯) এবং সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া পঞ্চম দিনে গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিলেন —তখনও ঢাকা-ময়মনসিংহে রেলপথ খোলা হয় নাই।

ময়মনসিংহে পৌঁছিয়া গোবিন্দচন্দ্র মুক্তাগাছার অন্যতম ভূস্বামী দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর ব্রহ্মপুত্র-নদতীরস্থ 'দেবনিবাসে' আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কিছু কাল পূর্ব্বে দেবেন্দ্রকিশোর যখন ভাওয়ালে ছিলেন, তখন তাঁহার সহিত গোবিন্দচন্দ্রের বিশেষ অন্তরঙ্গতা হয়। এই সময় ময়মনসিংহের শিক্ষিত সমাজ সাহিত্যচর্চ্চায় বিশেষ উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রকিশোরেরও সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহার অনুরোধে গোবিন্দচন্দ্র আসন্ন সারস্বত উৎসবের জন্য "বাণী আরাধনা" নামে একটি কবিতা রচনা করেন। এই কবিতাটি দেবেন্দ্রকিশোর কর্ত্তৃক উৎসবের অধিবেশনে (১২৮৬) পঠিত হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। কবিতাটি পরে ময়মনসিংহের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ভারতমিহিরে' প্রকাশিত হয় এবং উহা সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের বিদ্যোৎসাহী মহারাজা কমলকৃষ্ণ সিংহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহারাজা নিজেও এক জন সাহিত্যসেবী; তাঁহারই যত্ন ও উৎসাহে ১২৮৫ সালে দুর্গাপুর হইতে 'কৌমুদী' ও 'আর্য্য-প্রদীপ' নামে দুইখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। কমলকৃষ্ণের

আমন্ত্রণে কর্ম্মপ্রার্থী গোবিন্দচন্দ্র ময়মনসিংহ হইতে পদব্রজে সুসঙ্গে পৌঁছেন (মাঘ ১২৮৬)। মহারাজা তাঁহাকে খাজাঞ্চির পদে নিযুক্ত করেন।

সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য গোবিন্দচন্দ্রের কবি-হৃদয়কে বিমুগ্ধ করিল। এ সম্বন্ধে তিনি একখানি পত্রে লিখিতেছেন :—

> "সুসঙ্গ দুর্গাপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। নদী ও পর্ব্বতে, প্রভাতে ও সন্ধ্যায়, প্রকৃতি কি পরম রমণীয় শোভাই ঢালিয়া দেয়, তাহা বর্ণনাতীত। নদী বহিয়া, পর্ব্বত ভাসাইয়া, আকাশ পাতাল ডুবাইয়া যেন সে শোভার বন্যা ছুটিয়া চলে। আমি, সেই রুগ্ন দেহেও অনেক সময় তাহাতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতাম। সেই অনাদি অনন্তের আদ্যন্ত অন্বেষণে, কি এক বিপুল বিশাল উদাস আত্মহারা আনন্দে, আমি স্তম্ভিত বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতাম। আমার ক্ষুদ্র প্রাণে, সে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ডোবা ভাবের স্থান কুলাইত না।"

কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এই লীলানিকেতনেও পত্নীবিরহবিধুর কবি হৃদয়ে নিদারুণ অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। তদুপরি সাংঘাতিক জ্বরে তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তিনি একটি কবিতায় তাঁহার তৎকালীন মনোভাব এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :—

এই সেই শীতকাল, কে জানে কোথায়,
ভগ্নআশা ভগ্নপ্রাণে, চলিয়াছি কোন্‌খানে,
কে জানে লিখেছে ভাগ্যে কিবা বিধাতায়!
আমিই জানি না আমি চলেছি কোথায়!…
ঘুরি এ প্রবাসী বেশে, বৎসরেক দেশে দেশে,
দেখি না সে মানময়ী সোণার নলিন!

আধ হাসা আধ কাঁদা, মন খোলা মুখ বাঁধা,
কাঁদিতে হাসিয়াছিল ভুলিয়া সে দিন!
সেই এক দিন আর এই এক দিন! ('প্রেম ও ফুল')

মহারাজা তাঁহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা সত্ত্বেও গোবিন্দচন্দ্র সুসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন; তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া চাকরি ছাড়িয়া ১২৮৭ সালের আষাঢ় মাসে ময়মনসিংহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু বেকার অবস্থায় আর কত দিন বসিয়া থাকা যায়! কাজেই এখানে আবার গোবিন্দচন্দ্রকে চাকরির চেষ্টা দেখিতে হইল। পরবর্ত্তী তিন বৎসর আমরা তাঁহাকে এই সকল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে দেখি :—

মুক্তাগাছার ভূম্যধিকারী কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরীর
জমিদারী সেরেস্তায় ... আশ্বিন ১২৮৭—শ্রাবণ ১২৮৯

ময়মনসিংহে নব-প্রতিষ্ঠিত এনট্রান্স স্কুলে
পণ্ডিতি ও পরে ময়মনসিংহ 'সাহিত্য-
সমিতি'র অধ্যক্ষতা ... ১২৮৯—১২৯০

গোবিন্দচন্দ্র নিজ প্রকৃতিগত চাঞ্চল্যবশতঃ বার বার কর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতেন বলিয়াই দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তাঁহার জীবন এরূপ দুঃখময় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দারিদ্র্য-দোষ তাঁহার সহজাত কবিত্বশক্তিকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। সারা জীবন তাঁহার একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনার বিরাম ছিল না।

শোক-ঝঞ্ঝা

অব্যবস্থিতচিত্ত হইলেও গোবিন্দচন্দ্র যাঁহার চাকুরীতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল (১২৯১-১৩০১) কাটাইতে পারিয়াছিলেন, তিনি সেরপুরের জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী। হরচন্দ্র নিজেও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক পত্র 'চারুবার্ত্তা'র কার্য্যাধ্যক্ষ-রূপে ১২৯১ সালে গোবিন্দচন্দ্র নিযুক্ত হন। 'চারুবার্ত্তা' কাগজে কাজ করিবার সময় হঠাৎ এক দিন একখানি টেলিগ্রামে তিনি পত্নী সারদাসুন্দরীর গুরুতর পীড়ার সংবাদ জানিতে পারিলেন। পত্নীগতপ্রাণ গোবিন্দচন্দ্র এই সংবাদে বিচলিত হইয়া কালবিলম্ব না করিয়া জয়দেবপুর রওনা হইলেন। স্টেশন হইতে বাড়ী আসিবার পথে এক জলন্ত চিতা দেখিয়া তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সারদা ছিলেন তাঁহার পিত্রালয়ে। দ্রুতপদে পথ চলিয়া গোবিন্দচন্দ্র যখন পত্নীর রোগশয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সারদার অন্তিম সময় উপস্থিত। গোবিন্দচন্দ্র পত্নীকে শেষ দেখা দেখিলেন বটে, কিন্তু পরস্পরে বাক্য-বিনিময় আর হইল না। রাত্রি ৮টার সময় সারদা সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন (২৬ নবেম্বর ১৮৮৫)। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্ব্ববঙ্গে নানারূপ জনশ্রুতি আছে। কাহারও মতে, "তাঁহার মৃত্যু একটা শোকাবহ বাস্তব ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত," আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা হইতেই না-কি কবির "আত্মহত্যা" কবিতাটির সৃষ্টি। পত্নীপ্রেমিক গোবিন্দচন্দ্র 'প্রেম ও ফুল' ও 'কুঙ্কুম' কাব্যে সারদাসুন্দরীকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না। পত্নীবিয়োগের অল্প দিন পরেই কবি এক মাত্র সহোদর জগচ্চন্দ্রকে হারাইলেন (১৪ আগস্ট '৮৬);

একে একে আত্মীয়-পরিজন সকলেই তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রমদার মৃত্যু পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল; বাকী রহিল কেবল কনিষ্ঠা কন্যা—সপ্তমবর্ষীয়া মণিকুন্তলা।

'বিভা' ও 'প্রেম ও ফুল' প্রকাশ

কার্য্যব্যপদেশে গোবিন্দচন্দ্রকে মাঝে মাঝে কলিকাতায় অবস্থান করিতে হইত। ১৮৮৭-৮৮ সনে তিনি প্রধানতঃ কলিকাতায় ছিলেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি 'বিভা' নামে একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হয়। 'বিভা'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—আশ্বিন ১২৯৪। গোবিন্দচন্দ্রের নব-প্রকাশিত 'প্রেম ও ফুল' কাব্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'বিভা' (চৈত্র ১২৯৪) যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য :—

> 'প্রেম ও ফুল' বিভা প্রকাশক প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদিগের ইহার অধিক সমালোচনা করা ভাল দেখায় না।...

'বিভা'য় গোবিন্দচন্দ্রের দুইটি কবিতা স্থান পাইয়াছিল। ইহার প্রথমটি ১২৯৪ সালের ফাল্গুন-সংখ্যায় প্রকাশিত "বিদায়" (দ্র° 'কস্তুরী'); দ্বিতীয়টি ১২৯৫ সালের শ্রাবণ-সংখ্যায় মুদ্রিত "তারে কি বাসিব ভাল ?" ("সখী" নামে 'কুঙ্কুমে' মুদ্রিত)।

'প্রেম ও ফুল' গোবিন্দচন্দ্রের প্রথম গীতিকাব্য। "তিনি পশ্চিম-বঙ্গে 'প্রেম ও ফুলে'র কবি বলিয়াই পরিচিত। আর পূর্ব্ববঙ্গে তিনি 'মগের মুলুকে'র নামে সুবিখ্যাত।" এই 'মগের মুলুকে'র সহিত তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বিষাদমাখা অধ্যায় জড়িত।

জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসন ঃ 'মগের মুলুক'

কলিকাতায় আসিলে গোবিন্দচন্দ্র 'নব্যভারত'-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর 'আনন্দ-আশ্রমে' অবস্থান করিতেন। ১২৯০ সালে তিনি "সতীদেহ স্কন্ধে মহাদেবের নৃত্য" নামে একটি কবিতা 'নব্যভারতে' প্রকাশার্থ পাঠাইয়া দেন ; দেবীপ্রসন্ন কবিতাটি পড়িয়া মুগ্ধ হন এবং যথাসময়ে সেটি 'নব্যভারতে' প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটিকে উপলক্ষ্য করিয়া দেবীপ্রসন্নের সহিত গোবিন্দচন্দ্রের আলাপ-পরিচয়ের সূত্রপাত হয় এবং ক্রমে পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালবাসা জন্মে। এই উপেক্ষিত কবির প্রতিভা বিকাশে দেবীপ্রসন্নের আনুকূল্য যে কত দূর কার্য্যকর হইয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

১২৯৮ সনে 'কুঙ্কুম' নামক কাব্যগ্রন্থখানি ছাপাইবার জন্য গোবিন্দচন্দ্র সেরপুর হইতে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। পুস্তকখানির মুদ্রণকার্য্য শেষ হইলে তিনি সেরপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে জয়দেবপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণকে এক খণ্ড নব-প্রকাশিত 'কুঙ্কুম' উপহার প্রদান করিলেন। রাজা 'কুঙ্কুমে'র কবিতাগুলি পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন এবং গোবিন্দচন্দ্রকে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া জয়দেবপুরে অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র প্রত্যহই নিয়মিতভাবে রাজবাড়ীতে যাইতেন, রাজার মুখে 'কুঙ্কুমে'র কবিতার আবৃত্তি শুনিতেন। কিন্তু দিন-দশেক পরে রাজবাড়ীতে গিয়া রাজার ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন ; রাজার আচরণে আন্তরিকতার অভাব দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। পরে কোন এক

সূত্রে গোবিন্দচন্দ্র জানিতে পারিলেন যে, কলিকাতার 'নবযুগ' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের বিরুদ্ধে এক নিন্দাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং কালীপ্রসন্ন রাজার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করাইয়া দিয়াছেন যে, উক্ত প্রবন্ধ গোবিন্দচন্দ্রেরই রচিত। এ কথা শুনিয়া গোবিন্দচন্দ্র একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি এই প্রবন্ধের কথা কিছুই জানিতেন না। তাঁহার বিরুদ্ধে যে একটা গভীর ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছে, এ কথা বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না।

দিন-কয়েক পরে রাজার সম্পর্কিত ভ্রাতা—প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবিকে পথিপার্শ্বে একান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ না-কি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, 'নবযুগে'র প্রবন্ধটি গোবিন্দচন্দ্রেরই লেখা। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া রাজা তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহাকে নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। রাজার আদেশ—সেই দিনই গোবিন্দচন্দ্রকে চিরতরে জয়দেবপুর পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। রাজাজ্ঞা অমান্য করিলে গোবিন্দচন্দ্রকে যে চরম বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে, প্রসন্নবাবু সেই কথাই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।

এই নিষ্ঠুর রাজদণ্ডের কথা শুনিয়া গোবিন্দচন্দ্র মর্ম্মাহত হইলেন। শৈশব কাল হইতে জন্মভূমির উপর তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। ভাওয়ালকে তিনি প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি গাহিয়াছিলেন :—

> জননী দুহিতা নারী, যত কিছু সে আমারি,
> সে আমার যাগযজ্ঞ সে আমার ধ্যান !
> তাহারে ভুলিব কিসে, সে আছে শোণিতে মিশে,

স্বপনেও দেখি তার সে চারু বয়ান !
ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ ! ('চন্দন')

প্রবাসে জন্মভূমির জন্য সময় সময় তাঁহার মন উতলা হইয়া উঠিত। তাই মাঝে মাঝে আকুল আগ্রহে তিনি জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিতেন। আজ প্রিয় জন্মভূমি ভাওয়ালে তাঁহার স্থান নাই। রাজা তাঁহাকে বিনা-দোষে বিনা-বিচারে চির-নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। ১২৯৮ সালেব ফাল্গুন মাসে এই নিদারুণ ব্যাপার সংঘটিত হইল। যে দিন রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিলেন, সেই দিনই রাত্রে কন্যা মণিকুন্তলাকে স্বামিগৃহে পাঠাইয়া জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক কর্ম্মস্থল সেরপুরে রওনা হইলেন। . নির্ব্বাসিত কবির মর্ম্মবেদনা তাঁহার 'চন্দন' নামক কাব্যগ্রন্থে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে "নির্ব্বাসিতের আবেদন" কবিতাটিব কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

তোমরা বিচার কব—জনসাধারণ,
এ নহে সামান্য শাস্তি,
এ ভাই যৎপরোনাস্তি,
ফাঁসির পরেই এই চির নির্ব্বাসন।
বিনা দোষে কেন তবে,
এ শাস্তি আমার হবে ?
দরিদ্র দুর্ব্বল আমি, এই কি কারণ ?

* *

তোমরা বিচার কর, আমারে যাহারা,
করিয়াছে নির্ব্বাসিত,
করিয়াছে বিড়ম্বিত,

করিয়াছে জন্মশোধ প্রিয়দেশ-ছাড়া,
পথের ভিখারী করি
করিয়াছে দেশান্তরী,
প্রবঞ্চিত করিয়াছে পিতৃধনে যারা !…
তোমরা বিচার কর—কে হয় তাহারা !

* *

তোমরা বিচার কর—তোমাদের দ্বারে,
দরিদ্র ভাওয়ালবাসী,
কাতরে কাঁদিছে আসি,
পিশাচের রাক্ষসের শত অত্যাচারে !…
দুর্ব্বল বিচার চায় তোমাদের দ্বারে !

সেরপুরে আসিবার দিন-কতক পরেই জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরীর কোন জরুরি কাজে গোবিন্দচন্দ্রকে কলিকাতায় যাইতে হয়। ঘটনাচক্রে এক দিন তাঁহাকে রাজেন্দ্রনারায়ণের কলিকাতাস্থ রাজভবনে যাইতে হইল। সেখানে তাঁহার শৈশবসঙ্গিনী রাজভগ্নী কৃপাময়ী দেবী, রাজমাতা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হইল; তাঁহারা কেহই কবির নির্ব্বাসন-কাহিনীর কথা জানিতেন না, শুনিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। তিন দিন পরে দ্বিতীয় বার যখন তিনি রাজভবনে গেলেন, তখন রাজেন্দ্রনারায়ণের সহিত তাঁহার দেখা হইল। সুযোগ বুঝিয়া গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল হইতে তাঁহার নির্ব্বাসনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। তাঁহার নিজের কথায়—

"রাজাকে বলিলাম, আমি 'নবযুগে' আপনার কি কালী-প্রসন্নের বিরুদ্ধে কিছু লিখি নাই; মিছামিছি জন্মভূমি হইতে আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। আপনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত

হইয়াছেন, এখন অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার একজন বিশ্বাসী লোক দ্বারা অনুসন্ধান করুন—আমি লিখিয়াছি কি না? যদি অন্যকে বিশ্বাস না করেন, তবে বলুন 'নবযুগে'র সম্পাদককে আমি অনুনয় বিনয় করিয়া আপনার নিকট লইয়া আসি, আপনি স্বয়ং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানুন। আপনার ন্যায় একজন সম্ভ্রান্ত জমিদারের নিকট তিনি কখনই আমার খাতিরে মিথ্যা কথা বলিবেন না" (পত্র)।

গোবিন্দচন্দ্রের সকল অনুনয়-বিনয় ব্যর্থ হইল। রাজা অনুসন্ধান করিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। বার বার অনুরোধ করিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তেজস্বী নির্ভীক কবি তখন আহত সিংহের মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"আপনি কি অনুসন্ধান করিবেন? আপনার ক্ষমতা থাকিলে ত? কালীপ্রসন্ন আপনাকে যাহা বলে, তাহাই আপনার বিশ্বাস,—তাহাই আপনার বেদবাক্য।‥কালীপ্রসন্ন আপনাকে যাহা বলাইতেছে তাহাই বলিতেছেন।…আপনার চক্ষু কর্ণ থাকিলে, হৃদয় থাকিলে কালীপ্রসন্ন ভাওয়ালের কি করিয়াছে ও করিতেছে তাহা দেখিতেন ও বুঝিতেন। যা হউক, আমি অপরাধ না করিলেও আপনি আমার যে দণ্ড করিলেন তাহা অতি গুরুতর। ফাঁসির পরই নির্ব্বাসন। আপনি বিনাদোষে আমাকে জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। আচ্ছা, না লিখিলেও যদি লিখিয়াছি বলিয়া মিছামিছি দণ্ডিত হইলাম, তবে এখন হইতে আমি লিখিব। আপনি যত দূর সাধ্য করিবেন।…এখন দেখিবেন আর কেহ লিখিতে পারে কি না?" (পত্র)

রাজার এই আচরণে গোবিন্দচন্দ্র হৃদয়ে যে নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভব করেন, তাহাই তাঁহাকে 'মগের মুলুক' রচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল।

কলিকাতার কাজ সারিয়া গোবিন্দচন্দ্র সেরপুরে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু সেখানে তিনি কিছুতেই শান্তি পাইলেন না। রাজার নিকট সুবিচার চাহিয়াও যে কোন ফল হইল না, এই দুঃখ তাঁহার বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল। দারুণ অশান্তি লইয়া তিনি ১২৯৯ সনের শ্রাবণ মাসে আবার কলিকাতায় আসিয়া দেবীপ্রসন্নের আনন্দ-আশ্রমে উঠিলেন এবং বন্ধুর নিকট সকল ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। তার পর তিনি নিজের অবস্থা সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রচার করিবার জন্য সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকের দ্বারস্থ হইলেন; কিন্তু কাহারও সহানুভূতি উদ্রেক করিতে সমর্থ হইলেন না। সম্পাদকের নিকট বিমুখ হইয়া গোবিন্দচন্দ্র পাঁচ দিনে একখানি বিদ্রূপাত্মক কাব্য রচনা করিয়া ফেলিলেন এবং তাহার নাম দিলেন—'মগের মুলুক'। দেবীপ্রসন্নের আনন্দ-আশ্রমে বসিয়াই কবি উহা রচনা করিয়াছিলেন। দেবীপ্রসন্নের চেষ্টায় 'মগের মুলুক' কলিকাতার 'প্রকৃতি' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (৫ ভাদ্র ১২৯৯) হইতে ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত হইতে থাকে এবং ২৩এ মাঘের সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। ভাওয়ালের প্রজাদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার-উৎপীড়নের বহু গোপন কাহিনী ইহাতে পরিপূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হইল। রাজ্যের হোমরা-চোমরাদের তিনি কঠোর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিলেন; তাহাদের মুখোশ খসিয়া পড়িল। কাব্যের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারও কাহারও গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। ভাওয়ালের রাজমন্ত্রী কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'প্রকৃতি'-সম্পাদকের নামে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট-কোর্টে মানহানির মামলা দায়ের করিলেন। ওয়ারেণ্টের বলে 'প্রকৃতি'র পরিচালকদের গ্রেপ্তার করিয়া ঢাকায় লইয়া যাওয়া হইল। ইতিমধ্যে গোবিন্দচন্দ্রের কর্ম্মতৎপরতায় অভিযোগের প্রতিলিপি সহ 'মগের মুলুক'

'প্রকৃতি'র ক্রোড়পত্রস্বরূপ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া গেল এবং ইহা গোবিন্দচন্দ্রকে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র সুপরিচিত করিল।

'প্রকৃতি'-সম্পাদক শেষে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বসিলেন। অভিযোগকারী কালীপ্রসন্ন তাঁহার সহিত মোকদ্দমা আপস-নিষ্পত্তি করিবার ব্যবস্থা করিলেন (চৈত্র ১২৯৯)। শুনা যায়, সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র না কি এই মোকদ্দমা আপস নিষ্পত্তি করিবার জন্য কালী-প্রসন্নকে পত্র লিখিয়াছিলেন। এই মামলা-প্রসঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র একখানি পত্রে লিখিয়াছেন :—

> "প্রকৃতির সম্পাদক আমার লিখিত 'মগের মুলুকে'র হস্তলিপি কালীপ্রসন্ন ঘোষকে দিযাছিলেন। এবং আমি যে উহা লিখিয়াছি, তাহাও বলিযাছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন আমার নামে মোকর্দ্দমা কবিতে সাহস পায় নাই। প্রমাণের আমার অপ্রতুল ছিল না।"

গোবিন্দচন্দ্রের 'মগের মুলুক' একদা বাংলা দেশে বিশেষ আলোডনের সৃষ্টি করিয়াছিল। 'নব্যভারত'-সম্পাদক এই পুস্তকের প্রসঙ্গে লিখিয়া-ছিলেন :—

> "শুনিয়াছি, মগের মুলুক পুস্তকখানি কণ্ঠে কণ্ঠে আজও বিচরণ করিতেছে। এরূপ বর্ণনা বিদ্যাসুন্দরের পর এ দেশে আর কেহ করিতে পারিয়াছেন কি না, জানি না। মগের মুলুকের লেখক ভারতচন্দ্রের যোগ্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। নচেৎ এত অন্তর্জ্বালা উপস্থিত হইত না। তাহার বর্ণনা কত সুন্দর, পাঠকগণ দেখুন—
>
> বঙ্গদেশে আছে একটি 'স্বর্গপুর' গ্রাম,
> গাছ গাছলায় ভরা তাহা নবীন ঘনশ্যাম।

রাঙ্গা মাটি, পলাকাটী থাঁটি সোনার মত,
টিলায় টিলায় ভুল হয়ে যায় মৈনাক শত শত !
উত্তরে তার রূপার রেখা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী,
মন্দাকিনীর মত তাহার মন্দ মন্দ গতি !
দেবপুর নিবাসী কত দেবের দেহ-ছাই,
মাখি বুকে, মনের সুখে যখন সেথা যাই।
পূবের ধারে, গাঙ্গের পারে শ্যামল তপোবন,
চাঁপাবনে চাতক ডাকে চম্‌কে উঠে মন !
কলসী কাঁখে, আঁচল মুখে মেয়েগুলি আসে,
পাতা ঢাকা ফুলের মত ফাঁফর হয়ে হাসে !
কেউ বা পড়ে, কেউ বা ধরে, উঠে ভিজা পায়,
পিছ্‌লা ঘাটে আছাড় খেয়ে কল্‌সী ভেঙ্গে যায় !
পূবের দিকে পদ্মভরা বিলের সীমা নাই,
পিপী ডাকে, কোড়া ডাকে, কালেম, কড্‌গাই।
উত্তরে তার হাজার হাজার বিশাল গজার বন,
বাঘ ভালুকে বেড়ায় সুখে খেলায় হরিণগণ।
গাছে গাছে ময়ূর নাচে পেকম ধরে কত,
পুচ্ছে তার তুচ্ছ করে ইন্দ্রধনু শত !
বার মাসই ফুলের হাসি, হয় না বাসি তায়,
ছায়া-ঢাকা, স্নেহ-মাখা, মায়ের মতন প্রায় !
নানান্ ছন্দে নানান গন্ধে শীতল বায়ু বয়,
নন্দনে চন্দন বনে মলয় মনে লয় !
টিলার পাশে ঝরণা বহে, ঢাল্ গড়ানে ভুঁই,
দুধ খাইতে মায়ের বুকে কাপড় ঠেলে থুই !

ফাগুন মাসে আগুন হাসে সারা কানন ভরা,
ধুঁয়ায় ধুঁয়ায় দিক্ ছেয়ে যায়, আকাশ আঁধার করা!
চৈত্র মাসে, জোর বাতাসে, উড়ে তুলা রাশি,
পোড়া বনের, পোড়া মনের, শুষ্ক শ্বেত হাসি!

* * *

পশ্চিমেতে বিশাল দীঘি নীল আরসির মত,
কাল জলে আকাশ ডোবা, মরাল ভাসে কত।
তীরে তীরে খেজুর গাছের কাঁটাল গাছের সারি,
মানের বাঁধা খাট্‌লা শোভে, পূবে রাজার বাড়ী।
অন্দরেতে ফুলের বাগান বন্দরের প্রায়
গন্ধ মধুর ব্যবসা করে ভ্রমর-বণিক্ তায়।
কাল জলে ঝরে তাহাব কেলি কদম ফুল
বৃন্দাবনেব নিন্দা করে কালিন্দীর কূল।
দিবানিশি খেলে জলে লহর শত শত,
ঠিক যেন সে বরুণ রাণীর নীল আঁচলের মত!
রাজার বাড়ীর মেয়ে ছেলে বাঁধা ঘাটে নায়,
সদ্য ফোটা ভাদ্র মাসের পদ্মবনের প্রায়।
অন্য তীরে গৃহস্থ বউ ঘোমটা মাথায় দিয়ে
ভিজা বাসে বাড়ী যায় কলসী কাঁখে নিয়ে,
কিবা তাহার রূপের বাহাব মরি মরি হায়,
লণ্ঠনের ভিতরে যেন আলোক দেখা যায়।
কোণা ঘাটে সোনা বউ,—কলসী ভাসে জলে
মন ভাসে আরেক ঘাটে নিমগাছের তলে!
বামের দিকে দামের উপর বক রয়েছে খাড়া,
সন্ধ্যা করে বামনঠাকুর কোমর-জলে দাঁড়া,

দুজনেই চুপ করিয়ে মিটি মিটি চায়,
দুজনারি ধর্ম্ম সমান কর্ম্ম সমান প্রায়।
পশ্চিমের পারে রাজার মেনেজারের বাসা,
বেল বনে বকুল বনে কলা বনে ঠাসা!
বেড়ার উপর বেড়া তাতে দৃষ্টি নাহি চলে,
আছে একটী গুপ্ত পথ যে গভীর বনের তলে,
সুন্দরের সুড়ঙ্গের মত আরেক মাথা তার,
মেনেজারের মাথা মুণ্ড বলব কিবা আর,—
পশ্চিমের গৃহস্থ বাড়ী লাগিয়াছে গিয়া;
পূবের দিকের পুকুর পাড়ের কাঁটাল তলা দিয়া,
সে বাড়ীর বিধবা নারী সেই বিদ্যাবতী,
মৎস্য মাংসে একাদশী নিত্য করেন সতী!
কোমরে তার চাবির শিকল গলায় সোনার হার,
অঙ্গুরীটি "মনে রেখো" স্মরণ-চিহ্ন কাঁর!
মিশি-মাখা বাঁকা দাঁতে হাসে যখন তায়,
পাতিলের তলাতে যেন আগুন লেগে যায়!
মেনেজারের চাকর একটি গয়লা মেয়ের পো,
খবরদারি কর্ত্তে গিয়ে নিজেও মারেন ছোঁ!

('নব্যভারত,' অগ্রহায়ণ ১৩২৫)

'মগের মুলুক' রচনার ফলে গোবিন্দচন্দ্রের নাম চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল বটে, কিন্তু আততায়ীদের চক্রান্তে তিনি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন, সময় সময় তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতে লাগিল। গুপ্তঘাতকের দল সর্ব্বদা তাঁহার পিছনে পিছনে ফিরিত। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখিয়াছেন :—

"আমি কলিকাতা হইতে, কি অন্য কোথায়ও হইতে ময়মনসিংহে যাইবার সময়, আমাকে রেলওয়ে ষ্টেশনে ধরিয়া মারিবার জন্য ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলওয়ের ষ্টেশনে লোক নিযুক্ত··· ছিল। আমি রাত্রির গাড়ীতে ছাড়া দিনের গাড়ীতে যাতায়াত করিতাম না। গাড়ীতে উঠিয়াই পার্শ্বস্থ লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহাদিগকে আমার অবস্থা জানাইয়া, ষ্টেশনের নিকট গাড়ী আসিতেই, গায় মাথায় কাপড় দিয়া, মাথা গুজিয়া টুলের উপর পড়িয়া থাকিতাম। আর সেই লোকেরা আমার রক্ষার জন্য গাড়ীর দরজার নিকট সতর্ক ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত। ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলওয়ের যে সকল ষ্টেশন ভাওয়ালে অবস্থিত, তাহাতে রাজার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। সেই সকল ষ্টেশনে রাজার লোকে গাড়ী হইতে কাহাকেও টানিয়া নিলে কেহ রক্ষা করিতে পারে না। এই জন্যই এত ভয়ে ও সতর্কতার সহিত আমি রেলপথে যাতায়াত করিয়াছি।"

দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ

সারদাসুন্দরীর মৃত্যুর সাত বৎসর পরে, গোবিন্দচন্দ্র দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন (১৩ জানুয়ারী ১৮৯৩)। প্রতিপালক হরচন্দ্র চৌধুরী এই বিবাহের অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। কবির দ্বিতীয়া পত্নীর নাম প্রেমদাসুন্দরী। ইনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগ্রামের ৺মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা।

দ্বিতীয় বার বিবাহের পর প্রথমার স্মৃতি তাঁহার মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার সুন্দর অভিব্যক্তি নীচের কবিতাটিতে আছে :—

"সারদা পশ্চিমে ডুবে, প্রমদা উঠিছে পূবে,
জীবন-গগন মধ্যে আমি দাঁড়াইয়া,
অপূর্ব্ব সুন্দরী উষা, অপূর্ব্ব সন্ধ্যার ভূষা,
পৃথিবীর দুই প্রান্ত উঠিছে প্লাবিয়া।...
প্রেমদা পদ্মার কূলে, কোমল শেফালী ফুলে,
করিয়া বাসর-শয্যা ডাকিছে আমায়,
সারদা চিলাই-তীরে, আমকাঠ দিয়ে শিরে,
আঁচল বিছায়ে ডাকে চিতা-বিছানায় ;
নাহি নিশি নাহি দিন, দু'জনেই নিদ্রাহীন,
দুই দিকে দুই সিন্ধু গর্জ্জিছে সমানে,
পাষাণ-হৃদয় স্বামী, পানামা যোজক আমি,
ধীরে ধীরে ভেঙ্গে নামি দু'জনার বানে! ('কস্তুরী')

কবি যখন দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিতে যান, তখন চারি দিক্ হইতে বিপদের কালো মেঘ তাঁহার মাথার উপব ঘনাইয়া আসিতেছিল। তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা ছিল তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ; তিনি বলিতেন, "সহস্র বিপদ্ আসিলেও আমি ভয় করি না,—নিজের কর্ত্তব্য করিয়া যাই। আমি বিপদ্‌কে কোন দিনই ভয় করি নাই।"

গোবিন্দচন্দ্র ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন। বিধাতাও বার বার দুঃখ-শোকের আঘাত দিয়া তাঁহার ভক্তি-বিশ্বাসের দৃঢ়তা যাচাই করিয়া লইতেছিলেন। ১৮৯৩, ৩১এ অক্টোবর সারদাসুন্দরীর শেষ স্মৃতি কন্যা মণিকুন্তলা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তাহার মৃত্যুতে গোবিন্দচন্দ্র যে কবিতাটি লেখেন, তাহাতে তাঁহার দুঃখশোকতাপদগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা ফুটিয়া উঠিয়াছে :

"তপস্বীর তপোরথে, জ্ঞানময় মহাপথে,
যায় ব্রহ্মময়ী মেয়ে সারদা তোমার!
লও সে স্নেহের বুকে, থাক্ মেয়ে চিরসুখে,
এ জীবনে তার তরে ভাবিব না আর,
ছিন্নমুণ্ড ছিন্নবাহু, আমি চিরদগ্ধ রাহু,
একাকী ভ্রমিতে থাকি জগত সংসার!
নেও কোলে নেও মেয়ে সারদা তোমার!" ('কস্তুরী')

১৩০১ সালে গোবিন্দচন্দ্র সেরপুরের চাকরি ছাড়িয়া দেন। হরচন্দ্রের কোন অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করিতে না-পারাই না কি তাঁহার কর্ম্মত্যাগের মূল কারণ। সেরপুর ত্যাগ করিয়া তিনি 'নব্যভারত'-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর আনন্দ-আশ্রমে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। অল্প দিন পরে তিনি দেবীপ্রসন্নের সহিত মধুপুরে যান এবং ১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া গোবিন্দচন্দ্র কিছু কালের জন্য নব্যভারত প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা তখন কিন্তু অত্যন্ত শোচনীয়। শেষে দেবীপ্রসন্নের চেষ্টায় তিনি মুক্তাগাছার মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর জমিদারিতে কর্ম্ম লাভ করেন। গোবিন্দচন্দ্র প্রথমে বাঁশহাটি কাছারির নায়েব নিযুক্ত হন (৬ ফাল্গুন ১৩০৩)। ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে তাঁহাকে বেগুনবাড়ী কাছারিতে বদলি করা হয় (২ অগ্রহায়ণ ১৩০৫)। এখানে তিনি সস্ত্রীক তিন-চার বৎসর কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার একখানি পত্রে প্রকাশ:—

"বেগুনবাড়ী ৩।৪ বৎসর থাকিবার পর তারাটী কাছারিতে বদলি হই। সেখানে প্রায় বৎসরাধিক কাল কার্য্য করিয়াছিলাম। শেষে পীড়িত হইয়া বিদায় লই। ছুটির পরে আর কাজে যাই নাই।"

জন্মভূমির স্নেহক্রোড়ে

গোবিন্দচন্দ্র যখন সূর্য্যকান্তের বেগুনবাড়ী কাছারির নায়েব-রূপে কাজ করিতেছিলেন, তখন ভাওয়ালের রাজমন্ত্রী কালীপ্রসন্ন ঘোষ চিরতরে জয়দেবপুর পরিত্যাগ কবিতে বাধ্য হন। ইহা ১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ঘটনা, তখন সবে মাত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইয়াছে। রাজ্যের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে রাণী বিলাসমণি স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া কালীপ্রসন্নের বহু অপকীর্ত্তির কথা অবগত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার বিরুদ্ধে কিঞ্চিদধিক দশ লক্ষ সাড়ে বাষট্টি হাজার টাকার দাবিতে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। মোকদ্দমা শেষ পর্য্যন্ত আপসে মিটাইয়া লওয়া হয়।

যাঁহার চক্রান্তে এক দিন গোবিন্দচন্দ্র জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারেরা গোবিন্দ-চন্দ্রকে আবার ভাওয়ালে আসিতে আহ্বান করিলেন। সুদীর্ঘ একাদশ বৎসব পরে ভাওয়ালের প্রিয় কবি পুনরায় তাঁহার জন্মভূমির স্নেহক্রোড়ে ফিরিয়া আসিলেন। মাতৃভূমিব প্রীতিপূর্ণ মুখচ্ছবি দর্শনে তাঁহার হৃদয় যে কি বিপুল পুলকোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতে ব্যক্ত হইয়াছে ঃ—

"আমি পরবাসী।
ঘুরছি আমি নানান্ দেশে, নানান্ কষ্টে নানান্ ক্লেশে,
মন বসে না কোনখানে, পানার মত ভাসি,
কিন্তু যখন আসি হেথা, ভুলে প্রাণের সকল বেথা,
দুদিন পরে ঘুরে ফিরে তাইতে আবাব আসি,
আমি পরবাসী।

আমি পরবাসী,
দিক্‌দিগন্তে আছে ব্যাপি, উর্দ্ধে উঠ্‌ছে আকাশ ছাপি,
হাজার হাজার গজার বনের সবুজ শোভারাশি,
সিন্ধু যেন শ্যাম তরঙ্গে, খেল্‌ছে বনের অঙ্গে অঙ্গে,
শীত বসন্তে সমান ফোটে ফেন-পুষ্প হাসি,
আমি তাই দেখিতে আসি।
আমি পরবাসী,
বনভরা সব যত টিলা, মাথায় আছে আকাশ মিলা,
মরকত মন্দিরের মত শোভা পরকাশি,
ঝাঁকে ঝাঁকে মেলে পাখা, উড়ছে মায়ের শ্বেত পতাকা,
বৈশাখ মাসে বকের শোভা দিকদিগন্তে ভাসি,
আমি তাই দেখিতে আসি।

* * *

আমি পরবাসী,
ওগো শ্যামা বনভূমি, বিপুলা বিশালা তুমি,
কবিতা কল্পনা মোর তোর চিরদাসী,
আমি বা বুঝিব কি মা, তোর ও শ্যাম-মহিমা,
তথাপি সেবিব তোরে চির অভিলাষী,
আমি, তাইতে হেথা আসি!”
(‘নব্যভারত,’ বৈশাখ ১৩১৬)

পল্লীবাস

চাকরির প্রতি গোবিন্দচন্দ্রের একটা বিজাতীয় ঘৃণা ছিল, অথচ জীবনধারণের উপায়ান্তর না থাকায় দীর্ঘকাল তাঁহাকে পরের চাকরি করিতে হইয়াছে। সূর্য্যকান্তের চাকরি ছাড়িবার পর অনন্যোপায় কবি ময়মনসিংহের দানবীর রাজা জগৎকিশোরের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার দুঃখে জগৎকিশোরের হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি নিজের জমিদারি হইতে তাঁহাকে আমৃত্যু মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ভাওয়ালের তিন কুমারও প্রত্যেকে নিয়মিতভাবে মাসিক ৮৲ করিয়া মোট চব্বিশ টাকা বৃত্তি প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত অর্থ-সাহায্য দ্বারা কবি কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

ভাওয়ালে গোবিন্দচন্দ্রের যে সামান্য পৈতৃক ভূসম্পত্তি ছিল, কালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক তাহা রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু রাজকুমারগণ তাহা পুনরায় তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে দৈন্যদশাগ্রস্ত কবির কিঞ্চিৎ সুরাহা হইয়াছিল।

চাকরির মায়া কাটাইয়া গোবিন্দচন্দ্র ব্রাহ্মণগ্রামে পত্নী প্রেমদার পিত্রালয়েই স্থায়ী ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাপন করা তাঁহার অদৃষ্টে বিধাতা লেখেন নাই। এখানেও দুষ্ট লোকেরা নানা ভাবে তাঁহার শত্রুতা সাধন করিতে লাগিল। তাঁহার অপরাধ, তিনি নিজের অপেক্ষা উচ্চ বংশের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেলেন। ব্রাহ্মণগ্রামে হেমাঙ্গিনী ঘোষ নামে এক পূতচরিত্রা বিধবা বাস করিতেন। কুচক্রীরা রটাইয়া দিল যে,

গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার প্রতি প্রণয়াসক্ত। শত্রুপক্ষীয়েরা শুধু গোবিন্দচন্দ্রের নিষ্কলুষ চরিত্রের উপর কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাঁহাকে একঘরে করিয়াও রাখিল।

জীবন-সায়াহ্নে

১৩১৮ সালেব কথা। এই বৎসর কবি দুরবস্থাব চরম সীমায় উপনীত হইলেন। ভাওয়াল হইতে যে ২৪৲ বৃত্তি আসিত, তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। কবিব স্বাস্থ্যও ভাঙিয়া পড়িল। তিনি যে কি ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাইতেছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি পাঠ করিলে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। তিনি লিখিতেছেন :—

"আমাকে এক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত বলিয়াছেন—৩।৪ বছরের মধ্যে আমি মরিব। বাস্তবিক আমার শরীরও আজকাল নিতান্ত খারাপ হইয়াছে। সামান্য একটু মাথা ধরিলেও আমি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ি, যেন উঠিতে পারি না। আগে এমন অসুখ গ্রাহ্যই করিতাম না। আর সর্ব্বদাই আমার অসুখ লাগিয়া আছে। এক দিনও স্বাস্থ্য-সুখ ভাগ্যে ঘটে না। শবীব নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে, উঠিতে বসিতে যেন হাত পা ভাঙ্গিয়া পড়ে। পুষ্টিকর আহাব অভাবে আরও কাতর হইয়া পড়িয়াছি। জয়দেবপুরেব কুমারেরা যে মাসিক ২৪৲ টাকা আমাকে সাহায্য কবিতেন, তাহা বন্ধ হইয়াছে।* একমাত্র রাজা জগৎকিশোরের সাহায্যে প্রাণে

* গোবিন্দচন্দ্র ১৩১৮, ৭ই ফাল্গুন লিখিযাছিলেন :—"জযদেবপুবেব বড ও মেজো কুমাব মাবা যাওযায তাঁহাদেব সাহায্য বন্ধ হইযাছে। ছোট কুমাবের নিজ খবচেই কুলায না। মাসিক ১১০০৲ টাকা তিনি পান।

বাঁচিয়া আছি। দুধের সের ।০, ।/০ আনা, মাছ দুষ্প্রাপ্য। ভাত খাইয়া বাঁচিতে পারি না, দুধ মাছ কি করিয়া খাইব? এক দিন একটা কবিতা লিখিলে পাঁচ দিন মাথা ঘোরে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই আমার এ দুর্দ্দশা হইয়াছে। যা' হউক একদিন মরিতে হইবেই, তাহার জন্য চিন্তা কি?" (২৮ ভাদ্র ১৩১৮)

অনশনক্লিষ্ট কবি মৃত্যুর জন্য মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছিলেন। তাঁহার তখনকার মনোভাব নীচের কবিতাটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে :—

"দিন ফুরায়ে যায় রে আমার, দিন ফুরায়ে যায়!
মাঝের রবি ডুব্‌ছে সাঁঝে, দিনটা গেল বৃথা কাযে,
এক পা কেবল পারে আছে, এক পা দিছি নায়!
আজ কর্‌ব না কর্‌ব কালি, এই ভাবে দিন গেল খালি,
কেমন ক'রে হিসাব দিব নিকাশ যদি চায়,
দিন ফুরায়ে যায় রে আমার, দিন ফুরায়ে যায়।"
('নব্যভারত,' জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮)

এই সময় কবি গভীর মর্ম্মবেদনায় দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া লিখিলেন :—

"ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে—
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ?
আজ যে আমি উপাস্ করি,
না খেয়ে শুকায়ে মরি,

তাহা তাঁহার প্রাইভেট খরচেই ব্যয় হয়, এজন্য তিনি আমাকে কিছু দিতে পারিতেছেন না বলিয়া জানাইয়াছেন।"

হাহাকারে দিবানিশি
ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট্‌,...
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে,
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ!"

('নব্যভারত,' শ্রাবণ ১৩১৮)

এই কবিতা প্রকাশিত হইবার পর বাংলা দেশের নানা স্থান হইতে কবি কিছু কিছু অর্থসাহায্য পাইয়াছিলেন।

১৩১৮ সালেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৎকালীন সভাপতি সারদাচরণ মিত্র-প্রমুখ ৫১ জন কৃতবিদ্য ব্যক্তির স্বাক্ষরে একখানি আবেদন-পত্র ভাওয়ালের বিধবা রাণীর নিকট প্রেরিত হয়। আবেদন-পত্রে দাস-কবিকে সাহায্য করিবার জন্য এইরূপ অনুরোধ ছিল :—

"...আমরা আপনাকে এখন এই অনুরোধ করি যে, যে-কবি স্বামি-দেবতার সহিত,—আপনার শ্বশুরকুলের সহিত চিরজীবন জড়িত, সেই দরিদ্র কবিকে আপনি ঢাকা-নগরীতে একটি বাসগৃহ প্রদান করিয়া তাঁহাকে উপস্থিত বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন। তিনি বিক্রমপুরে এখন যে গ্রামে বাস করিতেছেন, তাহা অচিরে পদ্মাগর্ভে বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে। ভাওয়ালেও এখন বাস করা তাঁহার পক্ষে কঠিন; সমস্ত কারণ আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। পাঁচ কি ছয় হাজার টাকা হইলেই, তাঁহার উপযুক্ত বাসগৃহ হইতে পারে। আপনার পক্ষে ইহা ইহ জীবনের সংস্থান। আপনি অবগত আছেন যে, আপনার স্বর্গগত স্বামি-দেবতা গোবিন্দবাবুকে একখানি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। আশা করি, এই নিরাশ্রয়, বঙ্গসাহিতের কীর্ত্তিমান্ কবিকে আপনি একটি বাসোপযোগী গৃহ প্রদান করিয়া রাজবংশের

পূর্ব্বগৌরব ও বদান্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। গোবিন্দবাবু সেই গৃহ আপনার নামে অথবা আপনার স্বর্গীয় স্বামীর নামে নামকরণ করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত আমরণ এই দান স্মরণ রাখিবেন, এবং সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে ও ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে আপনার এই কীর্ত্তি চিরোজ্জ্বল থাকিবে।"

দুঃখের বিষয়, এই আবেদন ব্যর্থ হইয়া যায়। রাণী ইহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

১৩১৮ সালের ১লা চৈত্র গোবিন্দচন্দ্রের সাহায্যার্থ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে এক বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় হীরেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্যোগে কবিকে সাহায্য করিবার জন্য একটি সাহায্য-সমিতি গঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রকাশিত হইলে ভাওয়ালের বড় রাণী সরযূবালা ১৩১৯ সালের বৈশাখ হইতে কবিকে পূর্ব্ববৎ মাসিক ৮৲ নিয়মিতভাবে সাহায্য করিতে থাকেন। মেজ রাণী এককালীন ১০৲ মাত্র সাহায্য-তহবিলে দান করিয়াছিলেন।

শেষ জীবনে গোবিন্দচন্দ্রের দুর্ভাগ্য চরমে পৌঁছিয়াছিল। এই সময়ে আবার অর্শরোগের প্রবল আক্রমণে তাঁহার জীবনীশক্তি তিল তিল করিয়া ক্ষয় হইতে লাগিল। অর্থাভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল না। ১৩১৯ সালের ২৫এ শ্রাবণ তিনি লিখিতেছেন—

"বলিতে কি এবারের ব্যারামে আমার শরীর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, আমি আর বেশী দিন বাঁচিবার আশা কিছুতেই করিতে পারিতেছি না। জ্যোতির্ব্বিদের কথা সত্য বলিয়াই আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে।...এই জন্য অসহায় নাবালক ছেলেদের কথা ভাবিয়া বড় ব্যাকুল হইয়া পড়ি, আর বড় কষ্ট হয়। পদ্মা ঘনাইয়া আসিতেছে, এই সময় অন্যত্র একটা বাড়ীর যোগাড় করিতে পারিলে,

অনেকটা দুর্ভাবনা দূর হইত। ঢাকায় একটা বাড়ীব জন্য অনেকের খোসামোদ করিতেছি, অনেক চেষ্টা করিতেছি, কিছুতেই সুবিধা হইয়া উঠে না। কেবল পদ্মা বলিয়া নহে, আমার মত অসহায় অবস্থায় শত্রুপূর্ণ বামনগাঁয় বাস করা স্বতঃই বিপদ্‌জনক। মরিলেও কেহ জিজ্ঞাসা করে না, শৈব্যার মত মা-মরা সন্তান কোলে করিয়া বসিয়া থাকিলেও ডোমের অধম ডোমগুলি যেখানে ফিরিয়া চাহে না—বরং বিপন্ন দেখিয়া তামাশা দেখে, সেখানে আর এক মুহূর্ত্তও বাস করিতে ইচ্ছা নাই।"

১৩২২ সালেব কথা। গোবিন্দচন্দ্র তখন বৈষয়িক কার্য্যে ঢাকা, জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। জয়দেবপুরে অবস্থানকালে অকস্মাৎ তাঁহার উরুতে একটি কার্ব্বাঙ্কল বা বিস্ফোটক দেখা দেয়। একে অর্থাভাব, তাহাতে পরিবার-পরিজন নিকটে নাই যে, শুশ্রূষা করিবে। তিনি বন্ধুগণের পরামর্শে ঢাকার মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে ভর্ত্তি হইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার অবস্থা তখন সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগশয্যাশায়ী গোবিন্দচন্দ্রের শোচনীয় অবস্থার কথা সংবাদপত্রে প্রচারিত হইল। ব্যারিস্টার ও কবি (পরে, দেশবন্ধু) চিত্তরঞ্জন দাশ তখন ভাগলপুরে, তিনি 'বাঙ্গালী' পত্রে কবির অসুস্থতার সংবাদ পাঠ করিয়া সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন এবং অবিলম্বে ঢাকায় ব্যারিস্টার প্রাণকিশোর বসুর নিকট এই মর্ম্মে তার করেন :—

"Kindly see to treatment of poet Govinda Dass. Am responsible for expenses. Write to me here.—C. R. Dass 17 Aug. 1915."

সুচিকিৎসার ফলে গোবিন্দচন্দ্র ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া গোবিন্দচন্দ্র যে মর্ম্মস্পর্শী কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কেন বাঁচালে আমায় ?

আমি ভেবেছিনু হরি, এবার করুণা করি
ঘুচাইবে অভাগার এ ভবের দায়,
যত দুঃখ যত ক্লেশ, সকল হইবে শেষ,
কাঁদিতে হবে না আর ব্যথা বেদনায় !
আমি ত ভাবি নি রোগ, ভেবেছি 'মাহেন্দ্রযোগ,
তিলে তিলে পলে পলে আশার আশায়,
ভেবেছি মরণ-মাঝি, লইতে আসিবে আজি,
অচিরে ভেটিব গিয়ে তব রাঙ্গা পায় !"

('সৌরভ,' কার্ত্তিক ১৩২২)

১৩২৫ সালে বাকী খাজনার জন্য ভাওয়াল-রাজসরকার হইতে গোবিন্দচন্দ্রের নামে নালিশ হইল। কবি বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। খাজনা দিতে না পারিলে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর ভূসম্পত্তি নীলামে বিক্রীত হইয়া যাইবে। এই সম্পত্তি হাতছাড়া হইলে তাঁহার অবর্ত্তমানে পরিবারবর্গ যে কিরূপ বিপদাপন্ন হইবে, তাহা ভাবিয়া যে-কোন প্রকারেই হউক তিনি এই সম্পত্তি রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। "ভগবান্ রক্ষা করেন কি না দেখিব"—এই সঙ্কল্প লইয়া তিনি রোগজীর্ণ জরাগ্রস্ত দেহেই ঢাকা যাত্রা করিলেন।

এই যাত্রাই যে শেষ যাত্রা, গোবিন্দচন্দ্র সম্ভবতঃ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রওনা হইবার কয়েক দিন আগে তিনি পত্নীকে দেনা-পাওনার হিসাব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন ; তাঁহার পরমায়ু যে শেষ

হইয়া আসিয়াছে, সে-কথাও আভাসে-ইঙ্গিতে পত্নীর নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

ঢাকায় আসিয়া কবি দিন-কয়েক অবস্থান করিলেন। তাহার পর জোত-জমি রক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ মানসে জয়দেবপুর, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা প্রভৃতি স্থানে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গৌরীপুর আসিয়া তিনি কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে কয়েক দিন অবস্থান করেন। যতীন্দ্রপ্রসাদের চেষ্টায় স্থানীয় জমিদাবদের নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। গৌবীপুর হইতে গোবিন্দচন্দ্র ৩২এ শ্রাবণ মুক্তাগাছায় গমন করেন। কিন্তু সেখানে বিশেষ সুবিধা হইল না। সামান্য মাত্র টাকা জোগাড় করিয়া তিনি ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এই টাকায় খাজনা পরিশোধ হইবে না বলিয়া তিনি তীব্র মানসিক দুশ্চিন্তা ভোগ কবিতে লাগিলেন।

গোবিন্দচন্দ্র ঢাকাব উপকণ্ঠে তাঁহার স্বগ্রামবাসী চন্দ্রকান্ত ঘোষের একটি বাড়ীর একাংশে বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহাব আহারের ব্যবস্থা ছিল কিছু দূরে অবস্থিত এক হোটেলে। ময়মনসিংহ হইতে কবি যে কয়টি টাকা সংগ্রহ কবিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা হইতে একটি পয়সাও খরচ করিতেন না, কেন না, ১লা অক্টোবর নীলামের তাবিখ ; ঐ দিন খাজনা দিতে না পারিলে জোত হস্তান্তরিত হইয়া যাইবে। এ দিকে হোটেলে খাইতে হইলে টাকার দরকার ; কিন্তু তাহাব সংস্থান নাই। সে জন্য তিনি কখনও অনশনে, কখনও অর্দ্ধাশনে, কখনও বা শুধু চিঁড়া খাইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। দারুণ অনিয়মে অবহেলায় তাঁহার জরাজীর্ণ দেহ কঙ্কালসার হইয়া উঠিল। কবির শেষ পত্র হইতে তাঁহার তখনকার শোচনীয় অবস্থা কতকটা উপলব্ধি করা যাইবে। তিনি লিখিতেছেন :—

"আমি হয়ত পূজার সময় বাড়ী যাইব। আজ ছয় সাত দিন যাবৎ জ্বর হওয়ায় বড় কষ্ট পাইতেছি। আজও ভাত খাই নাই; এই অবস্থায় কাছারিতে ঘুরি।...আমার শরীর এবার বড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সর্ব্বদা বিদেশে থাকিয়া অনিয়মিত ও অনুপযুক্ত আহারে স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর ডান কাঁধে বাতে ধরিয়াছে।"

কবি যখন আত্মীয়স্বজনহীন অবস্থায় নিদারণ রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়া অন্তিম মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন ১৩২৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মেলনের হিসাব-নিকাশের জন্য ঢাকার বার-লাইব্রেরিতে ১২ই আশ্বিন অভ্যর্থনা-সমিতির এক অধিবেশন হইল। সেই সভায় 'গোবিন্দচন্দ্র সাহায্যভাণ্ডার' নামে একটি স্থায়ী তহবিল গঠিত হয়, এবং কবিকে সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে ১০০৲ টাকা সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হয়। এই ১০০৲ খাজনাই গোবিন্দ-চন্দ্রের বাকী পড়িয়াছিল। এই অর্থের জন্যই তিনি একান্তভাবে বিধাতার উপর নির্ভর করিয়া ছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত "জগদীশ্বর তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।" মৃত্যুর পূর্ব্বদিন ঐ ১০০৲ গোবিন্দচন্দ্রকে দেওয়া হয়। এমনি ভাবে বিধাতার কৃপায় অপ্রত্যাশিত ভাবে জোতজমি রক্ষার ব্যবস্থা হইল দেখিয়া মৃত্যুপথযাত্রী কবি হৃদয়ে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। ঠিক ঐ দিন (১৩ আশ্বিন ১৩২৫) শেষ রাত্রে ৫টা ১৫ মিনিটের সময় কবির জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইল। দুঃখদৈন্যক্লিষ্ট কবি সংসারের সকল জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অমর-ধামে মহাপ্রয়াণ করিলেন। ঢাকার শ্যামপুর শ্মশানে তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে।*

---

* এই পুস্তকে উদ্ধৃত পত্রগুলি শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে লিখিত। হেমচন্দ্রের 'স্বভাব-কবি গোবিন্দদাস' গ্রন্থখানি এই জীবনী-রচনায় আমাদের প্রধান উপজীব্য।

রচনাপঞ্জী

গোবিন্দচন্দ্র জীবিতকালে যে-কয়খানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকাদির বিবরণ হইতে গৃহীত।

১। **প্রসূন** (কাব্য)। ইং ১৮৭০ (?)

"বঙ্গবাণীর শ্রীচরণে তাঁহার প্রথম পুষ্পাঞ্জলি 'প্রসূন' নামে একটি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তকের কথা জানিতে পারা যায়। তখন গোবিন্দচন্দ্র পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক যুবক, সবেমাত্র বিবাহ করিয়াছেন।"—শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী : 'স্বভাব-কবি গোবিন্দদাস'।

২। **প্রেম ও ফুল** (গীতিকাব্য)। ফাল্গুন ১২৯৪ (১২ মার্চ ১৮৮৮)। পৃ. ১২০।

প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীকে উৎসর্গীকৃত। ইহার অন্তর্ভুক্ত "পরশুরামের শোণিত তর্পণ" কবিতাটি ১২৮৭ সালের ৮ম সংখ্যা 'বান্ধবে' মুদ্রিত হয়। রচনাটি যে গোবিন্দচন্দ্রের, সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ এ সংবাদ পরে জানিতে পারিয়াছিলেন। 'প্রেম ও ফুলে'র ২য় সংস্করণে "শ্মশানে সম্ভাষণ" নামে একটি কবিতা (দ্র° 'নব্যভারত,' পৌষ ১২৯৫) "শ্মশান-সঙ্গীত" কবিতাটির পূর্ব্বে সংযোজিত হইয়াছে।

৩। **কুস্কুম** (গীতিকাব্য)। পৌষ ১২৯৮ (১০ জুন ১৮৯২)। পৃ. ১৩৮।

সারদাসুন্দরীকে উৎসর্গীকৃত।

৪। **মগের মুলুক** (ব্যঙ্গকাব্য)। মার্চ ১৮৯৩।

৫। **কস্তুরী** (গীতিকাব্য)। আষাঢ় ১৩০২ (২২ জুলাই ১৮৯৫)। পৃ. ১২০।

দ্বিতীয়া পত্নী প্রেমদাসুন্দরীকে উৎসর্গীকৃত।

৬। **চন্দন** (গীতিকাব্য)। আশ্বিন ১৩০৩ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬)। পৃ. ১২০।

নির্ব্বাসিত কবির বিলাপকাহিনী।

৭। **ফুলরেণু** (সনেট-সমষ্টি)। আশ্বিন ১৩০৩ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬)। পৃ. ১২০।

৮। **বৈজয়ন্তী** (গীতিকাব্য)। কার্ত্তিক ১৩১২ (২০ নবেম্বর ১৯০৫)। পৃ. ১৪৩।

প্রতিপালক, মুক্তাগাছার ভূম্যধিকারী রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরীকে উৎসর্গীকৃত।

৯। **শোক ও সান্ত্বনা** (কবিতা)। ১৩১৬ সাল (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৯)। পৃ. ১২

দার্জিলিঙে ভাওয়ালের মধ্যম কুমার রমেন্দ্রনারায়ণের অকস্মাৎ তিরোধান সংবাদে লিখিত। দ্র° 'নব্যভারত,' জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬।

১০। **শোকোচ্ছ্বাস** (কবিতা)। ১৩১৭ সাল।

ভাওয়ালের জ্যেষ্ঠ কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীর অকাল মৃত্যুতে লিখিত।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা ঃ মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গোবিন্দচন্দ্রের প্রথম রচনা বোধ হয় রাজকৃষ্ণ রায়-সম্পাদিত

'বীণা'র ১ম বর্ষে (কার্ত্তিক ১২৮৫) মুদ্রিত "একদিন" নামে একটি কবিতা। ১ম-২য়-৪র্থ বর্ষের 'বীণা'য় তাঁহার অনেকগুলি প্রাথমিক রচনার সন্ধান পাওয়া যায় ; ইহার কয়েকটি তাঁহার কোন কাব্যগ্রন্থে স্থান পায় নাই। ইহা ছাড়া 'নব্যভারত' (১২৯২, ১৩১০, ১৩১৪-২৫), 'নবজীবন' (১২৯৪), 'সৌরভ' (১৩২০-২৬), 'প্রতিভা' (১৩১৮), 'বঙ্গদর্শন' (১৩১৫), 'মানসী' (১৩২২), 'নারায়ণ' (১৩২৫), 'সাহিত্য' (১২৯৮, ১৩০৩), 'আলোচনা' (১২৯২), 'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা' (১৩১৮-১৯) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁহার বহু রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ইহার অধিকাংশই পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত।

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়-সঙ্কলিত 'ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী'তেও গোবিন্দচন্দ্রের দেশভক্তিমূলক ও সুরাপান-নিবারণী কয়েকটি গান স্থান পাইয়াছে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, ১৩২২ সালে তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কবিতায় অনুবাদ করিয়াছিলেন ; ইহার মাত্র কয়েকটি শ্লোকের কাব্যানুবাদ 'স্বভাব-কবি গোবিন্দদাস' পুস্তকের ১৯৭-৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

গোবিন্দচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

গোবিন্দচন্দ্র অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সে প্রতিভা স্বাভাবিক গতিতেই স্ফুরিত হইয়াছিল,—সংস্কার ও বৈদগ্ধ্যের দ্বারা তাহা পরিপূর্ণভাবে শিল্পসুষমামণ্ডিত হয় নাই। "স্বভাব-কবি" আখ্যার মধ্যেই তাঁহার যথার্থ পরিচয় নিহিত আছে। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের মত তিনি পরিচিত পরিবেশ ও পরিচিত মানুষ সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব কবিতার আকারে অবিরাম প্রকাশ করিয়াছেন ; মিল, শব্দযোজনা ও ব্যাকরণসঙ্গত অলঙ্কারাদির দিকে সাধকের মত দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই, যাহা মনে আসিয়াছে তাহাই

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্ষার আবিল বন্যার সঙ্গে তাঁহার কাব্যপ্রবাহের তুলনা চলে। তাহাতে বেগ আছে, আড়ম্বর আছে, রুক্ষতা আছে,—স্বচ্ছতোয়া তরঙ্গিণীর নির্ম্মল সৌন্দর্য্য নাই। তাঁহার সুবিপুল প্রাণশক্তি, সর্ব্বগ্রাসী অনুভূতি এমন অনেক স্তবক ও পংক্তির সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাতে রুচিবাগীশের মনে রূঢ় আঘাত লাগিবে। শিল্পরসিকেরাও বিচলিত হইবেন তাঁহার কাব্যে ভাল-মন্দের অবাধ মেশামেশি দেখিয়া; এক-একটা অপরূপ পংক্তি ও স্তবকের সঙ্গে এমন নিকৃষ্ট পংক্তি ও স্তবক যুক্ত হইয়াছে যে, মনে ধাক্কা লাগে। এই সব সত্ত্বেও স্বভাব-কবি, প্রকৃতির কবি এবং মানুষের কবি গোবিন্দচন্দ্রের মধ্যে এমন কাব্যশক্তির স্ফুরণ হইয়াছে যে, তাঁহাকে বাংলার প্রথম শ্রেণীর কবি-সমাজে স্থান দিতে সমালোচকেরা বাধ্য হইয়াছেন। কবি গোবিন্দচন্দ্রের কবিতাগুলির একটি বাছাই-করা সংস্করণ বাহির হইলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাঁহাকে বুঝিবার সুবিধা হইবে। তাঁহার অসংখ্য কবিতা এখনও সাময়িক-পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই লুকাইয়া আছে; কবি গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যপ্রতিভার পরিচয় দিবার জন্য আমরা সেইগুলি হইতেই কিছু কবিতা নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দিলাম। কবির বিস্তৃততর পরিচয় যাঁহারা চাহিবেন, তাঁহাদিগকে তাহার সমগ্র রচনা আস্বাদ করিতে হইবে।

স্বদেশ

১

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এ দেশ তোমার নয়;—
এই যমুনা গঙ্গা নদী, তোমার ইহা হ'ত যদি,
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্ম্মা ভরা চুনি মণি,

সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয় ?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয় !

২

এই যে ক্ষেতে শস্য ভরা, তোমার ত নয় একটি ছড়া,
তোমার হ'লে তাদের দেশে চালান কেন হয় ?
তুমি পাও না একটি মুষ্টি, মরছে তোমার সপ্ত গুষ্ঠি,
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি—জগৎ ভরা জয়।
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয় !

৩

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয়,
এই যে জাহাজ, এই যে গাড়ী, এই যে পেলেস—এই যে বাড়ী,
এই যে থানা জেহেলখানা—এই বিচারালয়,
লাট, ছোট লাট তারাই সবে, জজ মাজিষ্টর তারাই হবে,
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোম্‌রা সমুদয়—
বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয় !

৪

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয়,
আইন কানুনের কর্ত্তা তারা, তাদের স্বার্থ সকল ধারা,
রিজার্ভ করা সুখ সুবিধা তাদের ভারতময়,
তোমার বুকে মেরে ছুরি, ভরছে তাদের তেরজুরি,
তাদের চার্চ্চে তাদের নাচে তাদের বলে ব্যয় ;
এক-শ রকম টেক্‌স দিবা, ব্যয়ের বেলায় তোমরা কিবা
গাধার কাছে বাধার বল বাঘের কবে ভয় ?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয় !

৫

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এ দেশ তোমার নয়,
যে দেশ যাদের অধিকারে, তারাই তাদের বল্‌তে পারে,
কুকুর মেকুর ছাগল কবে দেশের মালিক হয় ?
সে সব বাবু বিলাত গিয়ে, বাবুনীদের সঙ্গে নিয়ে,
প্রসবিয়ে আন্‌ছে তাদের শাবক সমুদয়,
'ব্রিটিশ বরণ' ব'লে দাবি, কর্লে নাকি বিলাত পাবি ?
লজ্জাহীনের গোষ্ঠী তোরা নাইক লজ্জা ভয় !
এই যদি রে 'ব্রিটিশ বরণ' মরণ কারে কয় ?···

—'নব্যভারত,' পৌষ ১৩১৪

কবে মানুষ মরে গেছে

১

মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে শিওরে উঠে কায় !
এইখানে সে শুইত খাটে,
পদ্মমুখী রাণীর ঠাটে,
হৃদ্দ কোমল পদ্ম সম ধবল বিছানায় !
আজো দেখি দিন দু'পরে,
তেমনি শুয়ে ভঙ্গি ভরে,
রাঙ্গা মুখে রাঙ্গা চোখে ভাঙ্গা ঘুমে চায় !
মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক যায় !

২

মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে চম্‌কে উঠে কায় !

এইখানে সে শুইছে ভুঁয়ে,
আমার হাতে মাথা থুয়ে,
অমল বেশে হাস্‌ছে যেন কমল শেহালায়!
আজো দেখি দু'পর বেলা,
ভুঁয়ে শুয়ে ফুলের খেলা,
আকুল প্রাণে দুকুল পেতে বকুল শোভা পায়!
মরে গেছে মানুষ সে যে বছর তিনেক যায়!

৩

মরে গেছে মানুষ কবে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে উছট লাগে পায়!
এইখানে সে বেড়ার কাছে,
হেলান দিয়ে বসিয়াছে,
হরিণ হেলা শশী যেন হাস্‌ছে বারেন্দায়।
এইখানে দরজার থামে,
দাঁড়াত হেলিয়ে বামে,
আজো দেখি তেম্‌নি তারে মধুর ভঙ্গিমায়,
হরিণ হেলা শশী যেন আকাশ নীলিমায়!

৪

কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়,
আজো তাহার ঘরে যেতে জ্বর আসিছে গায়!
ঐখানে সে দাঁড়াইয়া,
মুখ দেখিত আয়না দিয়া,
অমল জলে কমল যেন শরৎ-সুষমায়!
আজো আমি দিন দু'পরে,
আয়নাতে তার চাই না ডরে,

কি জানি কি পাছে তাহার মুখ বা দেখা যায়!
কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়!···

—'নব্যভারত', চৈত্র ১৩১৭

উপদেশ

শ্রীহরি শ্রীবিষ্ণু ভগবান্
দীনবন্ধু করুণা-নিধান
এ গৃহের গৃহী তিনি, এ বিশ্ব-মন্দিরে যিনি,
সর্ব্বত্র করেন অধিষ্ঠান!
তাঁর পূজা তাঁর অর্চ্চনায়
অবিচল ভকতি শ্রদ্ধায়,
রহ রত সেবক-সন্তান,
ধনে জ্ঞানে লক্ষ্মী সরস্বতী,
হেথা সদা করিবে বসতি,
লাভ হবে সৌভাগ্য-সম্মান!
অনাথ আতুর অন্ধ জনে
কাঙ্গাল বৈষ্ণব ভিক্ষুগণে,
যথাশক্তি করিও প্রদান,
শোকে দুঃখে জলে যার হিয়া,
সান্ত্বনা প্রবোধ তারে দিয়া,
তার শোক করিও নির্ব্বাণ!
যে কেহ আসিবে এই দ্বারে,
বিমুখ ক'র না কভু তারে,
সবে স্নেহ রাখিও সমান,

সর্ব্বভূতে সম দয়া যার,
শত্রু মিত্রে সম ব্যবহার,
কৃষ্ণ তার করেন কল্যাণ!
পরহিংসা, পরনিন্দা পাপ,
ঘটে তাহে মহা পরিতাপ,
এ গৃহে পায় না যেন স্থান!
কাহারো ক'র না অপকার,
বিপন্নেরে করিও উদ্ধার,
তাহে হন তুষ্ট ভগবান্!
সকলের দর্প অহঙ্কার,
দর্পহারী করেন সংহার,
গৌরবে হয়ো না হতজ্ঞান।
বিনয়ে থাকিও অবনত,
নিজ নিন্দা শুনি শত শত,
ভুলেও দিও না তাহে কান।
অধর্ম্মের বিনাশ নিশ্চয়,
ধর্ম্মের নিশ্চয় হয় জয়,
সদা ধর্ম্মে থেকো আস্থাবান্,
ঢেউ সম পাপের উন্নতি,
পুণ্যের নাহিক অধোগতি,
চিব দৃঢ় গিরি গরীয়ান্।
এই গৃহ—এই দেবালয়,
সতত পবিত্র যেন রয়,
পাতকে ক'র না কভু ম্লান,
সৎ কথা সৎ আলাপনে
হরিনাম কীর্ত্তন শ্রবণে,
যে আসে, জুড়ায় যেন প্রাণ।
—১৬ই বৈশাখ ১৩১১ সন।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৭৫*

শিবনাথ শাস্ত্রী

১৮৪৭—১৯১৯

শিবনাথ শাস্ত্রী

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

উনবিংশ শতাব্দীতে যে-সকল দিক্‌পাল মনীষীর আবির্ভাবে বাংলা দেশে নব যুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহাদের অন্যতম। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শিবনাথ ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, ধর্ম্মপ্রচারক, সমাজ-সংস্কারক, লোকসেবক এবং স্বাধীনতার উপাসক। তাঁহার রচিত কাব্য এবং উপন্যাস-সমূহ দ্বারা এক দিকে যেমন বাংলা-সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে, অন্য দিকে তেমনই আবার তাঁহার বিচিত্র কর্ম্মসাধনা নানা দিক্ দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম ও সুগভীর মানব-প্রীতি তাঁহাকে সারা জীবন বিবিধ কল্যাণ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। নিজের জীবনটিকে তিনি মানব-হিত-ব্রতে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন এবং বাংলার তদানীন্তন ধর্ম্মক্ষেত্রে ও সমাজ-জীবনে নূতন প্রাণসঞ্চার করিতে ও প্রগতিমূলক ভাবধারার প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

১৮৪৭ সনের ৩১এ জানুয়ারি (১৯ মাঘ ১২৫৩) কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে শিবনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা—পণ্ডিত হরানন্দ ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত তেজস্বী ও কোপন-স্বভাব ছিলেন, রাগিলে তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান থাকিত না; কিন্তু তিনি সদাশয়, পরোপকারী এবং প্রখর আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এই সমস্ত কারণে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশেষ প্রিয়পাত্র

হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র; কলেজ ছাড়িবার পর স্বগ্রাম মজিলপুরে সরকারী স্কুলে পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। হরানন্দের বয়স যখন দশ বৎসর, সেই সময়ে চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে হরচন্দ্র ন্যায়রত্নের কন্যা গোলোকমণির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তখন পল্লীগ্রামে স্ত্রীশিক্ষার তেমন প্রচলন ছিল না। হরানন্দ কিন্তু পত্নীকে বাড়ীতে কিছু কিছু লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। গোলকমণি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা এবং গুণবতী মহিলা ছিলেন। শৈশবে শিবনাথ বাডীতে তাঁহার নিকট পড়িতেন। পুত্রের চরিত্র গঠনে মাতার প্রভাব কল্যাণকর হইয়াছিল।

শিবনাথের পিতৃকুলের ন্যায় মাতৃকুলও পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহার মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন এক জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, তিনি 'সংবাদ-প্রভাকর' সম্পাদনে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে সহায়তা করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদকরূপে বাংলা-সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া আছেন। শিবনাথের জীবনে মাতুলের উন্নত চরিত্রের প্রভাবও বড় কম ছিল না। আরও এক জনের চরিত্র শিবনাথের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; তিনি প্রপিতামহ—বৃদ্ধ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার, তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক পুরুষ সংসারে বড-একটা দেখা যায় না।

বিদ্যাশিক্ষা

পাঁচ বৎসর বয়সে মজিলপুরের গ্রাম্য পাঠশালায় শিবনাথের শিক্ষা আরম্ভ হয়। মাতার যত্নে তিনি দিন দিন লেখাপড়ায় উন্নতি করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে গোলোকমণি পুত্রকে পাঠশালা ছাড়াইয়া

স্থানীয় হার্ডিঞ্জ মডেল স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। এখানে শিবনাথের পাঠ্য ছিল—স্কুল-বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'বর্ণমালা' ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা'।

শিবনাথের বাল্যকালেই মজিলপুরের কয়েক জন যুবক গ্রামের উন্নতিকল্পে বিবিধ কল্যাণ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। ১৮৫৬ সনে তাঁহারা 'মজিলপুর পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। শিবকৃষ্ণ দত্ত নামে জনৈক প্রগতিপন্থী যুবকের চেষ্টায় ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রোত মজিলপুরে আসিয়া প্রবেশ করে এবং তিনিই উমেশচন্দ্র দত্তকে (পরে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'-সম্পাদক) ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরাগী করিয়া তোলেন। এই পরিবেশের মধ্যে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া শিবনাথের দিন কাটিতে লাগিল।

শিবনাথের উপনয়ন-সংস্কার হয় যখন তিনি নয় বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন। ইহার অল্প দিন পরেই ১৮৫৬ সনের মধ্য ভাগে হরানন্দ ইংরেজী শিখাইবার উদ্দেশ্যে পুত্রকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। তাঁহার ধারণা ছিল, ইংরেজী না শিখিলে ভাল চাকরি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সংস্কৃত কলেজে তখন ইংরেজী শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক। শিবনাথকে সংস্কৃত কলেজেই ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল।

চাঁপাতলায় মাতুলের বাসায় থাকিয়া শিবনাথ সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ছাত্র-জীবনে নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়া তাঁহাকে লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছে। কখন-কখন তাঁহাকে রান্নাবান্নাও করিতে হইয়াছে। তদুপরি মাতুলের বাসায় যে-সকল যুবক আশ্রিত হিসাবে স্থান পাইয়াছিল, তাহাদের অনেকের নৈতিক চরিত্র নির্দ্দোষ ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই কলুষতাপূর্ণ

আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিয়াও শিবনাথ এক দিনের তরেও বিপথগামী হন নাই, বরং লেখাপড়ায় উত্তরোত্তর উন্নতি দেখাইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি তিনি কিরূপ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন ক্যালেণ্ডার হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

ইং ১৮৬৬…এনট্রান্স…প্রথম বিভাগ…সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল।

১৮৬৮ ··এফ. এ. ··প্রথম বিভাগ, ৪র্থ স্থান…সংস্কৃত কলেজ।

১৮৭১ ··বি. এ.…দ্বিতীয় বিভাগ…সংস্কৃত কলেজ।

১৮৭২…এম. এ.…দ্বিতীয় বিভাগ, সংস্কৃতে…সংস্কৃত কলেজ।

ছাত্রাবস্থাতেই শিবনাথ বিবিধ সমাজ-সংস্কারমূলক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি শৈশবাবধি বিদ্যাসাগরের চেলা ও বিধবা-বিবাহের পক্ষ।" তিনি যখন এফ. এ. পড়েন, তখন তাঁহারই চেষ্টায় মহালক্ষ্মী নামে এক অষ্টাদশবর্ষীয়া বিধবাব সহিত তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু বিপত্নীক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বিবাহ হয় (ইং ১৮৬৮)। এই বিবাহের ফলে যোগেন্দ্রনাথের উপর নির্য্যাতন সুরু হইলে শিবনাথ যে-ভাবে বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর ভার গ্রহণ করিয়া অপরিসীম দুঃখকষ্ট হাসিমুখে বরণ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার সঙ্কল্পেরই দৃঢ়তা নহে—আদর্শনিষ্ঠারও পরিচায়ক। পর-বৎসর শিবনাথ উদ্যোগী হইয়া বহুবাজারের শ্রীনাথ দাসের পুত্র উপেন্দ্রনাথের সহিত ভবানীপুর-নিবাসী নবকৃষ্ণ বসুর বিধবা কন্যার বিবাহ দেন।*

---

*"গত শুক্রবার রাত্রিতে ভবানীপুরস্থ মৃত নবকৃষ্ণ বসুর বিধবা কন্যার সহিত বহুবাজারস্থ শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাসের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।"—'সোমপ্রকাশ', ৫ শ্রাবণ ১২৭৬।

বিবাহ

আনুমানিক ১৮৬০ সনে রাজপুর গ্রামের নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রসন্নময়ীর সহিত শিবনাথের বিবাহ হয়। শিবনাথ তখন বার-তের বৎসরের বালক : কন্যার বয়স দশ বৎসরও উত্তীর্ণ হয় নাই। দাক্ষিণাত্য বৈদিকদের কুলপ্রথা অনুসারে, শিবনাথ যখন দুই বৎসরের শিশু এবং প্রসন্নময়ীর বয়ঃক্রম এক মাস মাত্র, তখনই ইঁহাদের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখা হইয়াছিল। বিবাহের পাঁচ ছয় বৎসর পরে শিবনাথের পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রসন্নময়ী ও তাঁহার পিতৃপরিবারের লোকজনের উপর বিরূপ হইয়া পুত্রবধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন। তাহার পর এক রকম জোরজবরদস্তি করিয়া বর্দ্ধমান জেলার দেপুর গ্রামের অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিরাজমোহিনীর সহিত শিবনাথের দ্বিতীয় বার বিবাহ দেন।

ধর্ম্মচেতনা : ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ

দ্বিতীয় বার বিবাহের ফলে শিবনাথের জীবনের গতি ভিন্ন পথে ফিরিল। তাঁহার মনে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া সুরু হইল। একটি নিরপরাধা বালিকার চরম দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়াছেন, এ কথা মনে করিয়া তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি আত্মচরিতে লিখিয়াছেন :—"পিতার আদেশে বিবাহ করিতে যাইবার পূর্ব্বে আমি এই ভাবিয়া মনকে প্রস্তুত করিয়াছিলাম যে, রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস করিয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন, আমি না হয় পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া চিরকাল কষ্ট পাইব। কিন্তু এই অনুতাপের

মুহূর্ত্তে সে চিন্তা আর আমাকে বল দিতে পারিল না। আমি মনে করিতে লাগিলাম, মানুষ আপনার কাজের জন্য আপনিই দায়ী, হাজার গুরুর আদেশ হইলেও পাপের অংশ কেহ লয় না। আত্মনিন্দাতে আমার মন অধীর হইয়া উঠিল।" এই মানসিক গ্লানির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শিবনাথ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন—প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রার্থনা তাঁহার চিত্তে যেন নব বল আনিয়া দিল। "মানুষের ভয় তাঁহার মন হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল, এবং নিজ বিশ্বাস অনুসারে চলিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইতে লাগিল।" তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের উপাসনাতে যাইতে সুরু করিলেন (ইং ১৮৬৫)। ক্রমশঃ ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার আত্মিক যোগ স্থাপিত হইল। সমাধ্যায়ী বন্ধু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মুখে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মহত্ত্বের কথা বার বার শুনিয়া তিনি অন্তরে অন্তরে তাঁহার বিশেষ অনুরাগী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত তখন পড়াশুনা ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শিবনাথ বন্ধু উমেশচন্দ্র ও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সহিত মাঝে মাঝে তাঁহাদের বাসায় যাইতে লাগিলেন।

হরানন্দ কলিকাতায় আসিয়া শুনিলেন, শিবনাথ ব্রাহ্মসমাজে গতায়াত সুরু করিয়াছে। তিনি পুত্রকে সমাজের উপাসনাতে যোগদান করিতে নিষেধ করিলেন। শিবনাথ বিনীতভাবে জানাইলেন, "আপনার আজ্ঞা অদ্যাবধি লঙ্ঘন করি নাই, আপনার সকল আজ্ঞা শুনিতে আজও প্রস্তুত আছি—কিন্তু আমার ধর্ম্মজীবনে হাত দিবেন না, আমি ব্রাহ্মসমাজে না গিয়া পারিব না।" হরানন্দ বিষণ্ণ হৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। শিবনাথের মাতা স্বামীর অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখ

দেখিয়া মনে করিলেন—ছেলের কোন অকল্যাণ হইয়াছে। পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতেই হরানন্দ সংক্ষেপে জবাব দিলেন—"সে মরেছে!"

বাড়ী গেলেই শিবনাথকে ঠাকুরপূজা করিতে হইত। সে-বার পূজার ছুটিতে বাড়ী গিয়া শিবনাথ দৃঢ়তার সহিত পিতামাতাকে জানাইয়া দিলেন যে, তিনি আর কপট পূজা করিবেন না—ধর্ম্মে প্রবঞ্চনা রাখিতে পারিবেন না। কুপিত হরানন্দ পুত্রকে প্রহার করিয়া ঠাকুর-ঘরে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু শিবনাথ সঙ্কল্পে অবিচলিত, বলিলেন,—"কেন বৃথা মারিবেন, যতই মারুন আমি ধীরভাবে সহ্য করিব, কিন্তু পূজা আর করিব না, আমার দেহ হইতে এক-একখানা হাড় খুলিয়া লইলেও আর আমাকে ওখানে লইতে পারিবেন না।" পিতা অগত্যা পুত্রকে ঠাকুরপূজা হইতে রেহাই দিতে বাধ্য হইলেন। শিবনাথ লিখিয়াছেন, "সেই দিন হইতে আমার মূর্ত্তিপূজা রহিত হইল। আমি সত্যস্বরূপের উপাসক হইলাম।

তখন ব্রাহ্মদের মধ্যে দুইটি দল ছিল—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি ব্রাহ্মসমাজ ও কেশবচন্দ্র সেনের উন্নতিশীল দল। ১৮৬৭ সন পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ ও আদি ব্রাহ্মসমাজের দিকেই শিবনাথের হৃদয়ের আকর্ষণ অধিক ছিল। কিন্তু ১৮৬৮ সনের মাঘোৎসবের সময় কেশবচন্দ্রের দলের সহিত তাঁহার যোগ গাঢ়তর হয়। কিরূপে ইহা ঘটে, সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন :—

> ১৮৬৮ সালের প্রারম্ভে শুনিলাম, মাঘোৎসবের সময় উন্নতিশীল দল আপনাদের উপাসনা-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিবেন এবং তদুপলক্ষে নগরকীর্ত্তন হইবে।...আমি শাক্ত বংশের ছেলে, বৈষ্ণবদের কীর্ত্তনের প্রতি পূর্ব্বাবধি অতিশয় অশ্রদ্ধা ছিল।...আমি ভাবিলাম উন্নতিশীল দল রাস্তাতে ঢলাঢলি করিতে যাইতেছে। এই ভাবিয়া

বিরক্ত চিত্তে ১১ই মাঘ সকালবেলা সে দলের দিকে না গিয়া আদি সমাজের উপাসনাতে গেলাম। উপাসনান্তে আদি সমাজের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছি, এমন সময় কয়েকজন বাবু আসিতেছেন; তাঁহারা বলিতে বলিতে আসিতেছেন, 'মহাশয়, দেখলেন না ত, কেশব সহর মাতিয়ে তুলেছেন।' নগরকীর্ত্তনে হাস্যাস্পদ না হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এই কথাটা বড় নূতন লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়, সে কি রকম?' তখন তাঁহারা আমার হস্তে নগরকীর্ত্তনের কাগজ দিলেন। আমি সেই সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহাতে আছে—

তোরা আয় রে ভাই এত দিনে দুঃখের নিশি হ'ল অবসান
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
নর-নারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার। ইত্যাদি।

এই আহ্বান-ধ্বনি আমার প্রাণে বাজিল, আমার যেন মনে হইল, আমাকে ডাকিতেছে। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে আদর্শ আমার নিকট ধরিল, তাহাতে আমার প্রাণ মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইহাদের উৎসব হবে কোথায়?' শুনিলাম সিন্দুরিয়াপটীস্থ গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে; আমি সেই দিকে চলিলাম।...গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে গিয়া দেখি,......তখনও উন্নতিশীল দলের লোকেরা সেখানে আসিয়া পৌছান নাই। তখন আবার কলুটোলা কেশববাবুর ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। গিয়া দেখি, কেশববাবুরা সদলে সবে ফিরিয়া আসিয়া, ভিক্ষার ঝুলিতে যে টাকা পাইয়াছেন তাহা গুণিতেছেন। আমার পুরাতন সহাধ্যায়ী বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সে সঙ্গে আছেন। গোঁসাইজী আমাকে

দেখিয়াই 'কি ভাই!' বলিয়া আসিয়া আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন। সেই আমাকে উন্নতিশীল দলের সঙ্গে যেন বাঁধিয়া ফেলিলেন। তৎপরে আমি তাঁহাদের সঙ্গে গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে গেলাম। তাঁহারা সেদিন আহার করিলেন না, আমারও আহারের কথা মনে রহিল না। উৎসব-মন্দিরে গিয়া সমস্ত দিন উৎসব চলিল।......

সায়ংকালে গবর্ণর-জেনারেল লর্ড লরেন্স আসিলেন। সেদিন কেশববাবু Regenerating Faith বিষয়ে উপদেশ দিলেন। এরূপ উপদেশ আমি অল্পই শুনিয়াছি। ধর্ম্মবিশ্বাস যদি নবজীবন আনিয়া না দেয় তবে তাহা ধর্ম্মবিশ্বাস নয়, এ সত্য আমার সমক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য একটা নূতন দ্বার যেন খুলিয়া দিল। আমি উন্নতিশীল দলের সঙ্গে হাড়ে হাড়ে বাঁধা পড়িলাম।

১৮৬৯, ২২এ আগস্ট ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। এইদিন শিবনাথ, কৃষ্ণবিহারী সেন, আনন্দমোহন বসু, রজনীনাথ রায়, শ্রীনাথ দত্ত প্রমুখ ২১ জন যুবক প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। দীক্ষা গ্রহণের কিছুদিন পরে পিতামাতা ও মাতুলের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া শিবনাথ উপবীত ত্যাগ করিলেন। ইহাতে তাঁহার পিতার সংস্কারে এরূপ আঘাত লাগিল যে, তিনি শিবনাথকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। ইহার পর দীর্ঘকাল হরানন্দ আর 'কালাপাহাড়' পুত্রের মুখদর্শন করেন নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের পর শিবনাথ কেশবচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি কেশববাবুর নিকট অনেক শিখিয়াছি। কি ভাবে ঈশ্বরের কাজ করিতে হয় তাহা তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিয়াছি। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর কাহাকে বলে তাহা তাঁহাকে দেখিয়া জানিয়াছি।" ১৮৭০ সনে ফেব্রুয়ারি

মাসের মধ্য ভাগে কেশবচন্দ্র বিলাত যাত্রা করেন এবং কয়েক মাস পরে —বৎসরের শেষ ভাগে স্বদেশে ফিরিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করেন। তিনি ইণ্ডিয়ান রিফর্ম এসোসিয়েশন বা ভারত-সংস্কার সভা স্থাপন করিয়া তাহার অধীনে Temperance, Education, Cheap Literature, Technical Education প্রভৃতি অনেকগুলি বিভাগ খুলিলেন (২ নবেম্বর ১৮৭০)। এক পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র—'সুলভ সমাচার' প্রকাশ (১৫ নবেম্বর ১৮৭০) তাঁহারই কীর্ত্তি। সভার সুরাপান-বিভাগের সভ্যরূপে শিবনাথ 'মদ না গরল' নামে একখানি মাসিকপত্র বাহির করিলেন (এপ্রিল ১৮৭২)। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতেই কেশবচন্দ্র এবং শিবনাথ-প্রমুখ অনুগামীদের চেষ্টায় ১৮৭২ সনের তিন আইন বিধিবদ্ধ হয় (১৯ মার্চ)। এই আইনমতে চতুর্দ্দশ বর্ষকে বালিকার বিবাহের সর্ব্বনিম্ন বয়স বলিয়া ধার্য্য হয়।

"কেশববাবু ইংলণ্ডে ইংরাজদের গৃহকর্ম্ম দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া আসিয়াছিলেন। সর্ব্বদা বলিতেন middle class English home-এর ন্যায় institution পৃথিবীতে নাই। তাঁহার মনে হইল, কতকগুলি ব্রাহ্ম পরিবারকে একত্র রাখিয়া কিছু দিন সময়ে আহার, সময়ে বিশ্রাম, সময়ে কাজ, সময়ে উপাসনা, এইরূপ নিয়মাধীন রাখিয়া, শৃঙ্খলামত কাজ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা সেই ভাব লইয়া চারিদিকের ব্রাহ্ম পরিবারে ব্যাপ্ত করিতে পারে।" এই ভাব লইয়াই তিনি ১৮৭২ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি ভারত-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বি. এ. পাস করিবার পরই শিবনাথের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয়; কেশবচন্দ্রের পদানুসরণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার বাসনা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। তিনি ১৮৭২ সনের প্রারম্ভে এম. এ. পাস করিয়া, "শাস্ত্রী" উপাধি পাইয়া কলেজ হইতে বাহির হইবা মাত্র

কেশবচন্দ্র তাঁহাকে তাঁহার নব-প্রতিষ্ঠিত 'বয়স্থা মহিলা বিদ্যালয়ে' (তৎকালে ভারত-আশ্রমে স্থানান্তরিত) শিক্ষকতা-কার্য্য দিয়া আশ্রমে সপরিবারে থাকিতে আদেশ করিলেন। "বয়স্কা ছাত্রীগণের শিক্ষার উপায় এবং অন্তঃপুরে শিক্ষাদানার্থ শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা নিতান্ত আবশ্যক"—এই উভয় লক্ষ্য সাধনোদ্দেশ্যে ১৮৭১, ১লা ফেব্রুয়ারি ভারত-সংস্কারক সভা কর্ত্তৃক বিদ্যালয়টি সংস্থাপিত হয়। শিবনাথ নাম মাত্র বেতনে সপরিবারে দারিদ্রের মধ্যে আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিছু দিন যাইবার পর কেশবচন্দ্র ও তাঁহার দলের সহিত স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, আদেশবাদ প্রভৃতি লইয়া তাঁহার মতভেদ দেখা দিল। তিনি যেন নিজেকে মিশ খাওয়াইতে পারিতেছিলেন না। ঠিক এমনি সময় পীড়িত মাতুলের আহ্বান আসিল। শিবনাথ ভারত-আশ্রম ত্যাগ করিয়া চাঙ্গড়িপোতায় যাইয়া 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদন ভার গ্রহণ করিলেন এবং মাতুলের প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় স্কুলের সম্পাদক ও হেডমাষ্টার হইলেন। যোগ্যহস্তে সকল দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া ১৮৭৩ সনের শেষ ভাগে দ্বারকানাথ নিশ্চিন্ত মনে কাশী চলিয়া গেলেন। এখানে শিবনাথ মিউনিসিপ্যালিটি সংস্কার, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, স্কুল সংস্কার, হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের পুনরুজ্জীবন ইত্যাদি বিবিধ কল্যাণ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই তাঁহাকে ম্যালেরিয়া রোগে ধরিল এবং বৎসর-দেড়েকের মধ্যে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ১৮৭৪ সনের শেষ ভাগে ভবানীপুরে সাউথ সুবার্বণ স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হইয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন।

শিবনাথের ভারত-আশ্রমে থাকিবার সময়ে এবং চাঙ্গড়িপোতা বাসকালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নানা আন্দোলন চলিয়াছিল।

ভবানীপুরে আসিয়া তিনি দেখিলেন, কেশবচন্দ্রের মত ও কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিকূলতা স্থরু হইয়াছে এবং দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী-প্রমুখ ব্রাহ্ম-যুবকগণ একটি প্রতিবাদী দল গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই দলের সহিত শিবনাথের মতের ঐক্য ছিল। এই সময়ে কেশবচন্দ্রের মতের প্রতিবাদ ও স্বাধীনভাবে ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনার জন্য 'সমদর্শী' নামে একখানি দ্বিভাষী পত্রের আবির্ভাব হয়। শিবনাথ ইহার সম্পাদক হওয়াতে সর্ব্বসাধারণ তাঁহাকেই অগ্রসর-দলের নেতা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

ভবানীপুরে বাসকালে ১৮৭৫ সনে পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের সহিত শিবনাথের যোগাযোগ হয়। তিনি 'আত্মচরিতে' লিখিয়াছেন :—

> "আমাদের ভবানীপুর সমাজের একজন সভ্য দক্ষিণেশ্বরে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়া আমাকে বলিতেন যে, দক্ষিণেশ্বরের কালীর মন্দিরে একজন পূজারী ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহার কিছু বিশেষত্ব আছে। এই মানুষটি ধর্ম্ম সাধনের জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। শুনিয়া রামকৃষ্ণকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। যাইব যাইব করিতেছি, এমন সময় 'মিরার' কাগজে দেখিলাম, যে, কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়েছিলেন এবং তাঁহার সহিত কথা কহিয়া প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া আসিয়াছেন। শুনিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইবার ইচ্ছাটা প্রবল হইল।...
>
> "প্রথম দর্শনের দিন হইতেই আমার প্রতি রামকৃষ্ণের বিশেষ ভালবাসার লক্ষণ দৃষ্ট হইল। আমিও তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ চমৎকৃত হইলাম। আর কোনও মানুষ ধর্ম্ম সাধনের জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন কি না, জানি না।...

"রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়া এই একটা ভাব মনে আসিত যে, ধর্ম্ম এক ; রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। ধর্ম্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথায় কথায় ব্যক্ত করিতেন। ইহার একটি নিদর্শন উজ্জ্বলরূপে স্মরণ আছে। একবার আমি দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সময় আমার ভবানীপুরস্থ খৃষ্টীয় পাদরী বন্ধুটিকে সঙ্গে লইয়া গেলাম ; তিনি আমার মুখে রামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। আমি গিয়া যাই বলিলাম, 'মশাই, এই আমার একটি খৃষ্টান বন্ধু আপনাকে দেখ্‌তে এসেছেন,' অমনি রামকৃষ্ণ প্রণত হইয়া মাটিতে মাথা দিয়া বলিলেন, 'যীশু খৃষ্টের চরণে আমার শত শত প্রণাম।' আমার খৃষ্টীয় বন্ধুটি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মশাই যে যীশুর চরণে প্রণাম করছেন, তাঁকে আপনি কি মনে করেন ?'

উত্তর। কেন, ঈশ্বরের অবতার।

খৃষ্টীয় বন্ধুটি বলিলেন, ঈশ্বরের অবতার কিরূপ ? কৃষ্ণাদির মত ?

রামকৃষ্ণ। · রূপ। ভগবানের অবতার অসংখ্য, যীশুও এক অবতার।

খৃষ্টীয় বন্ধু। আপনি অবতার বল্‌তে কি বোঝেন ?

রামকৃষ্ণ। সে কেমন তা জান ? আমি শুনেছি, কোন কোন স্থানে সমুদ্রের জল জ'মে বরফ হয়। অনন্ত সমুদ্র প'ড়ে রয়েছে, এক জায়গায় কোন বিশেষ কারণে খানিকটা জল জ'মে গেল ; ধর্‌বার ছোঁবার মত হ'ল। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ। অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোন বিশেষ কারণে কোনও এক বিশেষ স্থানে খানিকটা ঐশী শক্তি মূর্ত্তি ধারণ কর্‌লে, ধর্‌বার ছোঁবার মত হ'ল। যীশু প্রভৃতি মহাজনদের যে

কিছু ঐশী শক্তি সে ঐ ঐশী শক্তি, সুতরাং তাঁরা ভগবানের অবতার।

রামকৃষ্ণের সহিত মিশিয়া আমি ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতার ভাব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছি।"

স্বাধীনতা-বোধ

অগ্রসর দলের সহিত নানা আন্দোলনে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও এই সময়ে শিবনাথ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের কাজেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তখন বাংলা দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোন রাজনৈতিক সমাজ ছিল না। প্রধানতঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথের চেষ্টায় এই মহৎ অভাব দূরীভূত হয়। ১৮৭৬ সনের ২৬এ জুলাই এলবার্ট হলে সভা করিয়া ভারত-সভা বা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের জন্ম হয়। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থসংগ্রহের ভার পড়িয়াছিল শিবনাথের উপর।

১৮৭৬ সনের গোড়ার দিকে শিবনাথ ১২০৲ টাকা বেতনে হেয়ার স্কুলের হেডপণ্ডিত ও ট্রানস্লেশন-মাষ্টার নিযুক্ত হন। পর-বৎসর তিনি কয়েক জন উৎসাহী ব্রাহ্ম-যুবককে লইয়া ব্রাহ্ম আদর্শে একটি "ঘননিবিষ্ট" দল (inner circle) গঠনের সূচনা করেন। এই দলে বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি ছিলেন। এক দিন ইঁহারা একটি বিশেষ অনুষ্ঠান করিয়া কয়েকটি মূল সত্যকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানটি সম্বন্ধে শিবনাথ লিখিয়াছেন—

"এক দিন বিশেষ উপাসনার দিন স্থির হইল। ঐ দিন বিশেষ উপাসনানন্তর প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া, আগুন জালিয়া, ঈশ্বরের নাম লইতে লইতে তাহা প্রদক্ষিণপূর্ব্বক, আমরা ঐ অগ্নিতে

আমাদের নিজ নিজ নাম অর্পণপূর্ব্বক, প্রার্থনানন্তর প্রতিজ্ঞাপত্র পুনরায় পাঠ করিয়া স্বাক্ষর করিলাম। সুখের বিষয় যে, ইহার পর আমি ও ঐ দলের আর একজন গবর্ণমেণ্টের চাকুরী পরিত্যাগ করি এবং সেই সকল প্রতিজ্ঞা চিরদিন পালন করিয়া আসিতেছি।"

প্রতিজ্ঞাপত্রটি শিবনাথের রচিত। উহার মূল কথাগুলি এইরূপ :—

১। প্রতিমা-পূজা করিব না।

২। বাক্যে ও কার্য্যে জাতিভেদ মানিব না।

৩। পরিবারে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করিব।

৪। নিজেরা একুশ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করিব না; এবং কোন বালিকাকে তাহাব যোড়শ বৎসর পূর্ব্বে পত্নীরূপে গ্রহণ করিব না।

৫। যথাসাধ্য স্ত্রীলোক এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিব।

৬। নিজেদের এবং দেশের লোকের স্বাস্থ্য শক্তি ও শৌর্য্য বৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম চর্চার প্রচার করিব, এবং নিজেরা অশ্বারোহণ ও বন্দুক-চালনা অভ্যাস করিব এবং দেশমধ্যে যাহাতে এ সকল বিদ্যার বহুল প্রচার হয় তাহার চেষ্টা করিব।

৭। একমাত্র স্বায়ত্ত-শাসনকেই বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করি, তবে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া এখন যে বিদেশীয় রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার আইন-কানুন মানিয়া চলিব। কিন্তু দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্দ্দশা দ্বারা নিপীড়িত হইলেও এই গবর্ণমেণ্টের অধীনে কখনই দাসত্ব স্বীকার

করিব না। (বিপিনচন্দ্র পাল : "সত্তর বৎসর"—'প্রবাসী,' মাঘ ১৩৩৪)।

বস্তুতঃ স্বদেশপ্রেমই ছিল শিবনাথের জীবনের মূল মন্ত্র। ইহারই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষার্থী যুবককে লইয়া তিনি যে কর্ম্মিদলটি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার 'চরিত-কথা'য় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে শিবনাথের জীবনের মূল স্বরটি ধরিতে পারা যাইবে। বিপিনচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

> "স্বদেশপ্রীতিই এই দল গঠনের মূল প্রেরণা ছিল। এই স্বদেশপ্রীতির ভিতর দিয়াই, শিবনাথবাবুর সে সময়ের ধর্ম্মভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, পারিবারিক স্বাধীনতা—জীবনের সর্ব্ব বিভাগে ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদিধর্ম্মের অনধীনতার আদর্শটিকে ফুটাইয়া তোলাই, শিবনাথ-বাবুর এই কর্ম্মিদল গঠনের মূল লক্ষ্য ছিল। কি দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজে, কি কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে, কোথাও এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীণভাবে এই অনধীনতার আদর্শটিকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হয় নাই। ফলতঃ শিবনাথবাবু ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের আর কোনও লোকপ্রসিদ্ধ চিন্তানায়ক বা কর্ম্মনায়ক ব্রাহ্মধর্ম্মের এই নিজস্ব আদর্শটিকে এমনভাবে ধরিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।"

কুচবিহার-বিবাহ : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন

এই "ঘননিবিষ্ট" মণ্ডলী শীঘ্রই এক নূতন আন্দোলনে মাতিয়া উঠিলেন। ১৮৭৮ সনের জানুয়ারি মাসে কুচবিহার-বিবাহের

গুজব শহরে রাষ্ট্র হইল। শিবনাথ তাঁহার স্বলিখিত ডায়েরিতে লিখিতেছেন :—

"৩১শে জানুয়ারি ১৮৭৮ :—ক্রমেই শুনিতেছি কেশববাবু না কি সত্যই রাজার সহিত তাঁর কন্যার বিবাহ শীঘ্র দিতেছেন। তাঁহার কন্যার বয়ঃক্রম আজিও চতুর্দ্দশ পূর্ণ হয় নাই,...রাজারও বয়ঃক্রম সপ্তদশের অধিক হয় নাই। এরূপ স্থলে বিবাহ হওয়া আমার মতে নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ [১৮৭২ সনের তিন] আইনটি পরিত্যাগ করা কেশববাবুর পক্ষে কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য,বোধ হয় না। তাহলে আর কাহাকেও সে পথে প্রেরণ করা দুষ্কর হইবে। কেশববাবু যে কেন এরূপ অবিবেচনার কার্য্য করিতেছেন, দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। তাঁহাকে Principled Man বলিয়া শ্রদ্ধা ছিল, সে শ্রদ্ধাও আর থাকে না। তাঁহার এরূপ কার্য্যে সমাজের বিশেষ অমঙ্গল হইবে। অতএব ইহা লইয়া ঘোরতর আন্দোলন করা আবশ্যক, কারণ তাহা হইলে সমাজের মুখ রক্ষা হইবে। কিন্তু প্রতিবাদ-পত্রটি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবার পূর্ব্বে একবার বন্ধুভাবে তাঁহার নিকট গিয়া সবিশেষ সংবাদ লওয়া কর্ত্তব্য।" (শ্রীহেমলতা দেবী : 'শিবনাথ-জীবনী,' পৃ. ১৫৭-৫ ·)

কেশবচন্দ্রের সহিত সাক্ষাতকারেও যখন কোন বিশেষ সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন শিবনাথ লিখিতেছেন, "সমদর্শী দল, স্ত্রী-স্বাধীনতার দল, নিয়মতন্ত্রের দল, সকল দল এক হইল। এমন কি বৃদ্ধঃ শিবচন্দ্র দেব মহাশয় পর্য্যন্ত আমাদের দলে যোগ দিলেন। সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে মহাবিপদ উপস্থিত।" স্থির হইল অগ্রে একখানি প্রতিবাদ-পত্র কেশবচন্দ্রকে পাঠাইতে হইবে ; এই প্রতিবাদ-পত্র রচনার ভার গ্রহণ করিলেন—

শিবনাথ স্বয়ং। পরবর্ত্তী ৯ই ফেব্রুয়ারি 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' কুচবিহার-বিবাহ সুনিশ্চিত বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইল। ঐ দিনই শিবচন্দ্র দেব, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, শিবনাথ প্রমুখ ২৬ জন বিশিষ্ট ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ-পত্রখানি* কেশবচন্দ্রের নিকট প্রেরিত হইল। কিন্তু কোন ফল হইল না। তাঁহারা আন্দোলন চালাইবার জন্য ১৭ই ফেব্রুয়ারি হইতে 'সমালোচক' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিলেন; শিবনাথ উহার সম্পাদক হইলেন। তিনি ইহার দুই দিন পূর্ব্বে সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষায়, "১লা মার্চ হইতে স্বাধীন হইয়া এই আন্দোলনে ডুবিলাম।"

কেশবচন্দ্র কুচবিহারে গিয়া ৬ই মার্চ অনেকটা হিন্দুমতে রাজপরিবারে নাবালিকা কন্যার বিবাহ দিলেন। এই বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া পুস্তক-পুস্তিকাও প্রচারিত হইতে লাগিল। শিবনাথ 'এই কি ব্রাহ্ম বিবাহ?' লিখিলেন। তাঁহার বন্ধু কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র 'কপালে ছিল বিয়ে কাঁদলে হবে কি?' নামে ২৮ পৃষ্ঠার একটি নাটিকা রচনা করিয়া কেশবচন্দ্র ও তাঁহার দলকে আক্রমণ করিলেন, এমন কি "আচার্য্য-পত্নীকে তাহার মধ্যে টানিয়া আনিয়া তাঁহার প্রতিও লঘুভাবে শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ" করিতে ছাড়িলেন না। এক কথায় প্রতিবাদী দল এরূপ ক্ষুব্ধ হইলেন যে, কেশবচন্দ্র ও তাঁহার দলের সহিত তাঁহাদের মিলনের আর কোন সম্ভাবনাই রহিল না:—তাঁহারা কেশবচন্দ্রের দল ছাড়িয়া আসিয়া ১৮৭৮, ১৫ই মে টাউন-হলে সভা ডাকিয়া 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করিলেন। ১৮৭৯ সনের

* ইহা শ্রীহেমলতা দেবী-প্রণীত 'শিবনাথ-জীবনী'র পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

মাঘোৎসবের সময় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ক্রীত জমিতে নূতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হইল। মন্দির-নির্ম্মাণ তহবিলে একা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সাত হাজার টাকার চেক দিয়া শিবনাথকে বলিয়াছিলেন—"This is my unconditional gift." ১৮৮১ সনের ১০ই মাঘ নব-নির্ম্মিত মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে শিবনাথের জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। তিনি বলিয়াছেন, "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে যাহা কিছু করিয়াছি, তাহাই আমার জীবনের প্রধান কাজ।" সমাজ-প্রতিষ্ঠাকালে শিবনাথ ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের মূল নীতি ছিল দুইটি। শিবনাথের ভাষায় :—"আমরা যখন স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করি, তখন আমাদের মনে দুইটি ভাব প্রবল। প্রথম, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে একনায়কত্ব দেখিয়াছি, কেশববাবু সর্ব্বেসর্ব্বা; এখানে তাহা হইবে না, এখানে সাধারণতন্ত্র প্রণালী অনুসারে কার্য্য হইবে। দ্বিতীয়, কেশববাবু ব্রাহ্মগণের ও ব্রাহ্মসমাজ-সকলের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন; এখানে তাহা হইবে না, এখানে সভ্যগণের ও সমাজ-সকলের মত গ্রহণ করিয়া কার্য্য হইবে।" 'আযৌবন ডেমোক্রাট' শিবনাথ এই সমাজের সঙ্গে একেবারে একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন; তিনি সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ব-কৌমুদী' ও 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার'-সম্পাদন, ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধাদি রচনা এবং আরও নানা কাজের ভার লইয়া গুরুতর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রচারকরূপে যে চারি জন নির্ব্বাচিত হন, তাঁহাদের মধ্যে শিবনাথ ও তাঁহার বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন। শিবনাথ প্রচারকার্য্যব্যপদেশে সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়াছেন। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারকার্য্যেই তিনি তাঁহার সময় ও শক্তি নিঃশেষে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

বিলাত যাত্রা

দীর্ঘকাল যাবং শিবনাথ বিলাতযাত্রার সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি ডায়েরিতে লিখিয়াছেন :—

"১৮৮৭, ১০ আগস্ট :—যতই দিন যাইতেছে, ততই একবার ইংলণ্ডে যাইবার সঙ্কল্প আমার মনে প্রবল হইতেছে। ··ভারতের নব জীবন লাভের জন্য পাশ্চাত্য উদ্যোগশীলতা, কার্য্যতৎপরতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা এ দেশে লোকের মনে স্থান প্রাপ্ত হওয়া উচিত। ব্রাহ্মসমাজ এ দেশকে সেই শিক্ষা দিবেন, অথচ এ দেশীয় ভাবপ্রবণতা, সরসতা ও ধ্যানপরায়ণতা রক্ষা করিবেন। ইহা অতি কঠিন কার্য্য—পাশ্চাত্য উদ্যোগশীলতার কিঞ্চিত ভাব হৃদয়ে করিয়া আনিতে পারিলে ব্রাহ্মসমাজের অনেক কল্যাণ হইবে।"

শিবনাথ ১৮৮৮ সনের ১৫ই এপ্রিল বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে থাকিয়া তিনি ইংরেজের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন। ইংরেজ জাতিব নিয়মানুবর্ত্তিতা, শ্রমশীলতা, অধ্যয়নানুরাগ প্রভৃতি গুণাবলী তাঁহাকে মুগ্ধ করে এবং তাহাদের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের গলদ কোথায়, তাহাও বিশেষভাবে তাঁহার চোখে পড়ে। তিনি তথায় বার্ণার্ডের আশ্রম, জর্জ্জ মূলারের অনাথ-আশ্রম প্রভৃতি ধর্ম্মমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিও দর্শন করেন। ই. বি. কাউয়েল, জেম্‌স্ মার্টিনো, ফ্রান্সিস নিউম্যান, উইলিয়ম ষ্টেড প্রমুখ ব্যক্তিদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়, কাহারও কাহারও সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গতা হয়। ইঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হন এবং ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবন উভয় ক্ষেত্রেই প্রেরণা লাভ করেন। বিলাতের নানা প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মধারা, মহৎ

ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ এবং ইংরেজের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য শিবনাথের মনে এরূপ গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, সেখান হইতে তিনি যেন সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। তিনি ছয় মাস বিলাতে ছিলেন। ফিরিবার পথে ১৮৮৮, ১৯এ নবেম্বর কন্যাকে লিখিতেছেন :—

"যতই বাড়ীর দিকে যাইতেছি, ততই দেশের দুর্ভিক্ষ, প্রজাদের দারিদ্র্য, অজ্ঞতার কথা মনে হইয়া প্রাণ বিষণ্ণ হইতেছে। আবার গিয়া সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। ইংলণ্ডে আসিয়া বড়ই উপকৃত হইয়াছি, অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে হয়।"

বিবিধ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান

শিবনাথ ছিলেন কর্ম্মবীর, তাঁহার কর্ম্মোৎসাহ ছিল অদম্য। সারা জীবন তাঁহার জনহিতকর কর্ম্মানুষ্ঠানের বিরাম ছিল না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নূতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইবার পর তিনি এবং আনন্দমোহন বসু উভয় বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া সিটি স্কুল নামে একটি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন সুরু করেন ; উদ্দেশ্য— "অনেক উৎসাহী ও অনুরাগী ব্রাহ্ম-যুবককে শিক্ষকতা-কার্য্য দিয়া নিকটে রাখা যাইবে, তদ্দ্বারা সমাজের কার্য্যের অনেক সাহায্য হইবে ; দ্বিতীয় বহুসংখ্যক বালকের মনে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের ভাব দেওয়া যাইবে।" তখন আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবনাথ, এই তিনজন ছিলেন যুবক-বাংলার নেতা। সুরেন্দ্রনাথও তাঁহাদের এই প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিলেন এবং ১৮৭৯ সনের জানুয়ারি মাসে বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে পডাইতে লাগিলেন। শিবনাথ স্বয়ং সেক্রেটারীর কার্য্য করিতেন।

সিটি স্কুল স্থাপনের কয়েক মাস পরেই শিবনাথ আনন্দমোহনের সহিত পরামর্শক্রমে তাঁহার বহু দিনের সঙ্কল্পিত 'ছাত্র-সমাজ' নামে একটি সমিতি স্থাপন করিলেন (২৭ এপ্রিল ১৮৭৯)। "স্কুল কলেজে ধর্ম্মবিহীন শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর" করিবার উদ্দেশ্যেই ছাত্র-সমাজের প্রতিষ্ঠা। শিবনাথ ও আনন্দমোহন এই সমিতিতে নিয়মিতভাবে ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা দিতেন।

১৮৮৪ সনে বালিকাদিগের জন্য 'নীতি বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা শিবনাথেব আর একটি সদনুষ্ঠান।

শিবনাথের কর্ম্মবহুল জীবনের একটি প্রধান কৃতি 'সাধনাশ্রম' প্রতিষ্ঠা (ফেব্রুয়ারি ১৮৯২)। তাঁহার আত্মচরিতে প্রকাশ, "যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, ব্রাহ্মসমাজ ও জনসমাজের সেবার জন্য আত্মসমর্পণ করিবেন এবং বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও সেবার ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিবেন, এরূপ একটি ঘননিবিষ্ট সাধকমণ্ডলী গঠন করার বড় প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের শক্তি জাগিবে না। বিশ্বাসী ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন মানুষই ধর্ম্মসমাজের বল।" বিলাতে নানা ধর্ম্মমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়াই সম্ভবতঃ এরূপ আশ্রম-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি ডায়েরিতে লিখিয়াছিলেন,—

"S. S. Rohilla . 10th December, 1888. ব্রাহ্মসমাজের এক দল সেবক প্রস্তুত করা যায় কি না, যাঁহারা communism অনুসারে থাকিবেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যিনি যাহা দিবেন ও শ্রমের

দ্বারা অর্জিত হইবে, তদ্দ্বারা তাঁহাদের ভরণপোষণ হইবে। একান্ত প্রার্থনার সহিত তাঁহার চরণে হত্যা দিতে হইবে।"

জীবন-সায়াহ্নে

নানা কাজে লিপ্ত হইয়া দিনরাত গুরুতর পরিশ্রমে রত থাকায় শিবনাথের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তদুপরি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্যর্থতার লক্ষণ দেখা দেওয়ায় তাঁহার নিদারুণ আশাভঙ্গ হইল। ১৯১৬, ৪ঠা জানুয়ারি তিনি ডায়েরিতে লিখিতেছেন :—

"আমার বিষাদের যথেষ্ট কারণ আছে। দারুণ সংগ্রামে জীবন গিয়াছে, মাতাপিতার সহিত সংগ্রাম, আত্মীয়স্বজনের সহিত সংগ্রাম, দুই স্ত্রী লইয়া গৃহপরিবারে সংগ্রাম, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুগণের সহিত সংগ্রাম, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুগণের সহিত সমাজের কাজ লইয়া সংগ্রম, এইরূপ নানা সংগ্রামে আমার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। শৈশব হইতে শারীরিক ধাতুসকল দুর্ব্বল ছিল, তাহা সত্ত্বেও এত প্রকার সংগ্রামের মধ্যে যে বাঁচিয়া আছি এই ভগবানের কৃপা।"

এমনই ভাবে রোগ শোক মনস্তাপ ইত্যাদির ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে শিবনাথের অন্তিম সময় ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। ১৯১৯ সনের ৩০এ সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে "ওঁ ব্রহ্ম" ধ্বনির সহিত তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

গ্রন্থাবলী

শিবনাথ স্বাভাবিক কবি-প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছিলেন। শৈশব কাল হইতেই তিনি কবিতার অনুরাগী ছিলেন। কলিকাতায় আসিবার

পর কবিতা-পাঠে তাঁহার আসক্তি ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল ; ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা কোথাও পাইলেই গোগ্রাসে গিলিতেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি মাতুলের 'সোমপ্রকাশ' ও প্যারীচরণ সরকার-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' মাঝে মাঝে কবিতা লিখিতেন। ১৮৬৮ সনের শেষে, কুড়ি বৎসর বয়সকালে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ—'নির্ব্বাসিতের বিলাপ' প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বড় অল্প নহে। আধুনিক পাঠকবর্গকে বাংলা-সাহিত্যে শিবনাথের দান সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্য তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা সঙ্কলন করিয়া দিলাম। তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির বিবরণ হইতে গৃহীত।

১। **নির্ব্বাসিতের বিলাপ** (খণ্ডকাব্য)। ইং ১৮৬৮ (১৪ ডিসেম্বর)। পৃ. ১০৮।

"এত দিনে সাহস করিয়া সাধারণের সমক্ষে আত্মপরিচয় দিতে অগ্রসর হইলাম। 'নির্ব্বাসিতের বিলাপের' জন্মের কথা কিছু বলা উচিত। প্রায় দুই বৎসর গত হইল একজন ভদ্র-সন্তান কোন গুরুতর অপরাধে চিরবজীবনের মত নির্ব্বাসিত হন। তাঁহার যাইবার দিন তাঁহার ভাবী অবস্থার কথা মনে হইয়া বড় কষ্ট হইতে লাগিল ; সেই উপলক্ষে গুটিকত পংক্তি লিখিয়া সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিলাম। আর অধিক লিখিবার ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু সোমপ্রকাশ-সম্পাদক মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া অবশিষ্ট অংশ চাহিলেন। তাঁহার মত লোকের সন্তোষ দর্শনে উৎসাহিত হইয়া ক্রমাগত লিখিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিক হইতে অনেকেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে আরও উৎসাহিত হইয়া

পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিলাম।...কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ। সংবৎ ১৯২৫, ৩০এ অগ্রহায়ণ।"

২। **পুষ্পমালা** (পদ্য-সংগ্রহ)। ১২৮২ সাল (১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫)। পৃ. ১০০।

উমেশচন্দ্র দত্ত-লিখিত ভূমিকা সহ। ১২৮৭ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে "অনেক কবিতা পরিত্যক্ত এবং তৎস্থানে অনেক নূতন কবিতা সন্নিবেশিত" হইয়াছে।

৩। **এই কি ব্রাহ্ম বিবাহ**। বৈশাখ ১২৮৫ (১০ মে ১৮৭৮)। পৃ. ২৮।

কুচবিহার-বিবাহের প্রতিবাদ।

৪। **মেজ বৌ** (উপন্যাস)। (২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮০)। পৃ. ৯৫।

"ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যগণের নিকট একখানি পারিবারিক উপন্যাস দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞাটা এখানে [বাঁকিপুরে] পূরণ করিলাম। এই ৮।১০ দিনের মধ্যে 'মেজ বৌ' নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়া কলিকাতাতে প্রেরণ করিলাম।"—'আত্মচরিত'

৫। **গৃহধর্ম্ম**। (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১)। পৃ. ৪৫।

৬। **জাতিভেদ** (বক্তৃতা)। ১২৯১ সাল (১৪ ডিসেম্বর ১৮৮৪)। পৃ. ৬৭।

৭। **রামমোহন রায়**। (৬ নবেম্বর ১৮৮৬)। পৃ. ৯৩।

৮। **হিমাদ্রি-কুসুম** (কাব্য)। ইং ১৮৮৭ (২২ জানুয়ারি)। পৃ. ১৭০।

৯। **বক্তৃতা-স্তবক**। ইং ১৮৮৮ (১৯ জানুয়ারি)। পৃ. ১২৬।

"কলিকতার ছাত্রসমাজে ও অন্যান্য স্থানে মধ্যে মধ্যে নানা বিষয়ে যে সকল বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে, তাহার কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া একত্র মুদ্রিত করা হইল।"

স্থচী—মানবচরিত্র ও প্রতিজ্ঞার বল, সমাজ-রক্ষা ও সামাজিক উন্নতি, ধর্ম্ম কি ?, ঈশ্বর অচেতন শক্তি কি সচেতন পুরুষ, অবরোধ প্রথা।

ইহার প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ—এই তিনটি প্রবন্ধ স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল।

১০। **পুষ্পাঞ্জলি** (কাব্য)। ইং ১৮৮৮ (১৯ জানুয়ারি)। পৃ. ৮৪।

"এই সকল পদ্যের অনেকগুলি বহু বৎসর পূর্ব্বে নানাবিধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।" ইহার অন্তর্ভুক্ত সেণ্ট অগস্তিনের দেশত্যাগ, ভাইবোন্ ও প্রেমের মিলন কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য।

১১। **ছায়াময়ী-পরিণয়** (রূপক কাব্য)। ইং ১৮৮৯ (২৯ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১৫৯।

১২। **যুগান্তর** (সামাজিক উপন্যাস)। ১৩০১ সাল (৬ জানুয়ারি ১৮৯৫)। পৃ. ৬৪।

রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্যে' ইহার সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

১৩। **নয়নতারা** (পারিবারিক উপন্যাস)। ? (২০ এপ্রিল ১৮৯৯)। পৃ. ২৬২।

১৪। **মাঘোৎসবের উপদেশ**। ১৩০৮ সাল (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০২)। পৃ. ১৩৭।

১৮০০-১৮০৬ ও ১৮০৮-১৮২২ শকের (ইং ১৮৭৯-১৯০১) ১১ই মাঘে অনুষ্ঠিত মাঘোৎসবের উপদেশ-সমষ্টি।

১৫। **মাঘোৎসবের বক্তৃতা**। ১৩০৯ সাল (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩)। পৃ. ১৬০।

১৮০৫-৬ ও ১৮১৫-২৩ শকের মাঘোৎসবে প্রদত্ত বক্তৃতা-সমষ্টি।

১৬। **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ**। ইং ১৯০৪ (২৫ জানুয়ারি)। পৃ. ৩৫১।

ইহা একখানি বহুল-প্রচারিত গ্রন্থ। ইহা প্রকাশের পর যে-সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি ভাবী সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত।

১৭। **প্রবন্ধাবলি**, ১ম খণ্ড। ১৩১১ সাল (২৪ অক্টোবর ১৯০৪)। পৃ. ১৭২।

"রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ব্যতীত এই গ্রন্থের সমুদয় প্রবন্ধ বিগত ছয় বৎসরের মধ্যে 'প্রদীপ', 'ভারতী' ও 'প্রবাসী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাতে অগ্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।"

সূচী—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নৈসর্গিক ধর্ম্ম, ভারতে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সংমিশ্রণ, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, নবযুগের নব প্রশ্ন, ধর্ম্মের রূপ ও স্বরূপ, সামাজিক শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত ১ম ও ২য় প্রস্তাব, জাতীয় উদ্দীপনা ১ম ও ২য় প্রস্তাব, ঋষিত্ব ও কবিত্ব, কাব্য ও কবিত্ব, বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের সংঘর্ষ ১ম, ২য় ও ৩য় প্রস্তাব।

১৮। **উপকথা** (অনুবাদিত)। ? (১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮)। পৃ. ৫৬। "নীতি বিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।"

১৯। **মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।** ১৩১৭ সাল (২০ অক্টোবর ১৯১০) পৃ. ৪৬।

"১৯১০ সালের মাঘোৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত দুইটি বক্তৃতার সারাংশ।"

২০। **ধর্ম্মজীবন।**

১৮৯৫ সন হইতে কয়েক বৎসর শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ 'ধর্ম্ম-জীবন' নামে ছয়টি খণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার ষষ্ঠ খণ্ডের প্রকাশকাল ইং ১৯০১। এগুলির দ্বিতীয় সংস্করণ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়; প্রকাশকাল এইরূপ—

১ম খণ্ড···১৩২০ সাল (২০ জানুয়ারি ১৯১৪)। পৃ. ৩৮০।

২য় খণ্ড···১৩২১ সাল (৫ এপ্রিল ১৯১৫)। পৃ. ৩৫৫।

৩য় খণ্ড···১৩২২ সাল (২৩ জানুয়ারি ১৯১৬)। পৃ. ২৯৯।

২১। **বিধবার ছেলে** (উপন্যাস)। ১৩২২ সাল (২২ জানুয়ারি ১৯১৬)। পৃ. ২৯৭।

"প্রায় পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে 'বিধবার ছেলে' নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। তৎপরে শরীর রুগ্ন ভগ্ন হওয়াতে তাহা ফেলিয়া রাখি। কবে চলিয়া যাই, এই ভাবিয়া পরিবর্ত্তিত আকারে তাহা প্রকাশ করা গেল।"—ভূমিকা।

'বিধবার ছেলে' তাঁহার শেষ উপন্যাস। ইহা নিঃশেষিত হইলে, প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য মূল পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে পিতার উপন্যাস-

খানির দ্বিতীয় সংস্করণ 'উমাকান্ত' নামে ১৩২৯ সালে (ইং ১৯২২) প্রকাশ করেন ; ইহার ১৯শ পরিচ্ছেদটি তাঁহার নিজের রচিত।

২২। **আত্মচরিত**। ১৩২৫ সাল (৮ অক্টোবর ১৯১৮)। পৃ. ৪৪১।

১৯০৮ সনের ৫ই জুন পর্য্যন্ত জীবনের ঘটনাবলীর বিবৃতি। ইহার প্রথম সংস্করণটি প্রবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ (১৯২০, ১৯৪০) পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সম্পাদকত্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রচারিত হয়।

ইহাকে শিবনাথের রচনাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা মনে করা সঙ্গত হইবে না। তিনি রবিবাসরীয় ছাত্র-সমাজ, মাঘোৎসব প্রভৃতিতে যে-সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত দু-একখানি পাঠ্য পুস্তকও আছে ; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'রঘুবংশ' (মূল, টীকা এবং ইংরেজী-বাংলা অনুবাদ সহ, ইং ১৮৮৮) ও যুবকদিগের উপযোগী কয়েকটি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সারগর্ভ উপদেশমালা সম্বলিত 'সাহিত্য-রত্নাবলী'র (ইং ১৯১৭) উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইংরেজীতে রচিত শিবনাথের কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা আছে ; ইহার মধ্যে *History of the Brahmo Samaj*, Vols. I & II (1911-12) ও *Men I Have Seen* (1919) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাময়িক-পত্র সম্পাদন

গ্রন্থকার হিসাবে শিবনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সাময়িক-পত্র সম্পাদনেও তাঁহার কৃতিত্ব বড় কম নয়। আমরা তাঁহার সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলির উল্লেখ করিতেছি :—

'মদ না গরল' ঃ

শিবনাথ 'আত্মচরিতে' লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—"কেশববাবু ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া…আসিয়াই নানা নূতন কাজের প্রস্তাব করিলেন। Indian Reform Association নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া তাহার অধীনে Temperance, Education, Cheap Literature, Technical Education প্রভৃতি অনেক বিভাগ স্থাপন করিলেন। আমি সকল কাজেই তাঁহার অনুসরণ করিতাম। আমি সুরাপান-বিভাগের সভ্যরূপে 'মদ না গরল' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিলাম। তাহাতে সুরাপানের অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিয়া গদ্যপদ্যময় প্রবন্ধসকল বাহির হইত। সে-সমুদয়ের অধিকাংশ আমি লিখিতাম। তদ্ভিন্ন 'সুলভ সমাচার' নামক এক পয়সা মূল্যের যে সংবাদপত্র বাহির হইয়াছিল [১৫ নবেম্বর ১৮৭০] তাহাতেও লিখিতাম।"

"'মদ না গরল' বিনামূল্যে বিতরিত হইত। ইহা ১২৭৮ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭১) মাসে প্রকাশিত হয়।"

'সোমপ্রকাশ' ঃ

এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বিরাট্ কীর্ত্তি। দ্বারকানাথ সম্পর্কে শিবনাথের মাতুল। তিনি ১৮৭৩ সনের জুলাই মাসে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ভাগিনেয়ের হস্তে পত্রিকা-সম্পাদনের ভার ন্যস্ত করিয়া স্বাস্থ্যান্বেষণে কাশী গমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে (ইং ১৮৭৩-৭৪) শিবনাথ যত্নসহকারে 'সোমপ্রকাশ' পরিচালন করিয়াছিলেন। তাঁহার 'আত্মচরিতে' প্রকাশ—

"আমি মাতুলের সাহায্যের জন্য হরিনাভিতে গেলাম। গিয়া মাতুলের 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদক, স্কুলের সম্পাদক ও হেডমাষ্টার, তাঁহার বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক, তাঁহার পরিবার পরিজনের রক্ষক ও অভিভাবক হইয়া বসিলাম। বড় মামা আমাকে বসাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীতে গেলেন।·· আমি যখন হরিনাভিতে বাস করি তখন সে স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রথম আবির্ভাব ; সেখানে যাইবার কিছু দিন পরেই আমাকে ম্যালেরিয়া জ্বরে ধরে···দেড় বৎসরের মধ্যেই আমার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। আমার এই অবস্থা দেখিয়া আমার শুভানুধ্যায়ী তৎকালীন স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় আমাকে ভবানীপুরেব নবপ্রতিষ্ঠিত সাউথ সুবার্ব্বন স্কুলের হেডমাষ্টার করিয়া আনিলেন। যত দূর স্মরণ হয়, আমি ১৮৭৪ সালের শেষভাগে ঐ স্কুলে আসিলাম। আমি শনিবার হরিনাভিতে যাইতাম, রবিবার সোমপ্রকাশ সম্পাদন করিতাম, সোমবারে ভবানীপুরে ফিরিয়া আসিতাম। এইরূপে কিছু দিন গেল। অবশেষে আমি আমার কাজের সুবিধার জন্য মাতুলের কাগজ ও ছাপাখানা ভবানীপুরে তুলিয়া আনিলাম। সোমপ্রকাশে এক ফর্মা ইংরাজী সংযোগ করিয়া ইহার উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রেসেরও অনেক উন্নতি করিলাম।"*

---

* গত সোমবাব [২৮-২-১৮৭৬] অবধি সোমপ্রকাশ ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। স্থান পরিবর্ত্তের সহিত ইহার কলেবর এক ফরমা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ইহা ইংরাজী ভাষায় অলঙ্কৃত হইয়াছে।"—'ভারত-সংস্কারক', ৩ মার্চ ১৮৭৬ শুক্রবার।

সমদর্শী' or *The Liberal* :

ইহা ধর্ম্ম সমাজ ও নীতি বিষয়ক একখানি দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) মাসিক পত্রিকা ; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—অগ্রহায়ণ ১২৮১ (নবেম্বর ১৮৭৪)। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"The journal will be conducted in English and Bengali, that it may be acceptable to the theists of other presidencies. In short the projectors aspire to make it, what it should be, *an impartial Exponent of Theistic Opinion.*"

রাজনারায়ণ বসু, শিবচন্দ্র দেব, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখব বসু প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকবর্গের এবং সম্পাদকের গদ্য-পদ্য বহু রচনা 'সমদর্শী'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল।

'সমালোচক' :

শিবনাথ 'আত্মচরিতে' লিখিয়াছেন—"কুচবিহার-বিবাহেব ঝটিকা উপস্থিত হইল, এবং উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল ভাঙ্গিয়া দুখান হইয়া গেল। ১৮৭৮ সালের জানুয়ারির প্রারম্ভে কুচবিহারের ম্যাজিষ্ট্রেট, আমার প্রাচীন পরিচিত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়, নাবালক রাজার বিবাহের বিষয়ে সমুদয় কথা স্থির করিবার জন্য ভারপ্রাপ্ত হইয়া কলিকাতাতে আসিলেন।...তাঁহার মুখে শুনিলাম যে কেশব বাবু কন্যার বিবাহোপযুক্ত বয়সের পূর্ব্বে তাহাকে বিবাহ দিতে রাজি হইয়াছেন ; কি কি নিয়মে বিবাহ হইবে, সেই সকল বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিতেছে।...ক্রমে কি কি বিষয় স্থির হইল তাহাও

প্রকারান্তরে আমাদের কর্ণগোচর হইল। জানিলাম যে কন্যার ও বরের বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই বিবাহ হইবে, তবে বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিবেন; কেশব বাবু জাতিচ্যুত বলিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিবেন না; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কন্যা সম্প্রদান করিবেন। রাজপরিবারের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইবে, কেবল তাহাতে দেবদেবীর নামের পরিবর্ত্তে ঈশ্বরের নাম লিখিত হইবে, রাজপুরোহিত বিবাহ দিবেন; ইত্যাদি।...এই সংবাদে কলিকাতার ব্রাহ্মদলের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল।...যে কেশব বাবু মহা আন্দোলনের পর ১৮৭২ সালের ৩ আইনে বরকন্যার বিবাহের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তিনিই তাহা ভাঙ্গিতে যাইতেছেন, ইহা কেমন কথা?...আমরা আন্দোলন চালাইবার জন্য 'সমালোচক' নামে এক সাপ্তাহিক কাগজ ও তৎপরেই *Brahmo Public Opinion* নামক ইংরাজি কাগজ বাহির করিলাম।...আমি বাংলা কাগজের সম্পাদক হইলাম। তাহাতে চারি দিকের ব্রাহ্মগণের মতামত প্রকাশিত হইতে লাগিল। কেশব বাবু ব্রাহ্মগণের প্রতিবাদের প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া কন্যা লইয়া কুচবিহারে বিবাহ দিতে গেলেন।"

৬ই মার্চ কুচবিহার-বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইহার প্রায় এক মাস পূর্ব্বে ১৭ই ফেব্রুয়ারি 'সমালোচকে'র আবির্ভাব। এই সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া 'এডুকেশন গেজেট' (১ মার্চ ১৮৭৮) লেখেন—

"সমালোচক—সাপ্তাহিক পত্রিকা, মূল্য এক পয়সা। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার সহিত কোচবিহার রাজপুত্রের বিবাহ উপলক্ষ করিয়া এই পত্রিকাখানির সৃষ্টি হইয়াছে। সম্পাদক

ভূমিকায় লিখিয়াছেন—'পত্রখানির দুটী উদ্দেশ্য আছে, একটী মুখ্য ও অপবটী গৌণ। মুখ্য উদ্দেশ্যটী কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ লইয়া আন্দোলন কবা, গৌণ উদ্দেশ্য সেই সঙ্গে সাধারণের উপযোগী প্রস্তাব এবং সংবাদাদি দিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করা।' ”

শিবনাথ অল্প দিনই 'সমালোচক' সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি 'আত্মচরিতে' লিখিয়াছেন—"আমি বড নরম লোক বলিয়া বন্ধুরা আমার হাত হইতে 'সমালোচক' তুলিয়া লইয়া দ্বাবিবাবুর হাতে দিলেন। তিনি একেবারে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিলেন।"

'তত্ত্ব-কৌমুদী' ঃ

কেশবচন্দ্রেব দল ভাঙ্গিয়া যে নূতন ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় তাহাব মুখপত্রস্বরূপ এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। শিবনাথ 'আত্মচরিতে' লিখিয়াছেন—"এই তত্ত্ব-কৌমুদীর প্রকাশ ও পবিচালনের ভার আমাব উপরেই পডিয়াছিল। আমবা কয়েক মাস পূর্ব্বে 'সমালোচক' নামে যে কাগজ বাহিব করিয়াছিলাম, এবং যাহা বন্ধুগণ আমাব হাত হইতে কাডিয়া লইয়া বন্ধুবব দ্বাবকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়াছিলেন, তাহাকে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজের মুখপত্র করা উচিত বোধ হইল না। সে নামটা ভাল লাগিল না এবং যে ভাবে তাহা চলিতেছে, তাহারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ হইল। তাই তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব একজন ব্রাহ্ম-বন্ধুকে দিয়া আমরা নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের নামে এক নূতন কাগজ বাহির কবিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নূতন কাগজের নাম কি হয়, কি হয়, ভাবিতে ভাবিতে আমাব মনে হইল—মহাত্মা রাজা রামমোহন বায় এক কাগজ বাহির করিয়াছিলেন, তাহার নাম ছিল 'কৌমুদী'।

আদিসমাজের কাগজের নাম 'তত্ত্ববোধিনী' ; ভারতবর্ষীয় সমাজের কাগজের নাম 'ধর্ম্মতত্ত্ব'। শেষোক্ত দুই কাগজ হইতে "তত্ত্ব" এবং রাজা রামমোহন রায়ের "কৌমুদী" লইয়া আমাদের কাগজের নাম হউক 'তত্ত্ব-কৌমুদী'। আমার মনের ভাব ছিল যে রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে যে আধ্যাত্মিক ও সার্ব্বজনীন মহাধর্ম্মের ভাব প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, 'তত্ত্ব-কৌমুদী' তাহাই প্রচার করিবে। অনেক দিন এরূপ হইত 'তত্ত্ব-কৌমুদী'র প্রত্যেক পংক্তি আমাকে লিখিতে হইত। সাহায্য করিবার কাহাকেও পাইতাম না।"

'তত্ত্ব-কৌমুদী' প্রতি বাংলা মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ (২৯ মে ১৮৭৮)।

'সখা' ঃ

১৮৮৩ সনের জানুয়ারি মাসে প্রমদাচরণ সেন 'সখা' নামে বালক-বালিকাদিগের জন্য একখানি উচ্চাঙ্গের সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। তিনি হেয়ার স্কুলে শিবনাথের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। আড়াই বৎসর 'সখা' পরিচালনের পর ১৮৮৫, ২১এ জুন, ২৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। পরবর্ত্তী জুলাই মাস ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা হইতে শিবনাথ পত্রিকাখানির সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি ৪র্থ বর্ষের (ইং ১৮৮৬) 'সখা'ও সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহার এবং 'সখা ও সাথী'র পৃষ্ঠায় তাঁহার অনেক শিশুপাঠ্য রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল।

'মুকুল' ঃ

১৩০২ সালেব আষাঢ মাস হইতে শিবনাথ স্বয়ং 'মুকুল' নামে বালক-বালিকাদিগের উপযোগী একখানি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহাব প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত "প্রস্তাবনায়"য় পত্র-প্রচাবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন -

" আমবা মানব-মুকুলদিগেব হস্তে জ্ঞানেব মুকুল দিব, যাহা তাহাদেব জীবনে ফুটিয়া ফুল ফলে পরিণত হইবে। যাহাতে মুকুল হাতে লইয়াই বালক-বালিকাব প্রাণ সৌবভে আমোদিত হয়, যাহাতে তাহাবা প্রাণ খুলিয়া হাসে, দুই হাত তুলিযা নৃত্য করে, "বাঃ কি মজার কথা শিখ্‌লাম ভাই।" বলিযা আনন্দ কবে, সেদিকে আমাদেব বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে এই জন্য গল্প, হেঁয়ালি, কবিতা, চিত্র যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হইবে।"

'মুকুলে'ব দ্বিতীয় বর্ষ আবম্ভ হয় ১৩০৩ সালেব বৈশাখ মাসে। ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের শিশুপত্রিকা ছিল। রমেশচন্দ্র দ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল, অক্ষয়কুমাব মৈত্রেয়, যোগেশচন্দ্র বায, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু, দীনেন্দ্রকুমার বায়, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য-প্রমুখ মনীষি-বর্গেব বচনা 'মুকুলে'র গৌরব বৰ্দ্ধন করিয়াছিল। শিবনাথ কয়েক বৎসর সযত্নে 'মুকুল' সম্পাদন কবিয়াছিলেন। ইহার পৃষ্ঠায় তাঁহাব বহু শিশুপাঠ্য বচনাব সন্ধান মিলিবে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বার্ষিকীতে মুদ্রিত তাঁহাব শিশুপাঠ্য রচনাগুলির একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে বাংলা-সাহিত্যেব এই বিভাগটি বিলক্ষণ পবিপুষ্টি লাভ করিবে।

শিবনাথ ও বাংলা-সাহিত্য

পৃথিবীতে ধর্ম্মের পূজামণ্ডপে অনেক সাহিত্যিক আত্মবলিদান দিয়াছেন, বহু সত্যকার প্রতিভাবান সাহিত্যিক ধর্ম্মপ্রচারের উৎসাহে সাহিত্য-জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। বাংলা দেশেও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও আচার্য্য কেশবচন্দ্র দুইটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীর ক্ষেত্রে এই আত্মবলিদান চরমে উঠিয়াছে। ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত বঙ্গভারতীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলে যে তিনি কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে আপন প্রতিভার নিদর্শন অক্ষয় রাখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহার প্রমাণ আমরা তাঁহার কাব্যগ্রন্থ 'পুষ্পমালা' এবং উপন্যাস 'মেজ বৌ'-'যুগান্তরে'ই পাই। সাহিত্যিকের হাতে ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধও যে কতখানি সরস ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে, তাঁহার 'ধর্ম্মজীবনে' তাহারও প্রমাণ আছে। মোটের উপর, বাংলা-সাহিত্যের দিক্ দিয়া আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম দিক্‌পাল মাত্র ছিলেন না, বাংলা-সাহিত্যেরও একজন দিক্‌পাল ছিলেন। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ' ও 'আত্মচরিত' তাঁহার সেই পরিচয় আজিও বহন করিতেছে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর সকল রচনার মধ্যে তাঁহার দেশ-প্রেম ও জাতীয়তা-বোধ ওতপ্রোত হইয়া আছে। প্রাচীন ভারতের সহজ অনাড়ম্বর জীবন তাঁহার আদর্শ ছিল এবং তিনি সত্য সত্যই "ছোট ঘরে বড় মন" লইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন, পরাধীনতার গভীর বেদনা তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেন, তাঁহার অধিকাংশ কাব্যে এই বেদনার পরিচয় আছে।

কর্ম্মবহুল জীবনে শিবনাথ সাহিত্য-চর্চার যেটুকু অবসর পাইয়াছিলেন, তাহাতেই বাংলা-সাহিত্যে নিজের আসনটি কায়েম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সাহিত্য-শক্তি ও কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র 'চরিত-কথা'য় যে-কয়টি গূঢ়ার্থপূর্ণ কথা বলিয়াছেন, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি :—

ফলতঃ, তাঁর আপনার স্বরূপে শিবনাথ তত্ত্বজ্ঞানীও নহেন, ভগবদ্‌ভক্তও নহেন, চিন্তাশীল দার্শনিকও নহেন, মুমুক্ষু সাধকও নহেন, কিন্তু অসাধারণ শব্দসম্পত্তিশালী সাহিত্যিক ও সুরসিক কবি। এক সময়ে শব্দযোজনার কুশলতায় শিবনাথ বাঙ্গালী সাহিত্যকদের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কোনও কোনও দিক দিয়া বিচার করিলে, এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন কি না, সন্দেহ। প্রথমে শক্তিশালী লেখক ও সুরসিক কবিরূপেই বাঙ্গলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী সমাজে শিবনাথেব প্রভাব ও প্রতিপত্তি হয়। এমন কি, পরে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃপদ পাইয়া স্বদেশের ধর্ম্মচিন্তায় ও কর্ম্মজীবনে তিনি যা কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, আপনার স্বাভাবিকী সাহিত্যশক্তি ও কবি-প্রতিভার সেবায় একান্তভাবে আত্মোৎসর্গ করিলে, বাঙ্গলার আধুনিক সাহিত্যের ও সমাজ জীবনের ইতিহাসে তদপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্থান পইেতেন, সন্দেহ নাই। আর ব্রাহ্মসমাজেও তিনি যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহাও প্রকৃতপক্ষে তাঁর বাগ্মিতা-শক্তি ও সাহিত্য-সম্পদের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে, কোনও প্রকারের অনন্যসাধারণ সাধনশক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।"

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৭৬*

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, শরৎকুমারী চৌধুরাণী
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী

১৮৫০—১৮৯৮

যে আত্মভোলা সাহিত্যিক নিজেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রাখিয়া নানা ভাবে বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ একান্ত শ্রদ্ধাভরে 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া সেই কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর নাম মাত্র আমরা স্মরণে রাখিয়াছি। তাঁহার জীবনীর সামান্য উপকরণ ঘাঁটিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি, তিনি সত্যই সাহিত্যগতপ্রাণ ছিলেন—যশের কাঙ্গাল ছিলেন না। ইঁহার সহধর্ম্মিণী বাংলা কথাচিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িত্রী—শরৎকুমারী চৌধুরাণী সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ অবহিত ছিলাম না। এই সাহিত্যিক দম্পতি শুধু নিজেদের দানে বাংলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন নাই, তাঁহাদের কালে রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ সাহিত্যিককে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাইয়াছেন। কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কিছু কিছু রচনা রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনার সহিত ওতপ্রোত হইয়া আছে বলিয়া রবীন্দ্রভক্তদের গোচরে আছে। তাঁহার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির খবর আজ কেহ বড়-একটা রাখেন না।

বংশ-পরিচয় : শিক্ষা

অক্ষয়চন্দ্রের জন্ম ১৮৫০ সনে, আন্দুলের বিখ্যাত চৌধুরী-বংশে। তাঁহার পিতার নাম—মিহিরচন্দ্র চৌধুরী, সে-যুগের একজন এটর্নী।

অক্ষয়চন্দ্র পিতার কনিষ্ঠ সন্তান; অতি অল্প বয়সেই তিনি পিতৃহারা হন।

অক্ষয়চন্দ্র বিলক্ষণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি কোন্ সালে কোন্ পরীক্ষায় পাস করিয়াছিলেন, তাহার হিসাব দিতেছি: —

ইং ১৮৬২	···	এন্ট্রান্স	···	কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল
১৮৬৪	···	এফ. এ. দ্বিতীয় বিভাগ	···	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৭০	···	বি. এ.	···	ঐ
	···	এম এ.	···	ঐ
১৮৭৫	···	বি. এল. দ্বিতীয় বিভাগ	···	ঐ
১৮৭৮, ১৫ এপ্রিল	···	এটর্নী		

বিবাহ

চোরবাগানের বসু-বংশের শশিভূষণ বসু অবস্থাবিপর্য্যয়ে ভাগ্য-পরীক্ষার্থ ১৮৬৩ সনে প্রবাস-জীবন বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মস্থল ছিল লাহোর। কয়েক বৎসর পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সদ্য এম. এ. পরীক্ষোত্তীর্ণ অক্ষয়চন্দ্রের সহিত স্বীয় কন্যা শরৎ-কুমারীর বিবাহ দেন। এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়—২৯এ ফাল্গুন ১২৭৭ (১২ মার্চ ১৮৭১) তারিখে।* অক্ষয়চন্দ্র তখন তরুণ কবি ও জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

* শরৎকুমারীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু আমাকে জানাইয়াছেন—"আছে কেবল বাবার ডায়ারী। ১৮৭১ সালে দিদির বিয়ে সম্বন্ধে বাবার যে লেখা আছে তাতে দেখা যায় অক্ষয়চন্দ্রের তখন ২১ বৎসর বয়স, এবং এম.এ. পাস।"

ঠাকুর-পরিবারের সংস্পর্শে

অক্ষয়চন্দ্র অল্প বয়স হইতেই (আনুমানিক ১৮৬৫ সনে) জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের সংস্পর্শে আসেন। এই পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে প্রকাশ :—

"জোড়াসাঁকো বাড়ীতে ছেলেদের জন্য একটি ধর্ম্মপাঠশালাও খোলা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পড়াইতেন। উপনিষদের শ্লোকগুলি হ্রস্বদীর্ঘ রক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ উচ্চারণসহকারে সমস্বরে পাঠ করানো হইত। যেখানে এক সময় গুরু মহাশয়ের পাঠশালা বসিত, দুর্গাপূজা হইত, সেই পূজার দালানই পরে বেদমন্ত্র পাঠে মুখরিত হইয়া উঠিল। এই পাঠশালায় কতকগুলি বাহিরের ছেলেও পড়িতে আসিত। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী একজন। তখন হইতেই অক্ষয়চন্দ্রের সহিত জ্যোতিবাবুর বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা গাঢ়তর হইয়া উঠে, এবং তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত এ বন্ধুত্ব অক্ষয় ও অক্ষুণ্ণ ছিল।

"ছেলেবেলায় অক্ষয়চন্দ্রকে জ্যোতিবাবুদের বাড়ীর সকলেই 'Poet' 'Poet' বলিয়া ডাকিতেন। তখন হইতেই তিনি ছোট ছোট কবিতা লিখিতেন এবং জ্যোতিবাবুকে শুনাইতেন। একটু ফাঁক পাইলেই তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে জ্যোতিবাবুও আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন।"—'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি,' পৃ. ৫৩।

১৮৬৮, ১১ই এপ্রিল চৈত্র-সংক্রান্তির দিন বেলগাছিয়ায় আশুতোষ দেবের উদ্যানে চৈত্রমেলার (পরে, হিন্দুমেলা) দ্বিতীয় অধিবেশনে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "উদ্বোধন" নামে এবং অক্ষয়চন্দ্র "ভারত" নামে কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। কবিতা দুইটি মেলার কার্য্যবিবরণে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাই বোধ হয় অক্ষয়চন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা। চৈত্র বা হিন্দুমেলার উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র ছিলেন অক্ষয়চন্দ্রের সহোদর ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্রের শ্যালক।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র—উভয় বন্ধুতে মিলিয়া অবাধে সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন। অনেক সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বেহালা বাজাইতেন, অক্ষয়চন্দ্র তবলায় সঙ্গত করিতেন। কিছু দিন পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের সহিত অবাধে মিশিবার অধিকার লাভ করেন।

১৮৭৫ সনের নবেম্বর মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকখানির জন্য "জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ" গানটি রচনা করিয়া দিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "সরোজিনী-প্রকাশের পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশন্ দিয়া আমাদের সম-শ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চ্চাতে আমরা হইলাম তিন জন—অক্ষয় (চৌধুরী), রবি ও আমি। পরে জানকী বিলাত যাইবার সময়, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসায়, সাহিত্যচর্চ্চায় আমরা তাঁহাকেও আমাদের আর একজন যোগ্য সঙ্গীরূপে পাইলাম।"

'ভারতী'র সম্পাদকীয় চক্রে

বিবাহের পর অক্ষয়চন্দ্রের পত্নী শরৎকুমারী পিতার সহিত আবার লাহোর চলিয়া গিয়াছিলেন। বছর-পাঁচেক পরে তিনি কলিকাতায়

স্বামীর কাছে আসেন; অক্ষয়চন্দ্র তখন সিমলা-অঞ্চলে একটি বাটিতে অবস্থান করেন। এই সময়ে 'ভারতী' প্রকাশের জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। ১২৮৪ সালের শ্রাবণ (১৮৭৭, জুলাই) মাসে 'ভারতী'র উদয় হয়। ইহার ভিত্তিস্থাপনার মূলে ছিলেন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র। অক্ষয়চন্দ্রের পত্নী শরৎকুমারীও 'ভারতী'র সম্পাদক-মণ্ডলীতে একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। "ভারতীর ভিটা" প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন :—

"আমি পঞ্জাব হইতে আসিয়া শুনিলাম যে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন হইতেছে। একটি হল্‌দে রঙের বাক্স হইল 'ভারতী'র ভাণ্ডার।…সে সময় প্রতি রবিবারে জ্যোতিবাবু ও রবীন্দ্রনাথ ভারতীর ভাণ্ডার লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া 'ভারতী' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও পরে 'তাঁহাকে' [অক্ষয়চন্দ্রকে] লইয়া ৺বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে যাইতেন এবং সেখান হইতে জোড়াসাঁকো ফিরিয়া যাইতেন। কোন কোন দিন বৈকালে আমরা ৺জানকীবাবুর রামবাগানস্থ বাড়ীতে যাইতাম—সেখানে ন-বৌঠাকুরাণী, নতুন বৌ [জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী], জ্যোতিবাবু, রবিবাবু প্রভৃতিও আসিতেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী তখন শেক্সপিয়ার পাঠ করিতেন।…সকলে মিলিত হইলে ভারতীর জন্য রচিত নূতন প্রবন্ধাদি পাঠ, আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের গান হইত, পরে আহারাদি সমাপনান্তে বাড়ী ফিরিতে রাত্রি ১০।১১টা বাজিয়া যাইত।…

"পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হইলেন ভারতীর সম্পাদক। প্রতি মাসেই সম্পাদক মহাশয়ের, জ্যোতিবাবু, রবিবাবু ও 'তাঁহার' রচনা কিছু না কিছু প্রকাশিত হইতই।…ভারতীর

খোরাকের অভাব কখনও হইত না; বাহিরের প্রবন্ধাদি বড় একটা আবশ্যক হইত না। এই সময় রবীন্দ্রনাথ বিলাতে, অসুস্থতাবশতঃ শ্রীযুক্ত জ্যোতিবাবু সস্ত্রীক দীর্ঘকালের জন্য স্টীমারে জলযাত্রা করিলেন, তখন 'ভারতী' পরিচালনাব সম্পূর্ণ ভার 'তাঁহার' উপর ন্যস্ত হইল। অনেক সময় দেখিয়াছি প্রবন্ধের জন্য প্রেসের লোক বসিয়া রহিয়াছে, 'তিনি' তাড়াতাড়ি কিছু লিখিয়া দিলেন। বাল্যকাল হইতে 'তাঁহার' কবিতা লেখা অভ্যাস ছিল, কিন্তু প্রবন্ধ ও গদ্য রচনা বোধ হয় ভারতীর জন্যই প্রথম রচিত হইয়াছিল।" ('বিশ্বভারতী পত্রিকা', কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৫১)

অক্ষয়চন্দ্র 'ভারতী'র সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতেও তাহার অভাস পাওয়া যাইবে:

"প্রথম বর্ষের 'ভাবতী'তে রবি ও অক্ষয়েব লেখাই বেশী প্রকাশিত হইয়াছিল।...অক্ষয় তখন বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনা এবং হৃদয়-ভাবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া এক-একটি প্রবন্ধ লিখিতেন, যেমন "মান ও অভিমানে কি প্রভেদ?" ইত্যাদি। লোকের এ সব তখন খুবই ভাল লাগিত।"—'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি', পৃ. ১৫২।

অক্ষয়চন্দ্রের একটা বিশেষত্ব—তিনি মোটই নামের বা যশের কাঙ্গাল ছিলেন না, সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা কোন দিনই তাঁহাকে পাইয়া বসে নাই। এই জন্য দেখি, 'ভারতী'র ('সাধনা'রও বটে) পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাঁহার অধিকাংশ রচনাই স্বাক্ষরবিহীন, আজিকার দিনে সেগুলি চিনিয়া লওয়া সুকঠিন।

সঙ্গীত-রচনা

অক্ষয়চন্দ্র সঙ্গীত রচনাতেও সুপটু ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :

"এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর-রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুর-রচনা করিলাম, অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান-রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুর তৈরি হইবা মাত্র, সেটি আরও কয়েক বার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতাম। সেই সময় অক্ষয়চন্দ্র চক্ষু মুদিয়া বর্ম্মা সিগার টানিতে টানিতে, মনে মনে কথার চিন্তা করিতেন। পরে যখন তাঁহার নাক মুখ দিয়া অজস্রভাবে ধূমপ্রবাহ বহিত, তখনি বুঝা যাইত যে এইবার তাঁহার মস্তিষ্কে ইঞ্জিন চলিবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি অমনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চুরুটের টুকরাটি, সম্মুখে যাহা পাইতেন এমন কি পিয়ানোর উপরেই, তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া, "হয়েছে হয়েছে" বলিতে বলিতে আনন্দদীপ্ত মুখে লিখিতে সুরু করিয়া দিতেন। রবি কিন্তু বরাবর শান্তভাবেই ভাবাবেশে রচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের চাঞ্চল্য ক্বচিৎ লক্ষিত হইত। অক্ষয়ের যত শীঘ্র হইত, রবির রচনা তত শীঘ্র হইত না।···স্বর্ণকুমারীও অনেক সময় আমার রচিত সুরে গান প্রস্তুত করিতেন। সাহিত্য এবং সঙ্গীতচর্চ্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবারাত্রি সমভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিত।···

"এক দিন জ্যোতিবাবুরা কয়েক জন বন্ধুবান্ধব সহ ষ্টীমারে চন্দননগর যাইতেছিলেন। পথে অকস্মাৎ ঝড় জল তুফান আরম্ভ হইয়া সমস্ত ষ্টীমারখানিকে আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ইঁহাদের কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। জ্যোতিবাবু স্বর-রচনা করিতেছিলেন, ও অক্ষয়বাবু ক্রমান্বয় তাহার সঙ্গে একটির পর একটি গান বাঁধিয়া যাইতেছিলেন। ইঁহারা গানবাজনায় একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গিয়াছিলেন। এই একদিনকার রচিত গানগুলি হইতেই, পরে 'মানভঙ্গ নামে একখানি গীতিনাট্য প্রস্তুত হইয়াছিল। 'মানভঙ্গ' প্রথম জোড়াসাঁকো বাড়ীতে অভিনীত হয়।"

এই গীতিনাটিকাখানি 'মানভঙ্গ' নহে—'মানময়ী.' ১৮০২ শকে (=ইং ১৮৮০) প্রকাশিত হয়। ইহার অধিকাংশ গানই অক্ষয়চন্দ্রের রচিত।

অক্ষয়চন্দ্র "লৌকিক প্রেমাদি বিষয়ক" গানই বেশী রচনা করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর তেরটি গান ১৩০৪ সালে (ইং ১৮৯৭) প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত 'স্বরলিপি-গীতি-মালা'য় আছে; ইহার দুইটি আবার 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি'তেও (পৃ. ১৫৫) স্থান পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গীতিনাট্যেও অক্ষয়চন্দ্রের রচিত গান মিশিয়া আছে। তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন—"বাল্মীকি-প্রতিভায় [বা° ১২৯২] অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে।" ইহার একটি "রাঙাপদ পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা"। তাঁহার 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে "দে লো, সখি, দে, পরাইয়ে গলে" গানটিও অক্ষয়চন্দ্রের রচিত বলিয়া শুনিয়াছি।

রচনাবলী

অক্ষয়চন্দ্র মাত্র তিনখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম দুইখানিতে তাঁহার নামই ছিল না। এগুলির প্রকাশকাল সহ তালিকা :—

১। ৺দাসিনী (গীতিকাব্য)। সংবৎ ১৯৩০ (৯-২-১৮৭৪)। পৃ. ১০৮।

২। সাগর-সঙ্গমে (গাথা)। শকাব্দা ১৮০৩ (২০-৬-১৮৮১)। পৃ. ৬৬।

১২৮৫, অগ্রহায়ণ-মাঘ সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রথম প্রকাশিত। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকার ধারণ করিয়াছে।

৩। ভারত-গাথা : ২৪ মাঘ ১৩০১ (৬-২-১৮৯৫)। পৃ. ৭৮।

সূচী : (প্রথম স্তবক)—আর্য্যপর্ব্ব, আর্য্যবিপ্লব-পর্ব্ব, বৌদ্ধপর্ব্ব, পাঠানপর্ব্ব, মোগলপর্ব্ব, বঙ্গপর্ব্ব, মার্হাট্টা পর্ব্ব, শীখ-পর্ব্ব, মহীশূর-পর্ব্ব।

(দ্বিতীয় স্তবক) ইংরাজ পর্ব্ব—বিদেশী বণিক্, ইষ্ট্-ইন্দ্ কোম্পানী, কর্ণাট যুদ্ধ, ইংরাজ শাসন-পর্ব্ব, ক্লাইভ হইতে ক্যানিঙ্গ পর্য্যন্ত কল্পনা-চিত্র, সিপাহী-বিদ্রোহ, উপসংহার।*

---

* শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু জানাইয়াছেন, "অক্ষয়বাবুর আর একটি ছোট কাব্য ছাপা হয়, বন্ধুবান্ধবদের বিতরণের জন্যে। তার যে কি নাম ছিল, আর কোন্ বছরে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে ছাপে, কিছুই মনে নেই, শুধু মনে আছে তার প্রথম লাইনটুকু—'ডাগর ডাগর ফুটেছে টগর'।"

আমরা মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় অক্ষয়চন্দ্রের স্বাক্ষরিত এই কয়টি কবিতার সন্ধান পাইয়াছি :—

(ক) মাধবমালতী : 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব,' পৌষ ১২৮২।

(খ) অভিমানিনী নির্ঝরিণী : 'ভারতী,' অগ্রহায়ণ, ১২৮৯ (ইহা ১৮৮৩ সনে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাত-সঙ্গীতে' "নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ" কবিতার সহিত পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে)।

(গ) 'অশ্রুকণা'-পাঠে : 'ভারতী ও বালক,' আশ্বিন ১২৯৪।

(ঘ) প্রকৃতি-মন্দিরে : ঐ আষাঢ় ১২৯৮।

(ঙ) জন্মদিন : 'সাধনা,' পৌষ ১২৯৯।

(চ) স্তব-গান : ঐ আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০১।

(ছ) বন্ধু-বিয়োগ : 'ভারতী,' জ্যৈষ্ঠ ১৩০২।

(জ) ভারত : ঐ চৈত্র ১৩১৩ (ইহা ১৮৬৮ সনে অনুষ্ঠিত চৈত্রমেলার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক বিবরণ হইতে পুনর্মুদ্রিত)।

রচনার নিদর্শন

অক্ষয়চন্দ্রের কাব্যগ্রন্থগুলি বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। রচনার নিদর্শন-স্বরূপ এগুলির কোন কোন স্থল নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

'উদাসিনী' :

যে ভেলা নির্ভর ক'রে, দুস্তর ভব সাগরে
জননি গো দিয়েছি সাঁতার।

সহসা ভাসায়ে জলে, অতল জলধি-তলে
মগ্ন হ'ল অদৃষ্ট আমার ॥

চারি দিক শূন্যাকার, ধূ ধূ করে পারাবার,
হুতাশে হতাশ প্রাণ মন।
ভয়ঙ্কর বেশ ধরি, কল্পনা শত্রুতা করি
বিভীষিকা করে প্রদর্শন ॥

কোন দিকে নাহি স্থল, গর্জ্জয়ে গভীর জল,
আর্ত্তনাদ শূন্যেতে মিশায়।
আতঙ্কেতে অনুক্ষণ, সঘনে শীহরে মন,
ভাবনায় ছিন্ন ভিন্ন প্রায় ॥ (৩য় সর্গ : পৃ. ১৯-২০)

'সাগর-সঙ্গমে' :

নেহারে যুবক দামিনীর পানে,
দ্বাদশবর্ষীয়া রূপসী বালা,
দ্বিতীয়ার শশী, পড়িয়াছে খসি,
আধো-ফোটো রূপে সাগর আলা।

আ-নাভি মগন সাগরসলিলে,
ঝাঁপিয়ে তরঙ্গ পড়িছে গায়,
ঢল ঢল ঢল, জলধি কমল,
টলমল করে স্রোতের ঘায়!

পলকে পলকে বিজলী দলকে,
অধরে মধুর হাসির ছটা,

রূপের সাগরে অমৃতের ঢেউ,
লহরে লহরে তুলিছে ঘটা।

হেথায় হোথায়, সাগরের বায়,
কোথায় অলকা যেতেছে ছুটি,
ভাবেতে গলিয়ে, পড়িছে ঢলিয়ে
টানা টানা বাঁকা নয়ন দুটি।

সরলতা সনে মাধুরী মিশায়ে,
চারুতার তুলি ধরিয়ে করে,
সরু সরু মরি ভুরু দুটি যেন,
এঁকে কে দিয়েছে নয়ন পরে।

লহরী লীলায়, ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়
উজ্জল রূপের উজ্জল ছায়া,
কষিত তরল হিরণ-বরণ
হ'য়েছে শ্যামল সাগরকায়া! (১ম সর্গ : পৃ. ৬-৭)

হ'য়েছে প্রভাত ;—মৃদুল পবন
সাগরের সনে করিছে খেলা,
পথে ঘাটে আর নাহিক আঁধার,
আলোকিত এবে সাগর-বেলা।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা রাঙ্গা চিকন-মেঘেতে
পূরব আকাশ হ'য়েছে লাল,

গগনে উড়িছে সাগর-কপোত,
বেলায় খেলায় হরিণীপাল।

হেথায় হোথায় বাঁধা ছিল তরী,
পাল তুলে তারা ছাড়িল সব,
মাঝিরা ধরিল সুখে সারী-গান,
বাতাসে উথলে সেই সে রব। (৫ম সর্গঃ পৃ. ৫৭)

'ভারত-গাথা' ঃ

কিছু কাল আর্য্যাবর্ত্ত আছে শান্তিময়,
নদী দিয়া রক্ত-ধাবা আর নাহি বয়।
নিভে গেছে রণঅগ্নি, ঘুচে গেছে ত্রাস,
রণক্ষেত্রে করে কৃষি সুখে চাষবাস।
বাজায়ে বাঁশের বাঁশী প্রফুল্ল রাখাল
চরায় কন্দরে মাঠে গো-মহিষ-পাল।
বারো মাসে হিন্দুদের পার্ব্বণের ধুম—
দিনে নাহি কর্ম্মকাষ, রাত্রে নাহি ঘুম
দেবালয়ে শাঁখ-ঘণ্টা বাজে অনিবার,
গঙ্গা-যমুনার ঘাটে শাস্ত্রের বিচার।
অসি আছে নিজ কোষে, ঘরে ঝোলে ঢাল,
নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করে আর্য্য মহীপাল।
ক্ষত্রে ক্ষত্রে ছিল বটে সমর-উৎপাত,
তা কিন্তু ক্ষণিক মাত্র, নহে মর্ম্মাঘাত,
কত দিন থেমেছিল ঝটিকার বেগ—
সহসা পশ্চিম-কোণে দেখা দিল মেঘ!

কহ গো, ভারতলক্ষ্মি! লুকাব কোথায়
আর তো এ আর্য্যভূমে থাকা হ'ল দায়।
অনৈক্য আর্য্যেরা এবে, কে বা কয় ঝুঁকি,
গিজ্‌নীর 'মামুদ' ওই মারিতেছে উঁকি। (পৃ. ১৪)

মৃত্যু

অক্ষয়চন্দ্র দীর্ঘায়ু ছিলেন না; পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু-তারিখ—২১এ ভাদ্র ১৩০৫ (৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮)।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁহার "বাল্যবয়সের সাহিত্য-দীক্ষাদাতা" অক্ষয়চন্দ্র সম্বন্ধে যে প্রশস্তি করিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি:—

"বাল্যকালে আমার কাব্যালোচনার মস্ত একজন অনুকূল সুহৃদ্ জুটিয়াছিল। ৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ.। সে সাহিত্যে তাঁহার যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অনুরাগ ছিল। অপর পক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদকর্ত্তা, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরুঠাকুর, রামবসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের সীমা ছিল না। বাংলা কত উদ্ভট গানই তাঁহার মুখস্থ ছিল। সে-গান সুরে বেসুরে যেমন করিয়া পারেন, একেবারে মরিয়া হইয়া গাহিয়া যাইতেন। সে-সম্বন্ধে শ্রোতারা আপত্তি

করিলেও তাঁহার উৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকিত। সঙ্গে সঙ্গে তাল বাজাইবার সম্বন্ধেও অন্তরে বাহিরে তাঁহার কোনপ্রকার বাধা ছিল না। টেবিল হউক, বই হউক, বৈধ অবৈধ যাহা কিছু হাতের কাছে পাইতেন, তাহাকে অজস্র টপাটপ শব্দে ধ্বনিত করিয়া আসর গরম করিয়া তুলিতেন। আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইঁহার অসামান্য উদার ছিল। প্রাণ ভরিয়া রসগ্রহণ করিতে ইঁহার কোন বাধা ছিল না এবং মন খুলিয়া গুণগান করিবার বেলায় ইনি কার্পণ্য করিতে জানিতেন না। গান এবং খণ্ডকাব্য লিখিতেও ইঁহার ক্ষিপ্রতা অসামান্য ছিল। অথচ নিজের এই-সকল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমত্ব ছিল না। কত ছিন্নপত্রে তাঁহার কত পেন্সিলের লেখা ছড়াছড়ি যাইত, সেদিকে খেয়ালও করিতেন না। রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য্য তেমনি ঔদাসীন্য ছিল। উদাসিনী নামে ইঁহার একখানি কাব্য তখনকার বঙ্গদর্শনে [জ্যৈষ্ঠ ১২৮১] যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইঁহার অনেক গান লোককে গাহিতে শুনিয়াছি, কে যে তাহার রচয়িতা তাহা কেহ জানেও না।

"সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ। অক্ষয়বাবুর সেই অপর্য্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।*

"সাহিত্যে যেমন তাঁর ঔদার্য্য বন্ধুত্বেও তেমনি। অপরিচিত সভায় তিনি ডাঙায়-তোলা মাছের মতো ছিলেন, কিন্তু পরিচিতদের মধ্যে তিনি বয়স বা বিদ্যাবুদ্ধির কোনো বাছবিচার করিতেন না।

* "ইঁহার সদ্য রচনাগুলি সর্ব্বদাই পড়িয়া শুনিয়া আলোচনা করিয়া আমার তখনকার রচনারীতি লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ইঁহার লেখার অনুসরণ করিয়াছিল।"
—পাণ্ডুলিপি

বালকদের দলে তিনি বালক ছিলেন। দাদাদের সভা হইতে যখন অনেক রাত্রে বিদায় লইতেন তখন কত দিন আমি তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া আমাদের ইস্কুলঘরে টানিয়া আনিয়াছি। সেখানেও রেড়ির তেলের মিট্‌মিটে আলোতে আমাদের পড়িবার টেবিলের উপর বসিয়া সভা জমাইয়া তুলিতে তাঁহার কোনো কুণ্ঠা ছিল না। এমনি করিয়া তাঁহার কাছে কত ইংরেজি কাব্যের উচ্ছ্বসিত ব্যাখ্যা শুনিয়াছি, তাঁহাকে লইয়া কত তর্কবিতর্ক আলোচনা-সমালোচনা করিয়াছি। নিজের লেখা তাঁহাকে কত শুনাইয়াছি এবং সে-লেখার মধ্যে যদি সামান্য কিছু গুণপনা থাকিত তবে তাহা লইয়া তাঁহার কাছে কত অপর্য্যাপ্ত প্রশংসালাভ করিয়াছি।"

শরৎকুমারী চৌধুরাণী

১৮৬১—১৯২০

অক্ষয়চন্দ্রের সহধর্ম্মিণী শরৎকুমারীর জন্ম হয় মাতুলালয় চানকে (ব্যারাকপুরে)—১২৬৮ সালের ১লা শ্রাবণ (১৮৬১, ১৫ই জুলাই) তারিখে। দুই বৎসর বয়সে তিনি পিতার নিকট লাহোরে যান এবং সেইখানেই তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। তিন বৎসর বয়সে তিনি স্থানীয় বঙ্গবিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তাঁহাব "প্রবাসের পাঠশালা" প্রবন্ধে এই বিদ্যালয়ের একটি সুন্দর চিত্র আছে। ছয় বৎসব বয়সে তিনি লাহোরের ইউরোপীয়ান স্কুলে প্রবেশ করেন।

১.৭৭ সালের ২৯এ ফাল্গুন (১৮৭১, ১২ই মার্চ) ঠাকুর-পবিবাবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সদ্য এম-এ পাস করা অক্ষয়চন্দ্রের সহিত সমারোহে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি পুনরায় পিতার সহিত লাহোরে চলিয়া যান। ইহার বছর-পাঁচেক পরে তিনি কলিকাতায় স্বামীব নিকট ফিরিয়া আসেন। অক্ষয়চন্দ্র তখন এটর্নী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে-ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই ঠাকুর-পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 'ভারতী'র সম্পাদকীয় চক্রে উভয়েই উৎসাহী সভ্য ছিলেন। স্বামীর ন্যায় শরৎকুমারীও মাতৃভাষার পরম অনুরাগিণী ছিলেন। বন্ধু সমাজে, বিশেষ ঠাকুরবাড়ীতে ইনি 'লাহোরিণী' নামে পরিচিত ছিলেন বা বর্ণিত হইতেন। ১৩২৬ সালের ২৯এ চৈত্র (১৯২০, ১১ই এপ্রিল) তাঁহার মৃত্যু হয়।

শরৎকুমারীর বহু রচনা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া

আছে। ইহার অধিকাংশই স্বাক্ষরহীন ; স্বামীর ন্যায় তিনিও কোন কালেই নামের বা যশের কাঙ্গাল ছিলেন না। আমরা তাঁহার যে-কয়টি রচনার সন্ধান পাইয়াছি, তাহার একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। এই সকল রচনা সম্বলিত "শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী" বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে :—

১২৮৮, ভাদ্র, কার্ত্তিক ···	'ভারতী'	···কলিকাতার স্ত্রীসমাজ*
১২৯৮, আষাঢ়	···'ভারতী ও বালক'	···শাশুড়ি-বৌ
আশ্বিন-কার্ত্তিক, মাঘ	ঐ	···একাল ও একালের মেয়ে
মাঘ ··	'সাধনা'	···আদরের না অনাদরের
১২৯৯, কার্ত্তিক ··	ঐ	···আমাদের পুতুলের বিয়ে
১৩০০, আষাঢ় ···	ঐ	···কন্যাদায়
আশ্বিন-কার্ত্তিক ···	ঐ	···শৈশবে ধর্ম্ম-শিক্ষা
১৩০৬, কার্ত্তিক ···	'ভারতী'	···স্বায়ত্ত সুখ
১৩১২, শ্রাবণ ···	'ভাণ্ডার'	···আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার কোনরূপ পরি-বর্ত্তন আবশ্যক কি না
১৩১৪, অগ্রহায়ণ ··	'বঙ্গদর্শন'	···প্রবাসের পাঠশালা
১৩১৫, আষাঢ় ···	'ভারতী'	···শ্রীপঞ্চমী
ভাদ্র ···	ঐ	···মেয়ে-যজ্ঞি

* ইহা "সিমলা। শ্রীমতী শা—দাসী" স্বাক্ষরিত। এটি যে শরৎকুমারীর প্রথম রচনা, স্বর্ণকুমারী দেবী তাহার সাক্ষ্য দিযাছেন,—'ভারতী,' অগ্রহাযণ ১৩১৬ দ্রষ্টব্য।

১৩১৬, বৈশাখ	...	'ভারতী'	...স্বর্গীয় ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য
জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র	...	ঐ	...দিদিমা
ভাদ্র	...	ঐ	...ত্রিপুরার গল্প
পৌষ, ১৩১৭ অগ্রহায়ণ		ঐ	...মেয়েষজ্ঞির বিশৃঙ্খলা
১৩১৭, পৌষ	...	ঐ	...লক্ষ্মীর শ্রী
১৩১৯, কার্ত্তিক	...	'মানসী'	...দোষ পরিহার
১৩২০, শ্রাবণ, ভাদ্র	...	'ধ্রুব'	...জীবজন্তুর প্রতি অনুরাগ
ফাল্গুন	...	'ভারতী'	...নারীশিক্ষা ও মহিলা শিল্পাশ্রম
১৩২৩, চৈত্র	...	'সবুজ পত্র'	...শিশুশিক্ষার মূলমন্ত্র
১৩২৪, অগ্রহায়ণ-পৌষ	..	'মানসী ও মর্ম্মবাণী'	...যৌতুক
১৩২৮, ভাদ্র, আশ্বিন	...		
অগ্রহায়ণ-মাঘ	...	ঐ	...সোণার ঝিনুক
১৩৫১, কার্ত্তিক-পৌষ	..	'বিশ্বভারতী পত্রিকা'	...ভারতীর ভিটা

এক মাত্র 'শুভবিবাহ' ছাড়া শরৎকুমারীর আর কোন রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথেরই বিশেষ আগ্রহে ইহা মজুমদার লাইব্রেরি ('বঙ্গদর্শন'-কার্য্যালয়) হইতে প্রকাশিত হয়। শরৎকুমারী ইহা ছাপার হরফে প্রকাশ করিতে নারাজ ছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত পুস্তকে নাম দিতে কিছুতেই সম্মত হন নাই। 'শুভবিবাহ' ১৩১২ সালে (২৬ মার্চ ১৯০৬) মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তৎসম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' (আষাঢ় ১৩১৩) পুস্তকখানির একটি বিস্তৃত সমালোচনা করেন, উহা তাঁহার 'আধুনিক সাহিত্যে' স্থান পাইয়াছে। আমরা সমালোচনাটির কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

'শুভবিবাহ' একটি গল্পের বই, স্ত্রীলোকের লেখা, ইহার গল্পের ক্ষেত্রটি কলিকাতা কায়স্থসমাজের অন্তঃপুর। এটুকু বলিতে পারি, মেয়ের কথা মেয়েতে যেমন করিয়া লিখিয়াছে, এমন কোনো পুরুষ-গ্রন্থকার লিখিতে পারিত না।

পরিচয় থাকিলেই তাহার বিষয়ে যে সহজে লেখা যায়, এ-কথা ঠিক নহে। নিত্য-পরিচয়ে আমাদের দৃষ্টিশক্তির জড়তা আনে—মনকে যাহা নূতন করিয়া, বিশেষ করিয়া আঘাত না করে, মন তাহাকে জানিয়াও জানে না। যাহা সুপরিচিত, তাহার প্রতিও মনের নবীন ঔৎসুক্য থাকা একটি দুর্লভ ক্ষমতা।

'শুভবিবাহে' লেখিকা সেই ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ করিয়াছেন। এমন সজীব সত্য চিত্র বাংলা কোন গল্প বইয়ে আমরা দেখি নাই। গ্রন্থে বর্ণিত অন্তঃপুর ও অন্তঃপুরিকাগণ যে লেখিকার বানানো, এ-কথা আমরা কোনো জায়গাতেই মনে করিতে পারি নাই। তাহারাই দেদীপ্যমান সত্য এবং লেখিকা উপলক্ষ্যমাত্র।...

রোমান্টিক উপন্যাস বাংলা-সাহিত্যে আছে, কিন্তু বাস্তব চিত্রের অত্যন্ত অভাব। এজন্যও এই গ্রন্থকে আমরা সাহিত্যের একটি বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিলাম।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬৩—১৯৪৯

শ্রীসজনীকান্ত দাসের আগ্রহাতিশয্যে দশ বৎসর পূর্ব্বে কেদারনাথ তাঁহার জীবনকথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার মৃত্যুর পরে 'শনিবারের চিঠি'তে (অগ্রহায়ণ ১৩৫৬) প্রকাশিত হইয়াছে। কেদারনাথের জীবনীর একমাত্র উপকরণ হিসাবে এই আত্মকথা অমূল্য; আমরা নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

আত্মকথা

১। শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের কয়েকটি কথা।

২। নিবাস ও বাড়া—দক্ষিণেশ্বর, ২৪ পরগণা।

৩। জন্ম—৭ই ফাল্গুন ১২৬৯ সাল, রবিবার শিবত্রয়োদশী (শিবরাত্রের পূর্ব্বদিন) ইংরাজি ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩, রবিবার।

৪। পিতা—৺গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আগেকার ব্রাহ্মণ, পূজা পাঠ সন্ধ্যাহ্নিক নিয়ে থাকতেন। অবশিষ্ট সময় কাটত রামায়ণ মহাভারত দাশু রায় আর 'সংবাদ প্রভাকর' নিয়ে।

শুনেছি—কাজ চালাবার মত (তখনকার) ইংরাজি লিখতে পড়তে জানতেন। তীর্থে বেরিয়ে লাহোরের সান্নিধ্যে আটকে যান। তখনকার দিনে ধর্ম্মশালায় (চটিতে) ইংরাজি জানা বাঙালী এলে

না-কি স্থানীয় সাহেবকে জানাতে হ'ত, সেই সূত্রে ধরা প'ড়ে—ফিরোজপুরে চাকরি স্বীকার করতে হয়েছিল।

অত্যধিক নেশা ছিল—কবির গানের, কবিসঙ্গীত রচনার চর্চাও রাখতেন। আমার বয়স যখন মাত্র ৯ বৎসর, তখন তাঁর পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। মৃত্যুর কয়েক দিন (সম্ভবতঃ ৫।৭ দিন) পূর্ব্বে আমাকে ডেকে, হাতে লেখা একখানি কবিগানের খাতা আমার হাতে দিয়ে বলেন, "এখানি যত্ন ক'রে রেখো, এর পর দেখে খুব আনন্দ পাবে।" তিনি যেন আসন্ন মৃত্যুর সাড়া পেয়েছিলেন।

তাঁর পরলোকগমনের পর—সংসারের নানা পরিবর্ত্তন ও বিশৃঙ্খলায় সে খাতার কথা একদম ভুলে যাই। দীর্ঘকাল পরে (সাহিত্যের স্বাদ পাবার পর) সে খাতার খোঁজ পড়ে। পেলুম না, কেবল অসহনীয় বেদনাই পেলুম। সেই মনোকষ্টে অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ—বহু চেষ্টায় ও বহু কষ্টে প্রায় তিন শত প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করি।

৫। ভ্রাতা—আমরা ছিলাম তিন ভাই—জ্যেষ্ঠ ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মিঁয়ামিরে আচার্য্য কেশব সেনের ব্রাহ্মমিশনের উচ্চশিক্ষিত রামচন্দ্র সিংহের ছাত্ররূপে লেখাপড়া করতেন—এবং ক্লাসিক লিটারেচর প্রায় সবই তাঁর দেখা হয়েছিল। পড়ায় বিশেষ অনুরাগ থাকায় ঐ সঙ্গে উর্দ্দুও ভাল রকম শিখেছিলেন। তাঁর উপর কেশববাবুর বিশেষ টান থাকায় এ-সব সংযোগ ঘটে। কিন্তু সাংসারিক অবস্থার জন্য চাকরি স্বীকার করতে হয়। পড়ার নেশা কিন্তু ছাড়েন নি। সংস্কৃত না জানলে নিজেদের অমূল্য ভাণ্ডার সম্বন্ধে অন্ধ থাকা হবে, তাই তাঁকে ৩৮ বৎসর বয়সে চাকরি করতে করতে পণ্ডিত রেখে রাত ২টা পর্য্যন্ত ব্যাকরণ মুখস্থ করতে দেখেছি।

৬। শিক্ষা—দক্ষিণেশ্বর বঙ্গ-বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দেবার পূর্ব্বেই দাদার আদেশমত উত্তরপাড়া এইচ. ই. স্কুলে ভর্ত্তি হই।

নিত্য পারাপার থাকায়, মা এ ব্যবস্থা কোন দিনই সমর্থন করেন নি। তাই দু-বৎসর পরে কুটিঘাটা স্কুলে চ'লে আসি। সেখানে বছর আড়াই কাটে। এই সময় দাদা মিরাটে বদলি হওয়ায়, সাংসারিক কারণে বাড়ীর সকলকেই মিরাটে চ'লে যেতে হয়।

তখন পশ্চিমাঞ্চলে—বিশেষ পাঞ্জাবের সন্নিকটে, বাঙালীর ছেলেদের লেখাপড়ার কোন সুবিধাই ছিল না। স্কুল থাকলেও উর্দু বা হিন্দী অপরিহার্য্য থাকায় সহসা উচ্চশ্রেণীতে যোগ দেওয়া সম্ভবই ছিল না।

কোন্নগর-নিবাসী কেদারনাথ দত্ত বাঙালীর ছেলেদের এই অভাব দূর কববার জন্যে একটি স্কুল খোলেন। ইংরেজ হেড মাষ্টার, একটি বাঙালী শিক্ষক ও নিজে পড়াতেন। সেই স্কুলেই ঢুকে পড়ি।

বৎসর দুই পরে দাদা আম্বালা বদলি হওয়ায় সেখানে যেতে হয়। সেখানে গোরার ছেলেদের জন্যে একটি কোচিং ইনষ্টিটিউট্ ছিল। অনেক চেষ্টা ও সুপারিশে আমি আর বেলঘর-নিবাসী শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় নামে একটি ছেলে তাতে ঢুকতে পাই। সেখানে পড়াবার ধারা রীতি যত্ন যে কতটা আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল, আজও তা মনে হ'লে শিক্ষক দুটির উদ্দেশে মস্তক নত করতে হয়।

পথে পথে বিদ্যার্জন চলছিল। তাব পূর্ব্বেই তখনকার এন্‌ট্রেন্স দেওয়ার দরকার ছিল, নচেৎ পড়া বেকার হয়ে যায়। পরীক্ষায় যোগ দেবার আশায় তাই লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজিয়েট স্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হই। সংস্কৃত ছাড়া কিছুই বড় দেখতে হ'ত না। আর কয়েক মাস থাকলেই উদ্দেশ্য এগোয়। কিন্তু লেখাপড়ায় আরম্ভ থেকেই ব্যাঘাত সঙ্গ

নিয়েছিলেন। বাড়ীতে আকস্মিক এক অভাবনীয় বিপদের টেলিগ্রাফ পেয়ে দক্ষিণেশ্বর রওনা হ'তে হয়।

দাদার এক বন্ধু আমার জন্য চাকরি স্থির ক'রেই এ কাজ করেছিলেন। বললেন, "গোপালের এই বিপদ্, চাকরি থাকে ব'লে মনে হয় না, এখন তোমার চাকরি না করলে নয়। তোমার লেখাপড়ার উদ্দেশ্য তো জীবিকার্জন"—ইত্যাদি।

স্কুলে পড়ার এইখানেই শেষ।

(দাদা তখন ২৫০৲ টাকা বেতন পান। তাঁর নামে একটা চার্জ দিয়ে তাঁকে সস্পেণ্ড ক'রে রাখা হয়েছিল। ছয় মাস পরে অফিসারের ভুল ধরা পড়ায় দাদা আবার সেই কাজেই প্রতিষ্ঠিত হন। তখন তিনি আমাকে চাকরি ছেড়ে পড়তে বলেন। কেঁচে সে কাজ আর করা হয় নি।)

দাদা তখন 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন আর আমাকে দিয়ে কাপি করাতেন। কখন বা বিষয়টা বাংলায় ব'লে দিয়ে ইংরাজিতে সেটা লিখতে বলতেন, পরে কেটেকুটে ঠিক ক'রে দিতেন। ক্রমে নিজের লেখার ঝোঁক চাপে। কয়েক বার নিজেও লিখেছিলুম—তিনি অবশ্য দেখে দিতেন।

দাদা গোড়া থেকেই 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা নিতেন। বাংলা বই তখন অল্পই ছিল, এবং পশ্চিমে সে সব দেখবার উপায় বা সুবিধা ছিল না। 'বঙ্গদর্শন'ই আমার এক মাত্র বাংলা পাঠ্য হয়ে দাঁড়ায়। আমি তার প্রত্যেক লেখাটি বার বার পড়তুম। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, "বিষবৃক্ষ" "চন্দ্রশেখর" "কমলাকান্ত" প্রভৃতি কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল।

তখনকার দিনে ইংরাজিতে লেখা শিক্ষিতদের অপরিহার্য্য ফ্যাশন ছিল, পত্রাদি লেখা তো বটেই। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন,' বিশেষ বঙ্কিমচন্দ্রের

লেখা আমাকে এতই মুগ্ধ করেছিল, ইংরাজি লেখার মোহ একদম মুছে গেল। সেজন্য দাদা দুঃখও করেন, তিরস্কারও করেন। বলেন, "বাংলা লিখতে নিষেধ করি না, কিন্তু ইংরাজি আমাদের জীবিকার্জনের ভাষা, তার উপর কর্ম্মজীবনের উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে, ওটা একেবারে ছেড়ো না।" কথা সত্য হ'লেও আমাকে তখন 'বঙ্গদর্শন' টেনেছে, বিশেষ "কমলাকান্ত" স্বয়ং।

আমার সাহিত্য-সংস্রবের প্রথম অধ্যায়

তাই প্রারব্ধ-যৌবনের অপরিণত অভিজ্ঞতা নিয়ে 'সংসারদর্পণ' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনে ব্রতী হই।' ছেলেখেলা হ'লেও 'সংসারদর্পণ' একাদশ শতাধিক গ্রাহক পেয়েছিল। দুই বৎসর চালিয়ে কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে সম্পাদন বন্ধ করতে বাধ্য হই। কারণ ছিল, তখনকার দিন ছিল লেখক-বিরল, সম্পাদকদের পত্রিকার প্রায় অর্দ্ধেক পৃষ্ঠা পূরণের ভার নিতে হ'ত বা নেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হ'ত। তখন লেখক থাকলেও তাঁরা ছিলেন অল্পসংখ্যক, বোধ হয় এখনকার মত সাহসীও ছিলেন না (বে-পরোয়া বলছি না)। বর্ত্তমান যুগকে পাঠক-বিরল না বললেও এটা লেখক-বিরল যুগ তো নয়ই।

রোগমুক্ত হ'লেও সাহিত্যচর্চা ছাড়ল না। সেইটাই রোগ হয়ে রইল।

কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি কতকটা শান্তির জন্য। 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' নাম দিয়ে আড়াই বৎসরের শ্রম ও চেষ্টায় প্রায় তিন শত প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ ক'রে ১৩০১ সালে প্রকাশ করি। কবি হেমচন্দ্র তার বহু প্রশংসা ক'রে পত্র লেখেন, এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাধনা'য় [জ্যৈষ্ঠ ১৩০২] একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লিখে তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন।

অনুমান ১৩০২।৩ 'রত্নাকর' নামে একখানি ক্ষুদ্র নাটক লিখে প্রকাশ করি। অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রকাশের পর পরম শ্রদ্ধেয় নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে দেখাই। তিনি দয়া ক'রে দেখে দু-একটি দোষ সম্বন্ধে উপদেশ দেন এবং আনন্দ প্রকাশ ক'রে উৎসাহও দেন। ষ্টেজে ব্রহ্মহত্যাটি ছিল প্রধান দোষের এবং নিষিদ্ধও।

এই সময় 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পত্রিকায় ব্যঙ্গরসিক শ্রদ্ধাস্পদ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "পঞ্চানন্দ" লিখতেন, এবং 'দৈনিক চন্দ্রিকা'য় ও মধ্যে মধ্যে 'বঙ্গবাসী'তে নন্দিশর্ম্মার 'নোট' বা ডায়াবি নামে আমার হাস্যরসাত্মক 'চুটকি' প্রায় তিন বৎসর দেখা দেয়। ক্ষোভের (সম্ভবতঃ সুখের) বিষয়, নিজের 'ফাইল কাপি' নষ্ট হওয়ায়, সে সব আর পুস্তকাকারে প্রকাশ পায় নাই। নির্ব্বাচনান্তে প্রকাশের ইচ্ছা ছিল, সে সম্ভাবনা আর নাই।

ওই সময় ঠাকুব-বাড়ী হ'তে 'বালক' নামে একখানি পত্রিকা দেখা দেয়। এক সংখ্যায় "লাঠি" ব'লে একটি লেখা বাহিব হয়। সেই সংস্রবে বোধ হয় মনীষী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ [রবীন্দ্রনাথ] ঠাকুর "লাঠির উপর লাঠি" চালান। আমি "লাঠালাঠি" লিখে [আষাঢ় ১২৯২] সেটা শেষ ক'রে দি। পরে রবীন্দ্রনাথের "চিরঞ্জীবেষু" ব'লে ইয়ং বেঙ্গলদের প্রতি ঠাকুদ্দার উপদেশ দেখা দেয়। আমি "শ্রীচরণেষু" ব'লে তার উত্তর দি [অগ্রহায়ণ ১২৯২]। বিষয়টি উভয়েই দু-তিন সংখ্যায় চালাই। তখন কে জানত যে, কার সঙ্গে এই বাচালতা করা হচ্ছে!

এখন দক্ষিণেশ্বরকে আমাদের সময়কার পল্লীগ্রাম বলা আর চলে না। তখন কলকেতায় চাকরি করতে যাওয়া মানে কাজ করতে যাওয়া অপেক্ষা যাতায়াতের চাকরিই ছিল বড় চাকরি। সে কাজে চার ঘণ্টা নিত, প্রস্তুত হবার হাঁপানি আর বিবিধ অসুবিধা বাদে।

সুতরাং আমি ছিলাম তখনকার পাড়াগেঁয়ে, শহরের "চোখোলো মুখোলো" তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা না থাকায় সহজেই আমার দুখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সুমধুর মিষ্ট ভাষার মোহে পরহস্তে অগস্ত্যগমন করে। কিছু দিন পরে তাদের রূপান্তরে ও নামান্তরে দেখতে পাই। আবার দাদার এক পরিচিত লোকের হাতে একখানি ছাপানো গ্রন্থের পঞ্চশতাধিক কাপি উই আর ইঁদুরের গর্ভে না-কি লোপ পায়। অসম্ভব নয়, 'পদ্যপাঠে' তাঁদের পরিচয়ও পড়া ছিল।

এই সব আঘাতই আমার সাহিত্যচর্চা বা সাহিত্যসেবা থামিয়ে দেয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি লিখে প'ড়ে স্বেচ্ছায় বদলি বরণ ক'রে জব্বলপুর চ'লে যাই। ব্যথাটা বড়ই লেগেছিল,—প্রিয়বস্তুর সঙ্গে বিচ্ছেদ অতি সামান্য কারণে, অকারণেও ঘ'টে থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

জব্বলপুরে সাত বৎসর কাটে। মানুষ একটা কিছু না নিয়ে থাকতে পারে না, পড়াটাই বন্ধু হয়ে রইল। ক্যাণ্টনমেণ্টে বাঙালীদের দুর্গোৎসব বা থিয়েটর ছিল না। দত্তপুকুর-নিবাসী ৺নৃত্যগোপাল লাহিড়ী ছিলেন কর্ম্মী, উৎসাহী ও অভিনয়দক্ষ, তাঁকে অবলম্বন ক'রে দুর্গাপূজা আরম্ভ করা হয় এবং উৎসবের দিক্‌টা সফল করা হয় থিয়েটরে।

চীনে 'বক্‌সার' হাঙ্গামা সম্পর্কে আদেশমত ১৯০২ খৃঃ জুলাই মাসে চীন যাত্রা করি। ইতিপূর্ব্বে যুদ্ধ-সংস্রবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যাবার আদেশ চার বার পাই। নানা ছলে সে-সব এড়িয়েছিলুম, কারণ মা তখন বেঁচে ছিলেন। বার বার যুদ্ধে যাবার আদেশ অমান্য করায় তার কঠিন সাজাও স্বীকার করতে হয়েছিল, চাকরিতে আমার উন্নতির সকল পথই বন্ধ করা হয়। তা আমার গায়ে লাগে নি, মায়ের শান্তি-

বিধানের জন্য চাকরির মায়া ত্যাগ করতেও আমি প্রস্তুত ছিলুম। এখন মা ও দাদা উভয়েই পরলোকে, তাই চীনযাত্রাটা স্বেচ্ছায় করি। তাতে জগতের সমস্ত সভ্য (?) জাতিকে এক ক্ষেত্রে দেখবার সুযোগ পাই। তাঁরা বক্সার হাঙ্গামা উপলক্ষ্য ক'রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসে চীনের বুকে চেপে ব'সে ছিলেন।

লেখার উপর অভিমান ক'রে দিন কাটানো কঠিন ছিল। তাই চীনেও একটা কিছু নিয়ে থাকবার তরে অফিসারদের সাহায্য নিয়ে টিনসিন শহরে ইণ্ডিয়ান রিক্রিয়েশন ক্লাব খোলা হয়। সেখানে নিত্য নিজেদের বসা, দাঁড়ানো, খেলা, বক্তৃতাদি ছাড়া ভারতের লোকেরা সেখানে guest হ'তে পারতেন, এবং হতেনও। তার মধ্যে মিঃ ছত্রে। ইনি তাঁর মহারাষ্ট্রী সার্কাস নিয়ে আসেন। তাঁকে নানা প্রকারে সাহায্য করা হয়েছিল। যা পূর্ব্বে কোনও 'ফরেনারে'র ভাগ্যে কোনও দিন ঘটে নাই, বোধ করি ভারতীয় ব'লেই, পিকিন (Forbidden City) হ'তে তাঁদের সার্কাস দেখাবার জন্য ডাক পড়ে। রাজপরিবারের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী উক্ত ক্লাবে এসে ব্যবস্থা ক'রে যান। মিঃ ছত্রে ফেরবার সময় ক্লাবকে একটি ঘড়ি ও একটি অর্গান উপহারস্বরূপ দিয়ে যান। আমরাও তাঁকে অভিনন্দনপত্র ও স্বর্ণপদক (মেডেল) দি।

১৯০৫ আগস্ট অর্থাৎ তিন বৎসর পরে ভারতে ফিরে কানপুর ষ্টোর অফিসের ভার গ্রহণ করতে হয় এবং ওই সঙ্গে স্থানীয় ভদ্রলোকদের ইচ্ছা ও অনুরোধে সেখানকার "বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ" লাইব্রেরির সম্পাদকত্ব স্বীকার করতেও হয়। স্থানীয় সর্ব্বপ্রিয় যশস্বী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট। প্রবাসে—উৎসাহী, উদ্যমী, কর্ম্মপ্রাণ, উদার, মুক্তহস্ত মনীষীদের মধ্যে তাঁকে অন্যতম বললেও যেন সবটা বলা হয় না।

আমাদের উভয়ের প্রীতির বন্ধন ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল, বাঙালীদের জন্য তিনি একটা কাজের মত কাজ খুঁজছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চিন্তা-চর্চা চলছিল, পরে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তাব করি—এ প্রদেশে বাঙালী যুবকদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও বাংলা-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ উদ্দীপনের চেষ্টার আবশ্যক হয়েছে ; কিন্তু অগ্রণী হয়ে সহসা নিজেরা কিছু করতে গেলে সকলের সহানুভূতি পাওয়া সহজ হবে না। সব শহরগুলির চিত্তাকর্ষণ করতে হ'লে তাঁদের সামনে একটা সমষ্টিগত শক্তিমান্ প্রতিষ্ঠানের বলিষ্ঠ আদর্শ একবার ধ'রে দিতে হবে। এই বৎসর এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন, আমার প্রস্তাব ছিল সেই মণ্ডপের সুযোগ নিয়ে প্রথমে কলিকাতার "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ"কে এ প্রদেশে আহ্বান ক'রে বাঙালীদের মধ্যে বাংলার ভাবধারা ও বঙ্গভাষার শক্তি-সামর্থ্য ও মাধুর্য্য সংক্রামিত করা এবং তাঁদের চিত্তে বঙ্গভাষার প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা। প্রস্তাবটি ডাঃ সেন সোৎসাহে সমর্থন করেন।

পরে উদ্দেশ্যটি বিশদ ও বিস্তারিতভাবে এবং উদ্দেশ্যের কারণগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত সুগঠিত ক'রে প্রধান প্রধান শহরগুলির লাইব্রেরি বা ক্লাবের সম্পাদকের নিকট পাঠাই ও তাঁদের অভিমত আহ্বান করি। বিশেষ শ্রমসাধ্য হ'লেও সে সুযোগ না নষ্ট হয় সেই চেষ্টাই পাই।

সকলের অভিমত সংগ্রহের পর পরম শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকট আবেদন উপস্থিত করি। তাঁর আন্তরিক সমর্থনও পাই। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ময়মনসিংকে কথা দেওয়া হয়েছিল, তাঁর চেষ্টা সত্ত্বেও ময়মনসিং-অধিবেশন স্থগিত রাখতে রাজি হ'তে পারলেন না, যেহেতু তাঁরা বহু দূর অগ্রসর হয়েছিলেন।

এই আশাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আমি কলিকাতায় বদলি হওয়ায়, সকলেই, প্রধানতঃ ডাঃ সেন নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। আমি কথা দি—কলিকাতা অবস্থানকালে পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলবার সুযোগ পাব। আমার তিন মাস ছুটি পাওনা আছে, সেই সাহায্যে এ কাজটি ক'রে যাব।

তা আর করতে হয় নি। আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা—উদ্দেশ্যের দিকে ধীরগতিতে আপনি রূপায়িত হয়ে থাকে। পূর্ব্বচেষ্টার ফলে ও প্রভাবে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যেও একটা নীরব জাগরণ—সঙ্ঘবদ্ধ হবার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। কয়েক বৎসর পরে সেই আকাঙ্ক্ষা প্রাচীন বিদ্যাকেন্দ্র কাশীধামে—"প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনী" নামে প্রথম দেখা দেয়, এবং তাতে পৌরোহিত্য করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

চাকরি কোন দিনই আমার ভাল লাগে নি। অথচ অফিসাররা সকলেই চাইতেন ও ভালবাসতেন। পুত্র হয় নি। কন্যা একটি মাত্র, সে সুপাত্রেই পড়েছিল। জামাই ছিলেন এল. এম এস ডাক্তার। ভাবলুম—কেন আর ভূতের ব্যাগার খাটা। এ ইচ্ছা কানপুর থেকেই প্রবল হয়। কিন্তু চীনের ও পশ্চিমের জলহাওয়ার গুণে স্বাস্থ্য তখন নিখুঁত। নির্দিষ্ট কার্য্যকাল পূর্ণ হতেও বছর সাতেক বাকি। আমাকে চাকরি হ'তে অবসর দেবে ক? মন কিন্তু চাকরি-বিমুখ। আমার অফিসার মেজর স্মিথ ডি. এস. ও বন্ধুর মত ভালবাসতেন। তাঁকে সব কথা খুলে বলি,— ছেলে নেই, কন্যাদায়মুক্ত হয়েছি, জীবন কিন্তু নিষ্ফল। জীবিকার্জন করেছি মাত্র, নিজের কাজ কিছুই করা হয় নি। আমি ব্রাহ্মণসন্তান, পরমার্থচিন্তা আমার অবশ্যকরণীয় কাজ। সেটা র'য়ে গিয়েছে। সব সত্য কথা বললুম ও আমাকে কর্ম্ম হ'তে অবসর নিতে সাহায্য করতে অনুরোধ করলুম। তিনি শুনে অবাক! পরে

আমার প্রস্তাবের আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা বুঝতে পেরে বললেন—"পাঁচটা বছর থাকলে, এখন যা পাবে তার তিনগুণ পাবে, নির্ব্বোধের মত এরূপ ত্যাগস্বীকার কেন?" বললুম—সারাজীবন comfort-seekingএ (আরাম খুঁজে) কেটেছে, এ কাজে ত্যাগই প্রথম সোপান,—আমি যদি অল্পে চালাতে না পারি, ত্যাগের আনন্দ আমাকে সাহায্য না করে, তবে বুঝব—আমার এ সঙ্কল্পের মধ্যে সত্য নাই। বললেন—"আমার বদলি আসন্ন, সেই সময় মনে ক'রে দিও।" তাঁর সাহায্য ছাড়া কর্ম্ম হ'তে অবসর লওয়া আমার সম্ভব ছিল না।

কাশীগমন

১৯০৯এর নবেম্বরে ছুটি নিয়ে কাশী যাই, পরে ১৯১০এর মে মাসে মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের সাহায্যে রিটায়ার করি।

Habit is the second nature ব'লে একটা কথা আছে, আমরাও ব'লে থাকি "অভ্যাস যায় না ম'লে।" জোর ক'রে লেখার অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিলুম। যদিও বিশ বৎসরের মধ্যে চীন হ'তে "চীনপ্রবাসীর পত্র" নামে 'ভারতী' পত্রিকায় দুই বার [চৈত্র ১৩১০, বৈশাখ ১৩১১] মাত্র লিখি, শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন তা থেকে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব উদ্ধৃত ক'রে নব পর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে' লেখেন ও সেই অত্যাবশ্যকীয় কথাগুলিতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অন্যান্য কথার মধ্যে ছিল, মেয়েদের অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা করাই চাই, এমন কি compulsory হ'লে ভাল হয়।

তার বছরখানেকের মধ্যে তা নিয়ে দেশে সাড়া পড়ে, বোধ করি শ্রদ্ধেয়া কৃষ্ণভাবিনী দাস উদ্যোগী হন।

অন্তরে কিন্তু সাহিত্য-প্রীতির আসন পাতাই ছিল। কোথাও না লিখলেও, বাড়ীতে একখানা খসড়া খাতা খোলা থাকত, অবসর-বিনোদনের উপায়চ্ছলে। দশাশ্বমেধে সাধু সন্ত দেখে বেড়াই, সুযোগ হ'লে সঙ্গও খুঁজি। তদ্ভিন্ন বিশেষ কিছু চোখে পড়লে বাসায় ফিরে অন্তর-কণ্ডুয়ননিবৃত্তি হিসেবে লিখে রাখি। খাতাখানি ক্রমে পুষ্ট হ'তে থাকে।

ইতিমধ্যে কলকেতার প্রেস তুলে এনে, মণিভূষণ নাথ ব'লে একটি ছেলে কাশীধামে প্রেস প্রতিষ্ঠা করে। আমার বৈঠকখানা চিরদিনই প্রিয় তরুণদের কাছে অবারিত থাকত। মণিভূষণও আসত যেত। সেই খসড়া খাতাখানির উপর তার নজর পড়ে ও আমার উপর তার আব্দার পড়ে। কোনও আপত্তিই কাজ দিলে না। শেষ সর্ত্ত হ'ল আমার নাম ব্যবহার করতে পারবে না। মণিভূষণ আমার 'বঙ্গবাসী' ও 'দৈনিক চন্দ্রিকা'য় ব্যবহৃত pen-name—"নন্দিশর্ম্মা" ব্যবহার করে, পুস্তকের নামকরণ হয় 'কাশীর-কিঞ্চিৎ'।

শ্রদ্ধেয় রসরাজ অমৃতলাল বসু তখন কাশীধামে ছিলেন। লোকে তাঁকেই লেখক ব'লে ঠাওরায়। 'প্রবাসী' পত্রিকা লেখেন—এ লেখা হাস্যরসিক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন আর কাহারও নয়। তখন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'কাশীর-কিঞ্চিৎ'এর একটি দীর্ঘ সমালোচনাচ্ছলে ললিতবাবু ব'লে দেন—লেখা তাঁর নয়। পরে বড়দিনের বন্ধে কাশী এসে আমাকে কেবল আবিষ্কারই করেন না, বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও স্থাপন করেন এবং বলেন, "বন্ধুদের বিতরণের জন্য আমাকে আপনি 'কাশীর-কিঞ্চিৎ'এর ষোল কাপি কিনিয়েছেন।" পরে নাছোড়বান্দা হয়ে, ভবিষ্যতে লেখবার (নিম্) রাজিনামা নিয়ে কলকেতায় ফেরেন। তার পর যত দিন জীবিত ছিলেন, আমাদের মধ্যে নিয়মিত পত্র-ব্যবহার ছিল। এমন রসগ্রাহী স্কলার সুধী বহু

ভাগ্যে মেলে। তাঁর অনুরোধ এড়ানো আমার সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে। তাঁর তাগিদেই আমাব সাহিত্যসেবার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ।

নাট্যকার শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দোপাধ্যায় কাশী হ'তে 'প্রবাস-জ্যোতিঃ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সম্পাদনভার আমার উপরই ন্যস্ত হয়। এক বৎসর পরে তা পাক্ষিক কি সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হওয়ায় আমি সে সংস্রব ত্যাগ করি। এখনকার 'উত্তরা'-সম্পাদক শ্রীমান্ সুরেশ চক্রবর্ত্তী হন সহকারী সম্পাদক। শ্রদ্ধেয় ললিত বাবুব বিশেষ আগ্রহে আমার সাহিত্যসেবার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়, কিন্তু শ্রীমান্ সুরেশের আন্তরিক চেষ্টা ও তাগিদ না থাকলে আমার এ কাজ দু-দিনেই থেমে যেত।

এই সময় আমাদের প্রিয় সাহিত্যশিল্পী লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র কাশী আসেন। কাশীতেই তাঁব সহিত সাক্ষাতের ও আলাপের সৌভাগ্য আমার ঘটে। পরে তা বন্ধুত্বে দাঁড়ায়। প্রেমিক দরদী একবার আমার কঠিন পীড়ার সংবাদ পেয়ে একটি চাকর সঙ্গে কাশী এসে উপস্থিত। পাঁচ দিন থাকেন, অনেক কথাই হয়, পরে আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়ে ষষ্ঠ দিন প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সে কথা আজ কথা মাত্র বোধ হ'তে পারে, কিন্তু সে দিন তা ছিল না।

পরে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে দেখা। রূপনারায়ণ-তীরে তাঁর সামতাবেড় ভবনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করি। নিজেই নিষেধ করেন, "পথ সুগম নয়—কষ্ট হবে।" পরে, উভয় কবির সঙ্গে দেখা করতে যাই জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। ৩০০ মাইল থেকে যেতে হ'লেও তাঁর "বন্দনা"-সভায় না গিয়ে থাকতে পারি নি। শেষ দেখা—প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মীলনীর কলিকাতা-অধিবেশনে গিয়ে। সেই সময় একত্রে তাঁর 'বিজয়া' নাটকের অভিনয় দেখে আসি। তখন বলেছিলেন,

"আর নয়, মাত্র দুখানি নাটক লিখে ছুটি নেব।" নিজে অত্যন্ত অপটু থাকায় তাঁর শেষ শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হ'তে পারি নি। বন্ধুত্বের নিদর্শনরূপে তাঁর কয়েকখানি পত্র রেখেছি মাত্র।

পেনশনের পর কাশীবাস ক'রে সাহিত্য নিয়ে থাকতে, মন মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ ক'রে উঠত, এ কি করছি! এ যে যেমন অশোভন, ততোধিক লজ্জার কথা! পূজনীয় কবি আহমদাবাদ যাবার পথে শ্রদ্ধেয় অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের লক্ষ্ণৌ নিবাসে বিশ্রাম করছিলেন। প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মীলনীর নাগপুর-অধিবেশনে সাহিত্য-বিভাগে আমার অভিভাষণ অতুলপ্রসাদের না-কি বড ভাল লেগেছিল। সে কথা শুনে কবি আমাকে দেখতে চান, আমি নাগপুর হ'তে কাশীতে ফিরেছি মাত্র—সহসা 'উত্তরা'-সম্পাদক শ্রীমান্ স্থরেশ চক্রবর্ত্তীর নামে জরুরি টেলিগ্রামে অতুলবাবু কবির ইচ্ছা জানিয়ে আমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। কবিসকাশে নানা আলোচনায় পাঁচ দিন মহানন্দে কাটে। সেই স্থযোগে কাশীবাসান্তে সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে আমার মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা কবিকে জানাই। তিনি মৃদু হেসে বলেন, "মুক্তি চাও,—না?" পরে এক কথায় আমাকে নীরব করে দেন। কথাটি এই,—"মুক্তি দিয়ে মুক্তি পেতে হয়। মুক্তি না দিয়ে কেউ মুক্তি পায় না। তুমি যদি মুক্তিকামী হও, আর তোমার মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে, যা তোমার আত্মীয় হয়ে তোমার অন্তরে আছে, যার কথা তোমার মধ্যে বিক্ষেপ আনে, তোমার মনকে সহজভাবে জড়িয়ে থাকে ও টানে, তাকে মুক্তি না দিলে তোমার মুক্তি কোথায়? তাকে মুক্তি দিলে তবে তোমার মুক্তি।" ইত্যাদি। তার পর নাটক সম্বন্ধে কিছু জানতে চাওয়ায় খুব উৎসাহের সহিত অনেক কথা বলেন। "তোমরা (শরৎ, তুমি) সামাজিক নাটক লিখলে অনেক জিনিষ পাওয়া

যায়।” বিষয়টি সারাদিন তাঁকে ত্যাগ করে নি, মধ্যে মধ্যে সে সম্বন্ধে নিজেই বহু উপদেশ দেন। নানা কারণে আমার দ্বারা তা আর হয়ে ওঠে নি। প্রধান কারণ ৫৬।৫৭ বৎসর বয়সে সাহিত্যসেবার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হওয়া, আর পত্রিকাদিতে কন্‌ট্রিবিউশনের তাগাদা। প্রতিভাবান্ ও বিশেষ শক্তিসম্পন্ন লেখক ভিন্ন, তাগাদা তামিল ক’রে কেউ কোন ওয়ার্ক রেখে যেতে পারেন কি না সন্দেহ। আমার স্বভাব ছিল স্বতন্ত্র। যতক্ষণ পেরেছি কাকেও ক্ষুণ্ণ করতে পারি নি, লিখতেই হয়েছে।

ললিতবাবুর তাড়ায় তখন আমি কেবল ভাবছিলুম—কি লিখব? আমার লেখা পড়বেই বা কে এবং কেন? উপদেশাত্মক কথা—‘সার্ম্মন্’ নিজেরই ভাল লাগে না, দেশে তার অভাব নেই। সে সব পৃষ্ঠাগুলি না দেখে বাদ দিয়ে যাওয়াই তো সাধারণ অভ্যাস। কি লিখি? শেষে অনেক ভেবে জীবন, সমাজ ও সংসারের বেদনাগুলি যথাসম্ভব হাস্যরসের আবরণে প্রকাশ করবার পথ খুঁজি, তাতে যদি পাঠক-পাঠিকার সহানুভূতি পাই। প্রয়াসটি আমার পক্ষে সহজ ছিল না, অথচ অন্য পথে পাঠকদের আকৃষ্ট করবার ক্ষমতাও আমার ছিল না।

মধ্যবিত্ত ভদ্রদের ও ভদ্র পরিবারের কষ্টের জীবন আমাকে চিরদিনই বেদনা দিয়েছে ও দেয়, বিশেষ মহিলাদের দুঃখের জীবন, যা অন্তরে চেপে প্রসন্ন মুখে নীরবে তাঁরা বহন ক’রে চলেছেন ও চলেন। দুঃসাহসের কাজ হ’লেও আমাকে তা হাসির আবরণে ব’লে যেতে হয়েছে। আমার অভিজ্ঞতা ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বের বলা চলে। তার পর বহু পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তাতে যে তাঁদের সংসারের বিশেষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে তা আমার জানা নাই। বাহ্যিক উন্নতিই চোখে পড়ে—তাও শহরে ও শহরতলিতে। তাই আমি আমার লেখায়

কোথাও বিশেষভাবে তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে সাহস পাই নি। কল্পনার উপর নির্ভর করি নি। গরীবদের লোক গরীব ব'লে এবং ধনীদের ধনী ব'লে জানে, মধ্যবিত্তদের সে আশ্রয় নাই, বাঁচোয়াও নাই। 'দেনা' আর 'উঠ্‌নো'ই তাদের মা-বাপ।······

প্যাস্টিম্‌

১। তরুণত্বের কোটায় স্যাটায়ার সৃষ্টির সখ চেপেছিল। একেবারে না ছাড়লেও সেটা ত্যাগ হয় গ্রামস্থ একজন পদস্থ সম্মানিতকে ক্ষুণ্ণ ক'রে। লর্ড রিপন আমাদের সংক্ষিপ্ত স্বায়ত্তশাসন দেওয়ায় গ্রামে গ্রামে ভোট সংগ্রহের সাড়া প'ড়ে যায়। কমিশনার-পদপ্রার্থীদের আহার-নিদ্রা ত্যাগ হয়। সেই সময় "ভোটভিক্ষা" নাম দিয়ে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় একটি কবিতা লিখি। লেখাটি বোধ হয় সকলের হয়ে কথা কয়েছিল। তাই দেশময় তা নিয়ে সাড়া প'ডে যায় এবং বহু পত্রিকায় সেটি উদ্ধৃত হয়। শুনেছি, শ্রদ্ধেয় অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সাধারণী' পত্রিকাতেও তা উদ্ধৃত ক'রে আলোচনাও হয়েছিল। আমাদের সম্মানিত সে-কালের রায় বাহাদুর, সেটিকে নিজের ব'লে গায়ে পেতে নেন। বস্তুতঃ সেটি সম্পূর্ণ সাধারণভাবে লেখা হয়েছিল। আঘাতটা তাঁকে অতিরিক্ত লাগে। তাই গুরুজনদের একান্ত অনুরোধে সে পথ ত্যাগ করি।

২। তার পর "ফ্রেনলজি" আর "সামুদ্রিক" নিয়ে কিছু দিন কাটে।

৩। পরে, সাধারণতঃ কারও কারও জীবনে যে ঝোঁকটা ধরে,—সাধুসঙ্গ, প্রাণায়াম-প্রীতি এস্তোক মিস্‌ম্যারিক্‌-সার্কল। যাক, কোনটাই স্থায়ী হয় নি।

N. B. শেষ দেখলুম—(প্যাষ্টিম না বলতে পার) সবার বড় সাহিত্যের নেশা—যা পত্নীর সতীন।

সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ

জীবনে উল্লেখযোগ্য যদি কিছু থাকে, সেটি—

১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীচরণ দর্শন।

২। ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীর শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীর দর্শন লাভ।

৩। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর দর্শন লাভ।

৪। শ্রীযুক্ত আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের দর্শন লাভ।

৫। বালগঙ্গাধর তিলক মহারাজের দর্শন।

পরলোকগত সাহিত্য-স্রষ্টা ও সাহিত্য-রথীদের সাক্ষাৎ লাভ।

১। সাহিত্য-স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—যাঁর লেখায় সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যের আস্বাদ পাই।

২। শ্রদ্ধাস্পদ ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

৩। শ্রদ্ধাস্পদ 'সাধারণী' ও 'নবজীবন' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

৪। পূজনীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৫। নাট্য-সম্রাট্ গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

৬। রসরাজ অমৃতলাল বসু।

৭। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

৮। সমাজ-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রিয় পাঠ্য

বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের লেখা নির্ব্বাচনসাপেক্ষ নয়। সবই আমার শ্রদ্ধার বস্তু। তবে চয়নিকা (এখন সঞ্চয়িতা), নৈবেদ্য,

গীতাঞ্জলি, এগুলিকে "স্বাধ্যায়" বলা চলে। ছোট গল্প প্রবন্ধ ও সমালোচনা হাতের কাছে পেলে না পড়ে থাকতে পারি না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ' ও 'সমালোচনা' সম্বন্ধেও যথেষ্ট মোহ আছে।

শরৎচন্দ্রের সব লেখাই আনন্দ দেয়। আগের দিকের লেখাগুলি তদ্ভিন্ন আরও কিছু দেয়। শেষের কয়েকখানির সঙ্গে মতের কিছু কিছু অমিল থাকলেও পাঠের আনন্দে তা বাধা দেয় না।

স্বামী বিবেকানন্দের লেখা আমি সাগ্রহে ও শ্রদ্ধার সহিত প'ড়ে থাকি।

এ সবের সঙ্গে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি অবশ্যপাঠ্যের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তবে মহাপুরুষদের জীবনী আমার শ্রদ্ধার বস্তু ও সুখপাঠ্য।

ইংরাজি গ্রন্থের প্রিয়পাঠ্যের উল্লেখ নির্বাচনান্তে দেওয়া সম্ভব নয়।

কলেজের অধ্যয়নে আমি বঞ্চিত। মেজর বেনেটের "ফেয়ারওয়েল" লিখেছিলুম, তিনি খুশি হয়ে তাঁর নিজের লাইব্রেরিটি আমাকে উপহার-স্বরূপ দিয়ে যান, তাই আমার বিদ্যার পুঁজি। পরে বিংশ শতাব্দীর কন্টিনেন্টাল লিটারেচার আমার অল্পই দেখা হয়েছে। তাই প্রিয়পাঠ্য যা ছিল তার কয়েকখানির কথা আজও যা মনে আছে তারই উল্লেখ করছি—

এডিসনের Spectatorএ তাঁর নিজের লেখাগুলি এবং Mr. Stell ও Mr. Swiftএর লেখা।

Charles Dickens (not all his books) ও Charles Lambএর গ্রন্থ। টলষ্টয় ও টুরগানিভের গ্রন্থ। থ্যাকারে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক Jerome K. Jeromeএর humorous লেখাগুলি। Mark Twain Ruskin, Anatol France,

Balzacএর Atheist's Mass আর তার descriptive লেখা আমার বড় ভাল লাগে।

মনে ক'রে লিখতে গেলে detail বেড়ে যাবে। সব মনেও নেই।

শেষ এখন দাঁড়িয়েছে Amiel's Journalsএ। অর্থাৎ যাঁদের লেখা থেকে আমি সুর ও সাহায্য পেয়েছি তাঁদেরই নাম করলুম। ··

আর বেশির দরকার কি? আজ (১৬. ২. ৪০) ৭৮ আরম্ভ হ'ল, জীবন-কথার কি শেষ আছে ভাই!

পত্নীবিয়োগ—২রা জুলাই ১৯৩৯। এই "মধুরেণ" পর্য্যন্ত থাকাই ভাল

ডুমকা, ১৫. ২. ৪০ কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়

সাময়িকপত্র-সম্পাদন

'সংসারদর্পণ'।—কেদারনাথ "প্রারব্ধ-যৌবনের অপরিণত অভিজ্ঞতা নিয়ে" দুই বৎসর সংসারদর্পণ' নামে মাসিক পত্রিকা সম্পাদনের কথা বলিয়াছেন। 'সংসারদর্পণে'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—শ্রাবণ ১২৯৪ (জুলাই ১৮৮৭)। ইহা "১৩ নং ঘোড়াবাগান ষ্ট্রীট হইতে শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" প্রতি সংখ্যায় ৩২ পৃষ্ঠা পরিমাণ রচনা থাকিত। সংসার, সমাজ, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় সকল আলোচনা করাই 'সংসারদর্পণে'র উদ্দেশ্য ছিল। কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর এই পত্রিকা বাহির হইয়াছিল।

'প্রবাস-জ্যোতিঃ'।—ইহা প্রথম বর্ষে মাসিক আকারে কাশী হইতে প্রকাশিত হয়—১৩২৭ সালের আশ্বিন মাসে। কেদারনাথ ১ম

বর্ষের 'প্রবাস-জ্যোতিঃ' সম্পাদন করিয়াছিলেন। 'প্রবাস-জ্যোতিঃ' ব্যঙ্গচিত্রে সুশোভিত হইত।

'প্রবাস-জ্যোতিঃ' সম্পর্কে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একখানি পত্রে (১২-১০-১৯২০) কেদারনাথকে লিখিয়াছিলেন :—

"গত বারের আপনার—নিজেও দুটান টানে! বড় চমৎকার বড় উপভোগ্য হয়েছে। কালী ঘরামীও অনিন্দনীয়। প্রায় সকলগুলিই ভাল হইয়াছে।...

অমি আছি বৈ কি। লিখিতে বসিতেছি। শীঘ্রই পাঠাইয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িব—যেখানে দু চক্ষু যায়!...

আপনার পাকা হাতের হাল ধরা বজায় থাকিলে প্রবাস-জ্যোতিঃর আর যাই হোক ডুবিবার সম্ভাবনা নাই।..."

গ্রন্থাবলী

কেদারনাথের রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী মধ্যে সাল-তারিখযুক্ত যে ইংরাজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। রত্নাকর (অভিনয় কাব্য)। দক্ষিণেশ্বর, ১৩০০ সাল (১২-১০-১৮৯৩)। পৃ. ৯৩।

২। **গুপ্তরত্নোদ্ধার** বা প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ। দক্ষিণেশ্বর, বৈশাখ ১৩০১ (ইং ১৮৯৪)। পৃ. ৩০৪।

৩। **কাশীর-কিঞ্চিৎ** (রসকবিতা)। বড়দিন, ১৩২২ সাল (ইং ১৯১৫)। পৃ. ১০২।

পুস্তকের আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকার-হিসাবে "শ্রীনন্দী শর্ম্মা" এই ছদ্ম নাম আছে। ১৩৪৭ সালে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটি পরিবর্দ্ধিত।

৪। **কাশী সঙ্গীতাঞ্জলি** ১৩২৩ সাল।

নন্দী শর্ম্মার এই পুস্তিকাখানি ১৩৪৭ সালে প্রকাশিত ৪র্থ সংস্করণ 'কাশীর-কিঞ্চিৎ'এর সহিত পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। **জীবনের ভ্রম** [জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯]।

ইহা ছেলেদের জন্য লেখা। ১৩২৯ সালের ভাদ্র-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্র ইহার সমালোচনা করেন।

৬। **চীনযাত্রী** (ভ্রমণ)। ইং ১৯২৫ (ভাদ্র ১৩৩২)। পৃ. ১৮৭।

ইহা প্রথমে কাশী হইতে প্রকাশিত 'প্রবাস-জ্যোতিঃ' পত্রে আরম্ভ হইয়া শেষ হয় 'অলকা'য় (১৩২৮, ফাল্গুন—১৩৩০, বৈশাখ)

৭। **শেষ খেয়া** (উপন্যাস)। ইং ১৯২৫, মহাষ্টমী ১৩৩২। পৃ. ১৭৯।

৮। **আমরা কি ও কে** (লিপি-চিত্র)। বৈশাখ ১৩৩৪ (২৪-৪-১৯২৭)। পৃ. ১৯৩।

সূচী: আমরা কি ও কে, আনন্দময়ী দর্শন, দেবী-মাহাত্ম্য, পুরসুন্দরী, মুক্তি, ভগবতীর পলায়ন, আমাদের সন্‌ডে-সভা, থাকো, বিবর্ত্তন।

৯। **কবলুতি** (লিপি-চিত্র)। বৈশাখ ১৩৩৫ (১-৬-১৯২৮)। পৃ. ১৮২।

স্বচী : কবলুতি, দিল্লীর লাড্ডু, পঞ্জিকা-পঞ্চায়েৎ, দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি, আমাদের সনডে-সভা (২), পেন্‌সনের পর, পূজার প্রসাদ, স্মরণে, ছাতু।

১০। **কোষ্ঠীর ফলাফল** (উপন্যাস)। আশ্বিন ১৩৩৬ (১৩-৯-১৯২৯)। পৃ. ৫০৮।

ইহা প্রথমে 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত হয়। ১৩৩০, মাঘ-সংখ্যায় স্বরু হইয়া শেষ হয় ১৩৩৫, শ্রাবণ-সংখ্যায়।

১১। **পাথেয়** (গল্পসমষ্টি)। [কার্ত্তিক] ১৩৩৭ সাল (ইং ১৯৩০)। পৃ. ১৮৫।

সূচী : দূরের আলো, ধম্মা, হাক, অন্নপূর্ণা, দুর্ভিক্ষের দান।

১২। **ভাদুড়ী মশাই** (উপন্যাস)। দেবী-পক্ষ ১৩৩৮ সাল (১৫-১০-১৯৩১)। পৃ. ৩২৯।

ইহা প্রথমে 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়: স্বরু হয় ১৩৩২, জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায়; শেষ হয় ১৩৩৭, পৌষ-সংখ্যায়।

১৩। **দুঃখের দেওয়ালী** (গল্পসমষ্টি)। শ্রাবণ ১৩৩৯ (২৩-৮-১৯৩২)। পৃ. ২০৩।

স্বচী : মূল্যদান, নন্দোৎসব, বিচিত্রা, লক্ষ্মীছাড়া, ব্যথার-ব্যথী, কালী ঘরামী, রেল্‌-দুর্ঘটনা, স্ববুদ্ধি উড়ায় হেসে, জাগৃহি, সব্জি-ফল, নিষ্কৃতি, শান্তিজল।

১৪। **উড়ো খৈ** (রহস্য কবিতা)। জন্মাষ্টমী ১৩৪১ (১৩-৯-১৯৩৪)। পৃ. ৬৩।

১৫। **আই হাজ** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৪২ (১৪-৯-১৯৩৫)। পৃ. ৩১৩।

ইহা প্রথমে 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয ; সুরু হয—১৩৩৬, কার্ত্তিক-সংখ্যায ; শেষ হয—১৩৪১, জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায।

১৬। **পাওনা** (উপন্যাস)। মে, ১৯৩৬ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩)। পৃ. ২৬৬।

ইহা প্রথমে 'উত্তরা'য প্রকাশিত হয।

১৭। **মা ফলেষু** (গল্পসমষ্টি)। আশ্বিন ১৩৪৩ (২-১১-১৯৩৬)। পৃ. ১৮৪।

সূচা : মা ফলেষু, দাদার দুরভিসন্ধি, দান-পত্র, নামরূপ, ভাগাই মূল, প্রবন্ধ-বিপত্তি, অদ্বিতীযের ফ্যাসাদ, রকম ফের, মধুরেণ।

১৮। **সন্ধ্যাশঙ্খ** (গল্পসমষ্টি)। আশ্বিন ১৩৪৭ (২৬-১১-১৯৪০)। পৃ. ১৬৮।

সূচী : ১। দেবা ন জানন্তি—(ক) সুরমার দন্তশূল, (খ) সজ্জন সঙ্গ, (গ) বিলেটিভ্, (ঘ) শান্তিপর্ব্ব ; ২। ভোলানাথের উইল ; ৩। মাযের অনুগ্রহ ; ৪। দাদার শ্বশুরবাড়ী ; ৫। স্নেহের চাঁদ ; ৬। চাটুয্যে সংবাদ ; ৭। কালাচাঁদের চতুর্বর্গ ; ৮। দেবদাসের দুর্গোৎসব ('কবলুতি'তে "পূজার প্রসাদ" নামে মুদ্রিত)।

১৯। **সংক্ষিপ্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথা** (কাব্য)। ১লা জানুয়ারি ১৯৪৩। পৃ. ১২।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু উৎসব উপলক্ষে রচিত ও বিতরিত।

২০। **নমস্কারী** (গল্পসমষ্টি)। ব্রতপক্ষ ১৩৫১ (৪-৯-১৯৪৪) পৃ. ১১৪।

সূচী : মাথুর, অপরূপ কথা, নিতাই লাহিড়ী, বেথান বিভীষিকা, লুপ্তোদ্ধার, খুড়োর পরলোক-দর্শন, বিদ্যুৎবরণ, না-মঞ্জুর গল্প।

২১। **স্মৃতি-কথা**। কার্ত্তিক ১৩৫২ (ইং ১৯৪৫)। পৃ. ১৪৮

সূচী : মীবাটে, জব্বলপুর প্রবাসে, দেবতা বদল, নগদ বিদায, শিল্পীব বেদনা, লছমন ঠাকুব, পাঁচালী, চীনের নিদ্রাভঙ্গ, চীনের স্মৃতি।

২২। **হিসেব-নিকেশ** (কথা চিত্র)। ভাদ্র ১৩৫৮। পৃ. ১৯৫+৵০।

"হিসেব-নিকেশ" ১৩৫২-৫৪ সালেব 'ভাবতবর্ষে' ধারাবাহিকভাবে বাহির হইযাছিল ; ভগ্নস্বাস্থ্যে লিখিত ইহার শেষ দু-একটি অধ্যায় তাঁহাব মনঃপূত না হওযায উপন্যাসটি 'ভারতবর্ষে' সমাপ্ত হয নাই। ইহাব শেষাংশ সংক্ষেপে লিখিযা বাখিযা গিযাছিলেন।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা।—কেদারনাথের কোন কোন রচনা এখনও 'সংসারদর্পণ', 'ভারতবর্ষ', 'উত্তরা' 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে,—পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ "মোহ মুক্তি" নাটকের উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইহা ১৩৪৬ সালের পৌষ-চৈত্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৯৪-৯৫ সালে 'সংসারদর্পণে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত "সৎমা" উপন্যাসটিও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই। 'সংসারদর্পণে' কেদারনাথের আরও দুই-একটি ধারাবাহিক রচনা বাহির হইয়াছিল।

সাহিত্য-সেবার পুরস্কার

নির্লোভ নিরহঙ্কারী কেদারনাথ একান্তে বাণীসাধনা করিতে ভালবাসিতেন, পুরস্কার বা প্রশংসার কাঙাল তিনি ছিলেন না। তথাপি তাঁহার দেশবাসী নানা ভাবে নানা সময়ে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য।

ইং ১৯২৭, ডিসেম্বর: প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের মীরাট-অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি।

১৯২৯, ডিসেম্বর: প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের নাগপুর-অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি।

ইং ১৯৩৩: কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জগত্তারিণী-স্বর্ণপদক প্রাপ্তি।

১৯৩৩, ডিসেম্বর: গোরখপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের ১১শ অধিবেশনে কেদারনাথের জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে তাঁহার উক্তি উদ্ধারযোগ্য:—

"গোরোখপুব-যাত্রার পথে কাশীতে 'অভিনন্দনে'র আভাস পাই। চিরদিন চাকরি করেছি,—সার্টিফিকেটই বুঝি। আমার, ভবিষ্যৎ না থাকলেও, জন্মান্তব তো আছে। সম্মেলনেব ও স্বতন্ত্রভাবে মহিলা-সম্মেলনের পক্ষ হইতে আমার কন্যাস্থানীয়া শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর হস্ত হইতে কৃতজ্ঞ অন্তরে দুইখানিই গ্রহণ কবি। তাঁদেব আন্তরিক ভালবাসাপূত পত্রদ্বয় যে আমাকে কতটা ও কি দিলে এবং কতটুকু উপলক্ষ্য ক'রে, সেটা আমার দেবতাই জানেন।—এদের পশ্চাতে যখন কতকগুলি শাল-ঢাকা রুপোর দান-সামগ্রী উপস্থিত হ'ল, তখন অবাক্ হয়ে ভাবলুম—'এত বড় ভুলও করে! দু-দিন সবুর সইল

না ?—সাহিত্যিকেব ঘটাব ষোড়শও হ'ত, শোভনও হ'ত, নতুন কিছুও হ'ত।'"

ইং ১৯৩৪, ডিসেম্বর : প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনেব কলিকাতা-অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি।

১৯৪১, ডিসেম্বর : প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের কাশী-অধিবেশনে মূল সভাপতি। অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার লিখিত অভিভাষণ মহেন্দ্রচন্দ্র রায় কর্তৃক সম্মেলনে পঠিত হয়।

ইং ১৯৪৮ : ১৩৫৪ সালের ১৫ই চৈত্র তাবিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পূর্ণিয়ায় তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন।

মৃত্যু

১৩৫৬ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ, সোমবার শেষ বাত্রে (২৯ নবেম্বর ১৯৪৯) কেদারনাথ পূর্ণিয়ায় কন্যার গৃহে পবলোকগমন করেন। মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর হইয়াছিল। জীবন-সায়াহ্নে বিপত্নীক কেদারনাথ বিধবা কন্যা ও দৌহিত্রদের লইয়া প্রধানতঃ পূর্ণিয়ায় কাটাইয়াছেন। তাঁহার "অন্তিম বাসনা" তিনি একটি কবিতায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কবিতাটি এইরূপ :—

ওগো মোর বাংলার ভাই, ক্ষণেক দাঁড়াও বন্ধু,
ভাল ক'রে দেখি,
আজ মোর বিদায়ের দিন।
শত চক্ষু নাই,
থাকিলেও শক্তি তার ক্ষীণ।
ইচ্ছাই প্রবল মোর, তারি প্রেরণায়
বহু আশে আসিয়াছি বিদায়-ভিক্ষায়।

যা দেখেছি যা পেয়েছি তাই মোর ঢের
পেতে হয় তোমাদেরি পাই যেন ফের।
নিজগুণে মনে রেখো—এই শেষ আশা,
হউক পাথেয় সেই সহভালবাসা।
জানি না কি গুণে বল, "দাদামহাশয়"
সেও তোমাদেরি দান—সঙ্গে যেন রয়।
যা দিয়েছ পেয়েছি তা, চলিলাম রাখি
তোমাদেরি শুভকামী—তোমাদেরি থাকি।

কেদারনাথ ও বঙ্গসাহিত্য

কেদারনাথ তাঁহার দীর্ঘ জীবনের সাহিত্য-সাধনার ফলে বঙ্গসাহিত্যকে ছোট-বড মোট বাইশখানি মুদ্রিত পুস্তক উপহারও দিয়াছেন। ইহার প্রথম দুইখানি—'রত্নাকর' (পৌরাণিক নাটক) ও 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' (কবিগান-সংগ্রহ) ব্যতীত বাকী সতরোখানি সম্পূর্ণ এক সুরে গ্রথিত। এইগুলি হাসি, ব্যঙ্গ করুণা ও কান্নার সংমিশ্রণ। বাংলা সাহিত্যে এই এক বিচিত্র মিশ্র রসের আমদানি কেদারনাথের কৃতিত্বের পরিচায়ক। 'কাশীর-কিঙ্কিণী' 'কাশী সঙ্গীতাঞ্জলি' ও 'উড়ো খৈ'এ ছন্দের মারফতে, 'চীনযাত্রী'তে দেশভ্রমণ বর্ণনায় এবং বাকী বইগুলিতে কাহিনী ও কথা-চিত্রের মধ্য দিয়া সেই একই সম্মিলিত রস তিনি পরিবেশন করিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টি একই রসের ভিয়ানে পাক করা। এইগুলির মূল উপকরণ সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী—তাহাদের সুখ-দুঃখ, হীনতা-দীনতা-সঙ্কীর্ণতা, আশা-আনন্দ, আপদ-বিপদ, আশঙ্কা-আকাঙ্ক্ষা, পূজা-পার্ব্বণ। যে সহানুভূতির আলোকে ইহাদিগকে তিনি

দেখিয়াছেন, হাসি ব্যঙ্গ ও করুণ রসের সহায়তায় পাঠককে তাহা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন ; সহজ অনাড়ম্বর প্রকাশে তাঁহাব শিল্পসৃষ্টি সার্থক হইয়াছে।

"কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকীর্ত্তি সীমাবদ্ধ গণ্ডীর উপরেই আকাশচুম্বী হইয়া উঠিয়াছে ; কলিকাতার আশে-পাশের বংশপরম্পরায় কেরানীকুলকেই তিনি সাহিত্যে নবজন্ম ও নূতন মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। তাহাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা হাস্য-পরিহাস লইয়াই সাহিত্যের রেল পথে তাঁহার ডেলি-প্যাসেঞ্জারি এবং ক্যান্‌ভাসারি। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন উচ্চবিত্ত, রবীন্দ্রনাথ যেমন বুদ্ধিজীবী এবং শরৎচন্দ্র যেমন নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালীদেব লইয়া সাহিত্য-সংসার রচনা করিয়াছেন কেদারনাথ তেমনই দরিদ্র বাঙালী কেরানীদের লইয়া এক নূতন সংসার গঠন করিয়াছেন ; সেই রাজ্যের বাসিন্দারা কি ও কে, তাহা তিনি চিরদিনের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের ভাষা স্বতন্ত্র, রসিকতা স্বতন্ত্র। কেদারনাথ এবং তাঁহাব সৃষ্টি এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত যে ভবিষ্যৎ সমালোচকের মনে এই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক—কেদারনাথ ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, না, ইহাবা কেদারনাথকে সৃষ্টি করিয়াছে ?" ('শনিবারে চিঠি')

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৭৭

চণ্ডীচরণ সেন
নিত্যকৃষ্ণ বসু

চণ্ডীচরণ সেন
নিত্যকৃষ্ণ বসু

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

চণ্ডীচরণ সেন

১৮৪৫—১৯০৬

বংশ-পরিচয় ঃ শিক্ষা

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে বাখরগঞ্জ জেলার বাসণ্ডা গ্রামে এক মধ্যবিত্ত বৈদ্য-পরিবারে চণ্ডীচরণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নিমচাঁদ সেন ও মাতার নাম গৌরী।

বাল্যকাল হইতেই পড়াশুনায় চণ্ডীচরণের অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যাইত। গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ হইলে, ইংরেজী শিক্ষা-লাভের জন্য তাঁহাকে বরিশাল পাঠানো স্থির হয়। বংশের এক মাত্র দুলাল দূরে থাকিলে গৃহ একেবারে শূন্য বোধ হইবে, এই ভাবিয়া গৌরী দেবী স্বগ্রামস্থ চন্দ্রমোহন দাস-সুশ্রীবের সাত বৎসরের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়ে বধূকে ঘরে আনেন।

চণ্ডীচরণ ১৮৫৬ সনে বরিশালের গবর্মেণ্ট স্কুলে যোগদান করেন এবং ১৮৬৩ সনে এনট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি কিছু দিন কলিকাতায় সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করিবার পর ফ্রি চার্চ ইনষ্টিটিউশনে প্রবেশ করেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আনুকূল্যে তাঁহার কলেজের বেতনের সংস্থান হইত। এই ভাবে কিছু দিন চলিবার পর কতকটা শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ—অর্থাভাবেও বটে, তিনি কলেজ

ছাড়িয়া স্বগ্রামে পিতার নিকটে ফিরিয়া আসেন। কয়েক মাস গ্রামে কাটাইয়া লোয়ার গ্রেড স্কলারশিপ পরীক্ষা দিতে মনস্থ করিয়া চণ্ডীচরণ ঢাকায় উপস্থিত হন। তথায় ছাত্র পড়াইয়া তাঁহাকে কায়ক্লেশে জীবিকা অর্জন করিতে হইয়াছে। এই দুঃখকষ্টের মধ্যে তিনি কেবল আইনই অধ্যয়ন করেন নাই, স্থানীয় লাইব্রেরিতে যখনই যে পুস্তক পাইয়াছেন, তাহাই সযত্নে পাঠ করিয়াছেন। ১৮৬৮ ও ১৮৬৯ সনে চণ্ডীচরণ যথাক্রমে লোয়ার গ্রেড ও হায়ার গ্রেড স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৮৬৭ হইতে ১৮৭০ সন পর্য্যন্ত ঢাকায় ছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বরণ

বরিশালে অধ্যয়নকালে চণ্ডীচরণ উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মদিগের সহিত মিশিতেন। রামতনু লাহিড়ী তাঁহার একজন শিক্ষক ছিলেন। গিরিশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি তখন বরিশালে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। সংস্কারক দুর্গামোহন দাস তখন বরিশালে ওকালতি করিতেন। এই সময় হইতেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে চণ্ডীচরণের অনাস্থা জন্মে। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি তথাকার ব্রাহ্মমণ্ডলীর সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে তিনি অতিশয় ভক্তি করিতেন। ১৮৭০ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারি তিনি পূর্ব্ব-বাঙ্গলা সমাজগৃহে বিজয়কৃষ্ণের নিকট প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই সময় তিনি তাঁহার রোজনামচায় লিখিয়াছেন :—

"The religion, which has been purchased by the tears of my father, shall be strictly followed by me, at any cost and any sacrifice."

কুচবিহার-বিবাহের (মার্চ ১৮৭৮) ফলে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল দ্বিধাবিভক্ত হইলে চণ্ডীচরণ কেশবচন্দ্রের দল ছাড়িয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠাতাদের দলে যোগদান করিয়াছিলেন।

সরকারী চাকুরী

চণ্ডীচরণ ঢাকায় আইন-ব্যবসায় সুরু করিলেন বটে, কিন্তু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। জীবনযুদ্ধ দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। তিনি রোজনামচায় লিখিয়াছেন :—"গত কয়েক মাসের আয়-ব্যয় দেখিয়া মনে হয়, ভবিষ্যতে অনাহারে মরিতে হইবে। যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিত, আমি এত দিনে পাগল হইয়া যাইতাম। ভবিষ্যতে কি আছে জানি না, তবে যে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর জীবনের নানা পরীক্ষায় আমায় উত্তীর্ণ করিয়া অনিয়াছেন, তিনি আমাকে কদাপি পরিত্যাগ করিবেন না।

১৮৭৩ সনের ২১এ মার্চ তিনি বরিশালে একজন অতিরিক্ত মুন্সেফের পদ লাভ করেন। পর-বৎসর মে মাসে তিনি ২৪-পরগণার বারুইপুরের স্থায়ী মুন্সেফ হন। মুন্সেফ ও সাবজজ-রূপে তিনি সাহাজাদপুর, মাণিকগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, যশোহর প্রভৃতির স্থানে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার অবসরকাল পড়াশুনা, উপাসনা ও প্রচারকার্য্যে ব্যয়িত হইত। তিনি যেখানেই গিয়াছেন তথায় ব্রাহ্মসমাজ, সাপ্তাহিক উপসনা-সভা অথবা স্কুল স্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছেন। কলিকাতায় রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে তিনি বরিশালে ঐরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করিয়াছিলেন।

৫৫ বৎসর পূর্ণ হইলে, ১৯০০ সনের ১৬ই জানুয়ারি চণ্ডীচরণ সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বিচারকার্য্যে তিনি যথেষ্ট স্বাধীনচিত্ততা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিলেও, একটি গুরুতর অবিবেচনা-প্রসূত উক্তির জন্য তাঁহাকে বিশেষ নিন্দাভাজন হইতে হইয়াছিল। যদিও তাঁহাব কন্যা কামিনী রায় লিখিয়াছেন:—"যশোহর ও নদীয়া থাকিতে বিধবাদিগের সম্পত্তি সম্বন্ধে তাঁহাকে অনেক মোকদ্দমার বিচার করিতে হয়। ইহাতে হিন্দু বাল্যবিধবাদিগেব চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার অন্য প্রকার ধারণা জন্মে।......তাঁহার উক্ত ধারণা তিনি তাঁহার এক রায়ে প্রকাশ করিয়া দেশে অনেকেরই বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কিছু মাত্র বিচলিত হন নাই। সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা বলিতে তিনি সঙ্কুচিত হইতেন না।" কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্য ও সমাজ-নেতারা চণ্ডীচরণের এই বায়টিকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচারে' (শ্রাবণ ১২৯৫) যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"কৃষ্ণনগরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় তাঁহার একটি রায়ে লিখিয়াছেন, হিন্দু বিধবাদিগের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন অসতী। আমাদের একটি গল্প মনে পড়িল। গুরুদেব শিষ্যালয়ে গিয়াছেন, আদর অভ্যর্থনার পর যথাসময় শিষ্য রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিল। ঝোল রাঁধিতে বড় বড় দশটি কই মাছ আনিয়া দিল, অভিপ্রায় গুরুদেবের সেবা হইবে, অবশিষ্ট শিষ্যসহ স্ত্রী-পুত্র প্রসাদ পাইবেন। রন্ধন শেষ হইল, গুরুদেব ভোজনে বসিলেন। ঝোলে নুন, ঝাল সমান হইয়াছিল, একটি একটি করিয়া অমৃতবোধে গুরুদেব নয়টি মাছ খাইয়া ফেলিলেন। তখন তিনি অম্ল রসাস্বাদে

প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে কিন্তু গুরুদেবের কার্য্য শিষ্যের ভক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল, সে জিদ্ করিয়া বলিল,—'এখন অম্বল থাকুক, আগে ও-মাছটি খান।' গুরুদেব কিন্তু কিছুতেই স্বীকার পাইলেন না। শিষ্য তখন যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—'উটি যদি না খান, ত আপনার বেটার মাথা খান।' আমরাও চণ্ডীবাবুকে অনুরোধ করি, যদি নিরানব্বইটির মাথাই খাইলেন, তবে আর একটি রাখিয়া ফল কি? আর একবার রায় লিখিয়া উটিকেও টানিয়া লউন।"

সাহিত্য-সাধনা

চণ্ডীচরণ বাংলা রচনায় প্রথম হস্তক্ষেপ করেন—১৮৮৩ সনে। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা হিসাবেই তাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যে সুবিদিত। কামিনী সেন (রায়) পিতার জীবনকথায় লিখিয়াছেন :—"টম্‌কাকার কুটীর লিখিতে লিখিতে তাঁহার মনে হইল, মিসেস বীচার ষ্টো তাঁহার এই গ্রন্থ রচনা করিয়া আমেরিকার দাসত্ব-প্রথার জঘন্যতা তাঁহার সরস চিত্রে যেরূপ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, সেইরূপ করিয়া এদেশের কুপ্রথা ও কুশাসন সকলের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাস আবশ্যক। এই চিন্তা হইতে তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সূত্রপাত হয়। এতদর্থে তিনি নানা স্থান হইতে ঐতিহাসিক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন।......এই সকল পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাসের সহিত ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার" ('শ্রাদ্ধিকী', পৃ. ১৯-২০)। আমরা চণ্ডীচরণের গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি, বন্ধনী-মধ্যে ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত :—

১। **লঙ্কাকাণ্ডং** (বিদ্রূপাত্মক কাব্য)। ইং ১৮৮৩।

পুস্তকখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'নব্যভারত' (ফাল্গুন ১২৯০) যাহা লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে পুস্তকের বিষয়বস্তুর আভাস পাওয়া যাইবে :—

"মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ডং, শ্রীযুক্ত হবীবর বেদান্তবাগীশেন অনুবাদিতং। এখানি রামায়ণ বটে, কিন্তু ইহার নায়ক সেই প্রাচীন সময়ের রাম নহেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে রাম-রাবণে যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহারই কাহিনী ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, পুস্তকখানি ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ। তৈলিকনন্দন প্রভৃতির চিত্রগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে। রাম যে কোন ব্যক্তির নাম, তাহা নহে। দেশের এক শ্রেণীকে রাম বলা হইয়াছে। ইহাতে পুস্তকের কিছু সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে। এই পুস্তকখানির ভাষা কিছু প্রাচান ধরণের হইয়াছে, এই জন্য সকলের নিকট ভাল লাগিবে না।··সহজ বাঙ্গালায় এ পুস্তকখানি লিখিত হইলে অনেকের উপকারে আসিত। কারণ, ইহা উপযুক্ত সময়ের উপযুক্ত জিনিষ। বর্ত্তমান সময়ের রাজনীতির অনেক কূটতত্ত্ব ইহাতে সমালোচিত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে আড়ম্বরপ্রিয় বঙ্গসমাজের বিলক্ষণ উপকার হইবে। গদ্য-ব্যঙ্গোক্তিতে রাজনীতি সমালোচনা বাঙ্গলা ভাষাতে আর হয় নাই। এ সম্বন্ধে এখানি বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছে।"

২। **টমকাকার কুটীর** (উপন্যাস)। ১২৯১ সাল (২০-১-১৮৮৫)।

পৃ. ৪৫৮

Uncle Tom's Cabin-এর অনুবাদ।

৩। **মহারাজা নন্দকুমার** (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ১২৯২ সাল (২৫-১২-১৮৮৫)।* পৃ ৩৯২+১৬

৪। **দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ** (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ইং ১৮৮৬ (১ জুন)। পৃ ১০৮

৫। **জীবন-গতি-নির্ণয়** (দার্শনিক সন্দর্ভ)। ইংরেজী ১৮৮৬ (৭ জুলাই)। পৃ. ৯০

ইহা প্রথমে ১২৯০ সালের 'নব্যভারতে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

৬। **অযোধ্যার বেগম** (ঐতিহাসিক উপন্যাস) :
১ম খণ্ড। ইং ১৮৮৬ (১০ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ১৫৭
২য় খণ্ড। ইং ১৮৮৬ (১৫ ডিসেম্বর)। পৃ. ৩৫৮

৭। **মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতা লর্ড মেটকাফের সংক্ষিপ্ত জীবনী**। ইং ১৮৮৭ (৩০ মে)। পৃ. ২৩৬+২২+২

৮। **ঝান্সীর রাণী** (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। (১৩-৭-১৮৮৮)। পৃ. ৩৮০

৯। **এই কি রামের অযোধ্যা** (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ইং ১৮৯৫ (২১ এপ্রিল)। পৃ ২৬৪+৬

১০। **ভারতবর্ষের ইতিহাস** (পাঠ্য)। (১-৯-১৮৯৭)। পৃ. ৬৫

১১। **চল্লিশ বৎসর** (টলষ্টয়-প্রণীত উপন্যাসের অনুবাদ)। ১৩১০ সাল (২৫-১-১৯০৪)। পৃ. ১০৬

চণ্ডীচরণের গল্প বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল; ইহার সহিত তাঁহার তেজস্বিতা ও স্বদেশপ্রেমিকতা মিলিত হওয়াতে তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি এক দিকে যেমন জনসাধারণের প্রিয় হইয়াছিল, অন্য দিকে তেমনই সরকারের বিরাগভাজন হইয়াছিল। নন্দকুমার, অযোধ্যার বেগম ও ঝান্সীর রাণীর কাহিনী-প্রণেতাকে বাঙালী কোন দিনই ভুলিতে পারিবে না।

মৃত্যু

চণ্ডীচরণের শেষ জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হইতে পারে নাই। শোক-ঝঞ্ঝা বার বার তাঁহাকে আঘাত করিয়াছে। ১৯০৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে তৃতীয়া কন্যা প্রেমকুসুম এবং ইহার তিন বৎসর যাইতে-না-যাইতে নবপরিণীত জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্রমোহনের অকালমৃত্যু তাঁহার ভগ্ন-জীর্ণ শরীরের পক্ষে নিদারুণ হইয়াছিল; ইহার অল্প দিন পরেই—১৯০৬ সনের ১০ই জুন তাঁহার মৃত্যু হয়।

নিত্যকৃষ্ণ বসু

১৮৬৫—১৯০০

আমাদের যৌবনে 'সাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত "সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী" পাঠ করিয়া এক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের আনন্দ লাভ করিতাম এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অনুশোচনা মনে জাগিত যে, ডায়েরীর শক্তিশালী লেখক তাঁহার প্রতিভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। এই ডায়েরীর মাঝে মাঝে সাময়িক ও শাশ্বত সাহিত্য সম্পর্কে যে সুচিন্তিত মন্তব্য থাকিত, তাহা হইতে লেখকের রসিক-চিত্তের পরিচয় পাইতাম। তাঁহার রচিত বহু কবিতা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়া বহু কাব্য-রসিকের আনন্দবিধান করিত। অকালে খণ্ডিত এই প্রতিভার অধিকারীর জীবনী ও কীর্ত্তি আলোচনার বাসনা সেই কালেই জন্মিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার জীবনকথার যথোপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যতটুকু পারিয়াছি, তাহার সাহায্যেই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ সঙ্কলিত হইল।

জন্ম : শিক্ষা

আনুমানিক ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নিত্যকৃষ্ণ বসুর জন্ম হয়। কৃতী ছাত্র হিসাবে বিদ্যালয়ে তাঁহার সুনাম ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি তিনি সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ক্যালেণ্ডারের সাহায্যে পরীক্ষার ফল উদ্ধৃত করিতেছি :—

ইং ১৮৮১ : এনট্রান্স—প্রথম বিভাগ···মেট্রোপলিটান স্কুল ;
বয়স ১৬ বৎসর ৬ মাস

১৮৮৩ : এফ. এ.—প্রথম বিভাগ··· মেট্রোপলিটান

১৮৮৬ : বি. এ. (সংস্কৃত অনার্স)—দ্বিতীয় বিভাগ···ঐ

১৮৮৯ : এম. এ. (ইংরেজী)—তৃতীয় বিভাগ··· ঐ

চাকুরী

নিত্যকৃষ্ণ ইংরেজী-সাহিত্যে পারঙ্গম ছিলেন। তাঁহার অবসর-কাল গভীর অধ্যয়নেই ব্যয়িত হইত। মাতৃহারা একটি শিশুপুত্র ছাড়া সংসারে তাঁহার বিশেষ কোন অবলম্বনই ছিল না। তিনি কোন্নগর ইংরেজী স্কুলে হেড-মাষ্টারি করিতেন।

সাহিত্য-সাধনা

অল্প বয়স হইতেই নিত্যকৃষ্ণ মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। সাহিত্য-জীবনের সূচনার কথা তিনি ডায়েরীতে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

"২৪ শে শ্রাবণ [১৩০১]। আমার কাব্য-চর্চ্চার বয়ঃক্রম বড় বেশী নহে। বাল্যকালে প্রচলিত সঙ্গীতসকলের সুরের অনুকরণ করিয়া কখনও কখনও গীতি রচনা করিতাম বটে, কিন্তু উহার কারণ নিজের মনের মতন গান গাহিবার অভিলাষ, প্রকৃত কাব্যানুরাগ নহে। একখানা গানের খাতা ছিল ; উহার ভিতর অপরাপর সঙ্গীতের সহিত নিজের রচনাগুলিও লিখিয়া রাখিতাম। তখনকার রুচিটা বড় বিশুদ্ধ

ছিল না। একটু বর্দ্ধিত বয়সে এক দিন সেই যত্নরক্ষিত খাতাখানার আলোচনা করিতেছিলাম। গানগুলির ধরণ দেখিয়া নিজেরই লজ্জা করিতে লাগিল। একে একে সমগ্র পত্রগুলি ছিঁড়িয়া অগ্নিদেবকে উপহার দিলাম। তার পর কয়েক বর্ষ নীরবে কাটিয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু কি শুভ ক্ষণেই ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষায় কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের *Excursion* কাব্যের প্রথম সর্গ পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমার প্রাণের সেই পুরাতন অনাদৃত উৎস নব ভাবে নব গৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে আজ ১০।১১ বৎসরের কথা। সেই সময় হইতে কত ঝড় এই মস্তকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। কত সময়ে এই প্রয়োজনশূন্য জীবনের বন্ধন পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলিবার বাসনা হইয়াছে। কিন্তু কবিতা আমাকে একবারে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। মাঝে মাঝে বিষাদের জলদরাশি অপসারিত করিয়া তাহার প্রশান্ত সান্ত্বনাময় সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তি হৃদয়-গুহায় প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছে। আমি তাহারই স্বর্গীয় আশ্বাসে এই দুর্ব্বহ জীবনকে এত দূর টানিয়া আনিতে পারিয়াছি।

২৫ শে শ্রাবণ। বঙ্গীয় কবি হেমচন্দ্রের রচনা ও মহাকবি মাইকেলের কাব্যগুলি পাঠ করিয়াই আমার সাহিত্য-জীবনের আরম্ভ হইয়াছিল। বোধ হয়, সর্ব্বাগ্রে 'মেঘনাদবধ' পাঠ করি। অপরিণত-বুদ্ধি বালক তখন মাইকেলের মহত্বে কেবল অভিভূত হইয়া পড়িত, প্রাণের ভিতর ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারিত না। তৎপরে 'বীণা' নামক পত্রিকায় 'সারদামঙ্গলে'র সমালোচনা পাঠ করিয়া উহার প্রতি আমার অনুরাগ আকৃষ্ট হইলে, এক খণ্ড ক্রয় করিয়া পড়িতে আরম্ভ করি। ইহাই আমার বাঙ্গালা কাব্যপুস্তক-ক্রয়ের সূচনা। এখন স্মরণ হইতেছে,

ইতিপূর্ব্বে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'অবসর-সরোজিনী' এক বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া পাঠ করিয়াছিলাম। তখন রাজকৃষ্ণ বাবুর কবিতা বড়ই মধুর লাগিত। মনে হয়, তাঁহার "শারদীয় জলদ" শীর্ষক 'আর্য্যদর্শনে' প্রকাশিত একটা কবিতায় মুগ্ধ হইয়া, উহা নিজহস্তে একখানা কাগজে লিখিয়া লইয়া, তখনকার দুই-এক জন বন্ধুকে শুনাইয়াছিলাম। তাঁহারা কাব্যরসের তেমন অনুরাগী ছিলেন না। তাঁহাদের বিরক্তি দেখিয়া প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইত। 'সারদামঙ্গল' পাঠ করিয়া রাজকৃষ্ণের প্রতি সেই অনুরাগ কোথায় ভাসিয়া গেল। মধুকর পুষ্পবিহীন দেশে আসিয়া পড়িলে অতিকষ্টে মৃত্তিকা হইতেও মধুসঞ্চয় করে। কারণ, মধু নহিলে তাহার দিন চলে না। কিন্তু বিবিধ কুসুমগন্ধে সুবাসিত চিরবসন্তময় কোন উদ্যানের সন্ধান পাইলে তাহার যে আনন্দ, যে অসীম উচ্ছ্বাস, তাহা কে বর্ণনা করিবে? ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের উদয় হইয়াছিল; কিন্তু আমি তাঁহার কোনও খবর পাই নাই। ক্রমশঃ তাঁহার সহিত পরিচিত হইলাম। প্রথম প্রথম সর্ব্বস্থলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম না। তথাপি সেই উদীয়মান রবির অপূর্ব্ব আলোকে আমার হৃদয়াকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র সম্প্রদায় কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

২৬ শে শ্রাবণ। পুরাতনের জীর্ণকুটীর হইতে হঠাৎ নূতনের বিস্তীর্ণ সৌন্দর্য্য-গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথকেই বাঙ্গালার বর্ত্তমান কবিকুলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু সে মোহ বেশী দিন স্থায়ী হইল না। আমার প্রথম-প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থে রবীন্দ্রের পদ্ধতি অনেকটা লক্ষিত হইবে। তবুও তখন তাঁহার এক-আধটা কবিতা মাত্র পাঠ করিয়াছিলাম। নূতন পদ্ধতির শিক্ষা আমি বঙ্গীয় কবি বিহারিলাল ও প্রধানতঃ ইংরাজী Romantic কবিদেগের নিকট প্রাপ্ত হই। Wordsworth, Shelley, Keats এবং Coleridge আমার

সাহিত্য-জীবনের আদিগুরু। মহাকবি সেক্ষপীয়র সকল প্রথারই সমাদর করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে সকল স্থলে Romantic পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমার সেইগুলিই বেশী ভাল লাগিত। এখন আর পুরাতনের উপর নূতনকে ততটা প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত নহি। সাধারণ মানবের অগোচর কবি-হৃদয়ের গূঢ়তম ভাবরাশি, রহস্যময়ী প্রকৃতির গভীরতম কাহিনী প্রকাশ করিতে হইলে নূতন প্রথাই যে অধিকতর উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা সাধারণ পাঠকের তাদৃশ্য আয়ত্তাধীন নহে। অথচ সাধারণের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিলে কোনও কাব্যেরই প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। তাই এখন আমি উভয় প্রথার সম্মিলনের পক্ষপাতী। ভাব বা চিন্তা যতই রহস্যময় হউক না কেন, ভাষায় প্রকাশ করিবার কালে তাহাকে যত দূব স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করিতে পারি, তাহাই বাঞ্ছনীয়।" ("সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী": 'সাহিত্য,' জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১)

গ্রন্থাবলী

আমরা নিত্যকৃষ্ণের লিখিত তিনখানি মাত্র পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি। এগুলির কালানুক্রমিক তালিকা:—

১। **মায়াবিনী** (কাব্য)। ১২৯২ সাল (১-৩-১৮৮৬)। পৃ. ৮১

"আমরা স্বর্গচ্যুত, সংসার আমাদের বিদেশ। এখানে থাকিয়া সংসারে ডুবিয়া, আমরা প্রকৃত রাজ্যের কথা বিস্মৃত হই। এবং শোভাময় প্রকৃতির পূজা করিলে, অনন্তের ভাব হৃদয়ে প্রস্ফুটিত থাকে;

ওয়ার্ডসোয়ার্থের এই ভাব লইয়া মায়াবিনী লিখিত। লেখা বেশ পরিপাটি।" ('নব্যভারত,' চৈত্র ১২৯৩)

২। **প্রেমের পরীক্ষা** (একাত্মক গদ্য-নাটক)। ১২৯৯ সাল। পৃ. ৪৭

গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন:—"বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম এ. উপাধিধারী এক জন যুবক সুহৃদ গ্রন্থকারের নিকট নিজ-জীবনের যে রহস্য বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র 'মনোড্রামা' বিরচিত হইল।"

৩। **ভবানী** (গল্প)। ভাদ্র ১৩২৬ (ইং ১৯১৯)। পৃ. ১২৭

ইহা প্রথমে ১ম বর্ষের 'সাহিত্যে' (১২৯৭, পৃ. ১৮৭-২১০) প্রকাশিত হয়।

রচনার নিদর্শন

নিত্যকৃষ্ণের গদ্য-পদ্য বহু রচনা 'সাহিত্য,' 'জন্মভূমি,' 'নব্যভারত প্রভৃতি মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল রচনার মধ্যে "সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী" (১৮৯৪ সনের) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; ইহা 'সাহিত্যে' (১৩১০-১১, ১৩১৩-১৫) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। নিদর্শন-স্বরূপ আমরা এই সকল রচনার দু'একটি উদ্ধৃত করিতেছি; এইগুলি হইতে নিত্যকৃষ্ণের সাহিত্য-প্রতিভার পর্যাপ্ত পরিচয় পাওয়া যাইবে।—

'প্রেমের পরীক্ষা' :

"এই নিশীথ আকাশ-তলে, জনশূন্য অরণ্যানীমধ্যে, তারকার স্নিগ্ধালোকে একাকী বসিয়া রহিয়াছি। সম্মুখে বৃক্ষপত্রচ্ছেদ-বিনিঃসৃত কৃশা জ্যোৎস্নাকিরণ-রেখাশ্রেণী বায়ুবশে কেমন সুন্দর নৃত্য করিতেছে! —অদূরে সমুদ্রাভিলাষিণী তরঙ্গিণীবক্ষ হইতে অব্যক্ত-মধুর কি আনন্দ-ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে!—দূরে তরুশীর্ষ সংস্পর্শী গগনাঙ্গনে, নৈশ পাপিয়ার প্রাণোন্মাদকারী সঙ্গীত, দিগ্বালার উদ্ভ্রান্ত হৃদয় বিকম্পিত করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে মেঘলোকে গিয়া কোথায় মিশাইয়া যাইতেছে!—অনন্ত লীলাময়ী তুমি প্রকৃতি!" (পৃ. ২৭)

"সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী" :

"২৭শে চৈত্র [১৩০০]। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার মূলতত্ত্ব (key-note) বাহির করিবার ভার যোগ্যতর লেখকদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া, আমি এখানে তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটা সামান্য সাদা কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছি। প্রথম কথা, তাঁহার উদ্ভাবিত লিখনপদ্ধতি। বিদ্যাসাগর-প্রমুখ লেখকদিগের ভাষা প্রাঞ্জল হইলেও সংস্কৃতবহুল। উহাতে যেন হ্রাস-বৃদ্ধি উত্থান-পতন নাই। সমতলবিহারিণী তটিনীর ন্যায় চিরদিন একই পথে একই ভাবে ধাবমান হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার প্রধান গুণ এই যে, সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য থাকিলেও উহা বিশুদ্ধ সাধারণ প্রচলিত বাঙ্গালার প্রাণের সহিত গাঁথা। একমাত্র দামোদর নদের গতিই উহার সহিত তুলনীয়া। দেশ ও কালভেদে উহার অবস্থাভেদ পরিলক্ষিত হয়। বালুকণার উপর দিয়া ধীরে ধীরে নীরবে বহিয়া যাইতেছে; আবার কখনও বা প্রলয়কালীন প্লাবনের ন্যায়, দুই পার্শ্ব পরিপ্লুত করিয়া গ্রাম নগর মাঠ প্রান্তর ভাসাইয়া দিয়া উত্তাল

তরঙ্গে, তাণ্ডবে নাচিয়া ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। এক কথায়, তাঁহার ভাষা সর্ব্বত্র ভাবেরই অনুগামিনী।"

"২০ শে বৈশাখ [১৩০১]। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার চন্দ্রশেখর উপন্যাসে স্বপ্নাবস্থায় শৈবলিনীর নরক-দর্শন-বর্ণনায় কি আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন? মহাকবি সেক্ষপীয়র Lady Macbeth-এর প্রায়শ্চিত্ত যেরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা তদপেক্ষা হীন নহে। যখন পিশাচেরা শৈবলিনীকে নরককুণ্ডে ফেলিয়া দিবে বলিয়া অতি ঊর্দ্ধ হইতেও ঊর্দ্ধতর লোকে লইয়া যাইতেছে তখনকার সেই বর্ণনা পাঠ করিলে, আর শৈবলিনী যখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িতেছে, তখনকার সেই অদ্ভুত চিত্র কল্পনা করিলে, আমাদের হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া যায়। অন্তরাত্মা নিবিড়, অতি ভীষণ অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। এই সকল বর্ণনা পাঠ করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালা শব্দশাস্ত্রের উপর কেমন অপূর্ব্ব আধিপত্য ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। মনে হয়, কোনও কথার নিমিত্ত তাঁহাকে যেন কখনও অপেক্ষা করিতে হয় নাই, তাঁহার ইচ্ছানুসারে লেখনী যেন আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বেই, অনুরক্তা দাসীর ন্যায় বাক্যগুলিকে বসাইয়া দিয়া গিয়াছে। যে সকল লেখকের তাদৃশ্য প্রতিভা নাই, একটা সামান্য ভাব প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে কতই সাধ্যসাধনা করিতে হয় কিন্তু মানব হৃদয়ের এমন কোন বৃত্তি নাই, মানব কল্পনার এমন কোনও লীলা নাই যাহা বঙ্কিমের ভাষায় সহজেই পরিস্ফুট না হইয়াছে।" ('সাহিত্য', অগ্রহায়ণ ১৩১০)

২৯শে শ্রাবণ [১৩০১]। বিচিত্র চিত্রগুলি বাদ দিয়া রবীন্দ্রের চিত্রাঙ্গদার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। বিদায় অভিশাপ নামক সুন্দর কবিতাটিও ইহার সহিত সংযুক্ত দেখিলাম। চিত্রাঙ্গদায় রবীন্দ্রের অমিত্রাক্ষর অনেকাংশে নির্দ্দোষ। ইহার স্থানে স্থানে ভাষা ও ভাবের

গাম্ভীর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। বিষয়টিও বেশ চিত্তাকর্ষক। মহাভারতের মহাকবির অমর চরিত্র দুইটিকে কোনও অংশে হীন না করিয়া, কবি ইহাদের উপর আপনার কবিত্ব ও গুণপনার বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রথম যখন গ্রন্থখানি পাঠ করি, মনে হইয়াছিল, ইহার বুঝি কোনও প্রকার গূঢ় উদ্দেশ্য নাই,—কেবল কতকগুলি সুন্দর চিত্রের সমাবেশ। কিন্তু পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া আমার ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছিল। কবি ইহাতে আদর্শ দাম্পত্য প্রেমের একটি ইতিহাস বর্ণিত করিয়াছেন। প্রেমের মূলে যে সৌন্দর্য্যানুভূতি ও আসঙ্গলিপ্সাই প্রবল, ইহাতে তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্য্যে মানুষের মন বেশী দিন শান্তিলাভ করিতে পারে না। আর সে শোভা স্থায়ীও নহে। প্রেমিক স্বীয় বাঞ্ছিতের শারীরিক সৌন্দর্য্যোপভোগে অতি অল্প দিবসেই নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে, আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের জন্য তাঁহার প্রাণ কাদিয়া উঠে। তিনি তখন বুঝিতে পারেন যে, কর্ম্মহীন বিলাসলীলা প্রেমের আদর্শ নহে। কর্ত্তব্যপালনের পথে আমাদের সাহচর্য্যই ইহার চরম উদ্দেশ্য। ইহাই প্রেমের বিষম পরীক্ষার সময়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে দম্পতী তাহাদের মিলন বজায় রাখিতে পারিলেন, তাহারাই ধন্য। কারণ, "শ্রান্তিহীন সে মিলন চিরদিবসের।" এইরূপে প্রথমতঃ সৌন্দর্য্যের মোহ, যৌবনের ভ্রান্তি, উপভোগের অরুচি, তৎপরে "ভূষণ-বিহীন" সত্যের অভ্যুদয়, ইহাই প্রেমের প্রকৃত ইতিহাস; যে কবি এই মহান ইতিহাস এমন সুন্দর ও মধুর করিয়া আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন, তিনি সহস্র সাধুবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই।

"ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ,
তখন প্রকাশ পায় ফল।"—

এই একটি মাত্র বাক্যে সমগ্র গ্রন্থের উপদেশ নিবদ্ধ রহিয়াছে।"
('সাহিত্য,' জ্যৈষ্ঠ ১৩১১)
"চৈতন্যের দেহত্যাগ" ঃ

১

নিশীথের শুভ্র মেঘাসনে
পূর্ণশশী শোভিছে গগনে ;
কিরণ-বসন পরা
শোভে সুপ্ত বসুন্ধরা
বসন্তের কুসুম-শয়নে।

২

শব্দহীন, স্তব্ধ চারি ধার,—
চিত্রে যেন সমুদ্র অপার !
শুধু দূরে কদাচিৎ
কম্পিত হ'তেছে গীত
উচ্চকণ্ঠে নৈশ পাপিয়ার।

৩

গভীর-গম্ভীর সব ঠাঁই ;—
সৌন্দর্য্যের আদি-অন্ত নাই।
নয়ন নিমেষহীন ;
আত্মহারা উদাসীন,
শূন্যমনে ফিরিছে নিমাই !

৪

গন্ধামোদে মুগ্ধ অতিশয়,
স্বপ্নভরা শান্ত সে নিলয় ;
যুগ-যুগান্তের কথা
অযুত বিস্মৃত ব্যথা
উচ্ছ্বসিয়া উঠে সমুদয় !

৫

কি নির্ঝর অন্তরে উথলে,
গোরা শুধু ভাসে আঁখিজলে ;
হৃদয়-বীণাতে তাঁর
কি সঙ্গীত অনিবার,
মুখে 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' শুধু বলে !

৬

সমুখে বিশাল শোভে হ্রদ ;
হেরে গোরা ভাবে গদগদ ;—
যেন কালিন্দীর নীর
অচল, স্তম্ভিত, স্থির ;
তাহে দিব্য নীল কোকনদ।

৭

তদুপরি স্থাপি' দু' চরণ
নাচে কালা বৃন্দাবন-ধন ;

অধরে মুরলী খেলা,
গলে দোলে বনমালা,
কটিতটে পীত আবরণ।

৮

"হা কৃষ্ণ। কপট, সুচতুর।
দয়া তব হ'ল কি নিঠুর।
এত দিন পরে, হায়,
এই সেই যমুনায়
দেখা আসি দিলে ।ক ঠাকুর।"

৯

প্রাণপদ্ম উঠিল বিকশি,
আজন্মের ঘুচিল তামসী,
যেন কোন্ মন্ত্রবলে
ঝাঁপিয়া পড়িলা জলে
অস্ত গেলা নদীযার শশী।

('সাহিত্য', অগ্রহায়ণ ১৩০১)

"প্রসূতির পূর্ব্বরাগ":

১

কে জানে কাহার লাগি ব্যাকুল বাসনা-বাশি।
কার আশে রয়েছি বাঁচিয়া।
নীরব মায়ের কোলে সুখের শৈশব-হাসি
কেবা সেই হাসিবে আসিয়া?

২

কেমন শিরীষ-সম কোমল মু'খানি তার !
　　কেমন সে নয়ন-কমল !
আগাগুলি বাঁকা-বাঁকা চিকণ কেশের ভার ;
　　ওষ্ঠ দুটি রক্তিম তরল !

৩

কেমন লাবণ্য-ঘেরা ননীর শরীরখানি,—
　　লতাটি আবৃত জোছনায় ;
কেমন সে অর্থভরা অফুট অমিয়-বাণী,—
　　বাণী-বীণা বচনের প্রায় !

৪

গোধূলির স্নিগ্ধকোলে সে কি গো উঠিবে তারা,
　　সন্ধ্যা তাই রয়েছে চাহিয়া ?
না—না ! সে যে প্রভাতের অরুণ-কিরণ-ধারা,
　　নিশি তাই উঠেছে জাগিয়া।

৫

বুঝি সে বিহগ-সম গাহিবে বসিবে ডালে ;
　　তরু তাই সেজেছে মধুর !
তাই বুঝি মধু ঋতু কচি কিশলয় জালে
　　উপবন রচেছে প্রচুর।

৬

বুঝি সে ফুলের মত ফুটিবে বিজন বাসে
সৌরভেতে ভরিয়া কানন ;
চুমো খেয়ে, গান গেয়ে দোলন দিবার আশে
আসে তাই মলয়-পবন।

৭

না—না! সে নন্দন-বায়ু, বসন্ত-রাগিণী তুলি
মেঘ-পথে আসিবে ভাসিয়া ,
সরল স্নেহের ছলে মন্দার-মুকুলগুলি
মার বুকে দিবে বিকশিয়া !

৮

উষার আলোকে তাব নিশার তমস নাশি
এ জীবন যেতেছে বহিয়া ,—
কে জানে কাহার লাগি ব্যাকুল বাসনারাশি।
কার আশে রয়েছি বাঁচিয়া !

('সাহিত্য', পৌষ ১৩০৩)

"উদ্দামসঙ্গীত" ঃ

অয়ি গঙ্গে ! আজি এই সরস শ্রাবণে
সঘন গগনতলে শ্যাম আস্তরণে
কি অপূর্ব্ব শোভা তোর ! বরষা-বিভবে
পরিপূর্ণ বরতনুখানি, কি গৌরবে

যৌবনতরঙ্গ' পরে তুলি আন্দোলন,
রাজরাজেন্দ্রাণী সম মহিমা আপন
প্রতি সৌম্যপদক্ষেপে করিছে প্রচার !
বহুদূরবিসর্পিত সলিলসম্ভার ;
শুভ্র ফেন-লেখা তাহে, ধূর্জ্জটির ভালে
শুভ্রকান্তি শশিকলা সম। মেঘমালে
দিগন্ত লম্বিতপ্রায়,—প্রসারিত কর
ব্যোমচারী করি যেন আলস্যমন্থর
স্নিগ্ধ শান্ত তৃপ্তিভরে গাঢ় আলিঙ্গনে
বুকে তোর পড়েছে হেলিয়া। ক্ষণে ক্ষণে
ঘনাইছে শ্যামছায়া, ঝরিছে সলিল,—
তপলোক-প্রান্ত হ'তে প্লাবিয়া নিখিল
ঋষিদের আশীর্ব্বাদধারা। পূর্ব্বতটে
মুহূর্ত্তে আবার, ঘননীল চিত্রপটে
স্তব্ধ বনশ্রেণীশিরে প্রশান্ত শোভায়
বিকশিছে পূর্ণশশী, রজত-প্রভায়,
উজলি বসনখানি বরষা-বধূর।
কভু ধীরে সমীরণ স্নিগ্ধ সুমধুর
আসিছে ভাসিয়া ; মনোবনবিহারিণী
প্রেয়সীর সুখস্পর্শসম উদাসিনী
বাসনারে, সোহাগের বেদনে ব্যথিয়া
করিছে বিহ্বলপ্রায় ; নিতেছে টানিয়া
কোন্ কল্পকুঞ্জগৃহ পানে। শিহরিত
সুপ্তশাখা ত্যজি কভু স্বপ্নবিজড়িত

বকুলকলিকাগুলি ঝরিছে আলসে ;
কভু বা পল্লব হ'তে বায়ুবেগবশে।
বনানীর অশ্রুরাশি স্নেহেব মতন
করিছে সান্ত্বনাসিক্ত সর্ব্ব দেহ মন।

এই সন্ধ্যাকূলে আজ ফুলেব সৌবভে,
পূর্ণিমা-কিরণে আর ঊর্ম্মিকলরবে
মনে হয় মিথ্যা সব , মিথ্যা এ সংসার,
সুখে দু খে মোহে গড়া বিডম্বনা তাব।
সত্য শুধু ওই স্নিগ্ধ অঞ্চলশয়ন ,
হে জাহ্নবী ! সত্য শুধু সুন্দব মবণ
সুন্দব সলিলতলে তোব। অতিশয়
শ্রান্তিভবে আজি মোব উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়
চাহে অবসর, চাহে সাঙ্গ কবিবারে
এ সংগ্রাম, দুবাশার দুষ্ট-পারাবারে
জীর্ণ তবী বাহি নিত্য উত্থান-পতন।
হায় মা গো ! হেথা কভু করি প্রাণপণ
মিটে না প্রাণের সাধ , দিবসের সুখ
সন্ধ্যারে হেবিয়া হয় আপনি বিমুখ ,
অসীম আগ্রহপূর্ণ প্রমোদ-রজনী
আঁখির পলকে কোথা মিলায় অমনি
প্রভাত-বাতাসে। তার পরে চিরকাল,
যতনে কুড়ায়ে লয়ে স্মৃতিব জঞ্জাল !

জ্বলন্ত সন্তাপশিখা মরমের তীরে
নীরবে নিভাতে হয় নয়নের নীরে।
যে উগ্র ব্যগ্রতাভরে সৌন্দর্য্য-স্বপনে,
প্রকৃতির প্রেমকুঞ্জে প্রথম যৌবনে
পশিতাম শত বার, আজি সে অনল
ব্যথিছে মথিছে শুধু মরমের তল!
কবি হৃদয় মোর অনন্ত উদার,
মুক্তপক্ষে জলে স্থলে শূন্যের মাঝার
করে সদা বিচরণ, হেলিয়া হেলায়
নীচতার শত ছল, গিরিচূড়াপ্রায়
সহজে স্পর্শিতে চায় আকাশ-নীলিমা,
সপ্তলোকসঞ্চারী সে উন্নত মহিমা
সে গুরু গরিমাজ্ঞান অঞ্জলি ভরিয়া,
দুটি উদরান্ন তরে দিয়েছি ঢালিয়া
অতি হীন দাসত্বের পদে। ঘৃণাভরে
করি যারে অবহেলা, সংসার-প্রান্তরে
অন্ধ দেহভারবাহী পশুর মতন,
নিশিদিন নতশিরে তাহারই শাসন
বিধির বিধানসম নিয়েছি মানিয়া।
চিরবাঞ্ছিতের লাগি বাসর রচিয়া,
তুচ্ছ যশোবাসনারে মোহের আবেশে
বরিয়া সাদরে সেথা বসায়েছি শেষে!
হায়, তাও বৃথা মোর শত-সাধভরা
হৃদয়-শোণিতে লেখা সৌন্দর্য্যপশরা

লুটাইয়াছে ধূলি'পর ; দুরাশা-দহন
দহে শুধু মর্ম্মবিদ্ধ শল্যের মতন।

তাই অয়ি গঙ্গে! তোর স্নেহমূর্ত্তিখানি
মত্ত বাসনারে মোর লইতেছে টানি,
সান্ত্বনার বশে। আজি হেন মনে লয়,
ওই যেথা রঙ্গে তোর অগাধ হৃদয়
অগাধ-সলিল-ভঙ্গে উঠিছে উলসি'।
শশীর কিরণে, ওই সুখনীরে পশি'
জুড়াইবে জ্বালা মোর ; মন্দ কলকলে
ঢেকে যবে দিবি তুই তরল অঞ্চলে,
সংসারতপনতপ্ত এই তনু মন
লভিবে অনন্ত শান্তি সুষুপ্তি-শয়ন।

('সাহিত্য,' আশ্বিন, ১৩০৪)

মৃত্যু

১৯০০ সনের ১৩ই জুলাই নিত্যকৃষ্ণ অকালে পরলোকগমন করেন। বন্ধু-বিয়োগে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তৎসম্পাদিত 'সাহিত্যে' (শ্রাবণ ১৩০৭) লিখিয়াছিলেন :—

"আমাদের পরমপ্রেমাস্পদ শ্রদ্ধাভাজন সখা সুকবি নিত্যকৃষ্ণ বসু গত ২৯শে আষাঢ় বিসূচিকা রোগে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার পবিত্র চরিত্রগৌরব, উদার সমবেদনা ও গভীর সখ্যপ্রেম এ জীবনে বিস্মৃত হইবার নহে। প্রতিভাশালী কবি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অল্প হইলেও বঙ্গ-সাহিত্যে বরণীয়। হায়! মধ্যগগনে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই সেই প্রতিভারবি অস্তমিত হইল, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। দুঃখের কবি তাঁহার চিরাভীষ্ট শান্তিলোকে নির্ব্বৃতিলাভ করুন, বন্ধুজনের ইহাই আন্তরিক কামনা।"

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৭৮

নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন

নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু

১৮৩৫—১৮৬২

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কয়েক জন ইংরেজী-শিক্ষিত মনীষীর ভ্রান্ত প্রচারেব ফলে বাঙালী-সমাজে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, সংস্কৃতনবিশ পণ্ডিতেরা মাতৃভাষা বাংলার বিরোধী ছিলেন। এই ধারণা যে ভুল এবং বাংলা-সাহিত্যের উন্নতি যে প্রধানতঃ এই সকল পণ্ডিতের সাহায্যেই হইয়াছে, আমরা বহু পণ্ডিতের জীবনী ও কীর্ত্তি আলোচনা করিয়া তাহা প্রমাণ করিয়াছি। বাংলা দেশে ন্যায়শাস্ত্রে শঙ্কর-অবতার নন্দকুমারও আজ হইতে নব্বই বৎসর পূর্ব্বে মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে বঙ্গভাষায় শিক্ষা প্রচারের পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন। শুধু এই কারণেই তিনি আজ স্মরণীয়। অবশ্য নন্দকুমারের বিচিত্র জীবন অন্য কারণেও আলোচনার যোগ্য ; এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার প্রমাণ দিতে চেষ্টা করিতেছি। মাত্র সাতাশ বৎসর বয়সে এই বিচিত্র জীবনের অবসান ঘটে। তাঁহার এই স্মরণীয় কথাটি সর্ব্বাগ্রে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার জীবনী আরম্ভ করিতেছি :—"বঙ্গভাষার বিলক্ষণ চর্চ্চা ব্যতিরেকে আর কিছুতেই বঙ্গ-সমাজের উন্নতি হইতে পারে না।"

বংশ-পরিচয় ; শৈশব-শিক্ষা

১৮৩৫ সনে নৈহাটির প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য-বংশে নন্দকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার প্রপিতামহ মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ পলাশীর যুদ্ধের কিঞ্চিৎ আগে বা পরে স্বগ্রাম যশোহর (অধুনা খুলনা) জেলার কুমিরা ত্যাগ করিয়া নৈহাটিতে আসিয়া বসতি করেন ও তথায় একটি চতুষ্পাঠী খোলেন। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক বলিয়া সে-যুগে তাঁহার খ্যাতি ছিল, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। মাণিক্যের পুত্র শ্রীনাথ তর্কালঙ্কারও নব্য-ন্যায়ে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই শ্রীনাথের পুত্র রামকমল ন্যায়রত্নই নন্দকুমারের পিতা; তিনিও সুপণ্ডিত ছিলেন।

রামকমলের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নন্দকুমার ও পঞ্চম পুত্র হরপ্রসাদ প্রকৃত পণ্ডিত-পদবাচ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। নন্দকুমার বাল্যকালে মাতামহ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নৈহাটি ও মুর্শিদাবাদ—এই উভয় অঞ্চলের ন্যায়-অধ্যাপনার প্রসিদ্ধ ধারাগুলি তাঁহার অধিগত ছিল। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া নড়াইলের ভূস্বামী রামরত্ন রায় (রতন রায়) তাঁহাকে সভাপণ্ডিতের গৌরব দান করিয়াছিলেন। জমিদারের সহিত মনান্তর ঘটায় রামমাণিক্য শেষ-জীবনে মাসিক ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন (১৮৪৫, ২৬ জুন)। ইহার প্রায় এক বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৮৪৬, ২৬ মার্চ)।*

---

* রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে আমার 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' পুস্তকের ১৪, ৪৬-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নন্দকুমারের বয়স তখন ১১ বৎসর মাত্র, কিন্তু এই অল্প বয়সেই তিনি ন্যায়শাস্ত্রের বহু কূট আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বাড়ীর চতুষ্পাঠীতে আরও কিছু দিন অধ্যয়ন করিয়া তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ন্যায়শাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়া নন্দকুমার "ন্যায়চুঞ্চু" উপাধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রীয় বিচার

সেকালে রাজা, মহারাজা, জমিদারেরা বাড়ীতে তর্কসভা আহ্বান করিয়া খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গের বিচার শুনিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। এরূপ তর্কসভায় বড় বড় পণ্ডিতদের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা নন্দকুমারকে পাইয়া বসিল। ১৮৫৪, ১৬ই ফেব্রুয়ারি রামরত্ন রায় পিতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার কাশীপুর আবাসে বহু পণ্ডিতের সমাগম হয়; তন্মধ্যে নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীরাম শিরোমণির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নন্দকুমারও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রবীণ শিরোমণির সহিত তরুণ ন্যায়চুঞ্চুর ঘোরতর ন্যায়-যুদ্ধ বাধিল। নন্দকুমার "ন্যায়শাস্ত্রের কেবলান্বয়ি গ্রন্থের গাদাধরী টীকার উপর এক পূর্ব্বপক্ষ" করিলেন। শিরোমণির পরাজয় ঘটিল। শ্রাদ্ধ-সভায় 'সম্বাদ ভাস্কর'-সম্পাদক পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ উপস্থিত ছিলেন; তিনি রামকমল ভট্টাচার্য্যের একদা-সহপাঠী, বন্ধু-পুত্রের জয়লাভে উৎফুল্ল হইয়া স্বীয় পত্রিকায় লিখিলেন:—

"জিলা যশোহর নড়াল নিবাসি কলিকাতার উত্তর কাশীপুর প্রবাসি ধর্ম্মরাশি মধুভাষী পুণ্যকায় বাবু রামরত্ন রায় মহাশয় গত

বৃহস্পতিবারে গঙ্গাতীর কাশীপুরে তাঁহার পিতা ঠাকুরের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, শ্রাদ্ধসভায় নবদ্বীপাদি নানা সমাজস্থ ন্যূনাধিক পাঁচ শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা পরস্পর ন্যায় বেদান্ত ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির নানা গ্রন্থের বিচার করিলেন, বিশেষতঃ নৈহাটি নিবাসি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামকমল ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুপাত্র পুত্র শ্রীমান্ নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য ন্যায়শাস্ত্রের কেবলান্বয়ি নামক গ্রন্থের গদাধর ভট্টাচার্য্যের টিপ্পনীর উপর এক আপত্তি করিয়াছিলেন নবদ্বীপের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শিরোমণি প্রভৃতি কেহ তাহার উত্তর করিতে পারেন নাই, এইক্ষণে শাস্ত্রীয় বিচারের আমোদ কেবল রামরত্ন বাবুর সভাতেই দেখিতে পাই আর কোন সভায় শাস্ত্রীয় বিচার হয় না, ধনি লোকেরাও বিচার শ্রবণে আমোদ করেন না অতএব শাস্ত্র লোপ হইবার এই এক প্রধান কারণ হইয়াছে।···শ্রাদ্ধ-সভায় মান্য লোকদিগের মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধি প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন।" (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪, শনিবার)

উনিশ বৎসরের এক যুবকের নিকট পরাজয়ে শ্রীরাম শিরোমণি ও নবদ্বীপের অধ্যাপকগণ বিলক্ষণ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় দুই দিন পরে পুনরায় বিচার-সভা বসিল। মধ্যস্থ হইলেন—বাকলার শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম। এবার কিন্তু শিরোমণি নিজে নামিলেন না; তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন তাঁহার প্রধান শিষ্য গোলোকচন্দ্র ন্যায়রত্ন। সারা দিন বিচারের পর গোলোকের পরাজয় হইল। গৌরীশঙ্কর 'সম্বাদ ভাস্করে' লিখিলেন :—

"···গত রবিবারে রায় বাবুর বাটীতে নবদ্বীপের অধ্যাপকদিগের প্রার্থনানুসারে দ্বিতীয় সভা হয়, তাহাতে শিবচন্দ্র

সার্ব্বভৌম মহাশয় মধ্যস্থ ছিলেন, গোলোকচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় উত্তর পক্ষ, পূর্ব্বপক্ষ বাদী নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য, আপত্তি সেই যাহা শ্রাদ্ধ সভায় হইয়াছিল এবং শ্রীরাম শিরোমণি প্রভৃতি সকলে ঐ সভায় যে উত্তর করিয়াছিলেন গোলোক ন্যায়রত্ন সেই উত্তর করিলেন ইহাতে মধ্যস্থ মহাশয় কহিলেন এ উত্তর উত্তরমাত্র কিন্তু নন্দকুমার ইহার উপর যে দোষ দিয়াছেন তাহা অকাট্য, মধ্যস্থ মহাশয় যখন এ কথা কহিয়াছেন, তখন আমারদিগের লিখন সপ্রমাণ হইয়াছে, অতএব শিরোমণি মহাশয়কে অনুরোধ করি, নবদ্বীপের প্রধানাভিমানী হইয়া অকারণ আমারদিগকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করুন,…।" (১৮৫৪, ২৩ ফেব্রুয়ারি গুরুবার)

প্রাচীন সংবাদপত্রে আরও একটি বিচার-সভায় নন্দকুমারের উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্দ্ধমানাধিপতি মহতাবচন্দ্রের মাতার শ্রাদ্ধ-সভায় মহারাজার সম্মুখে এক শাস্ত্রীয় বিচার হয় (১৮৫৪, ১৩ ডিসেম্বর); ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন নবদ্বীপাদি সমাজস্থ প্রধান প্রধান অধ্যাপকবর্গ। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ পরবর্ত্তী ১৯এ ডিসেম্বর 'সম্বাদ ভাস্করে' এই বিচারের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের বিচার-প্রসঙ্গে তিনি এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন :—

"ন্যায়শাস্ত্রের বিচারানুষ্ঠান হইল; আমরা শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে নৈহাটি নিবাসি শ্রীযুক্ত রামকমল ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র শ্রীমন্নন্দকুমার ভট্টাচার্য্যকে পূর্ব্বপক্ষ পক্ষে উপস্থিত করিলাম এবং নবদ্বীপ-নিবাসি তীক্ষ্নবুদ্ধি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোলকনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়কে সিদ্ধান্ত পক্ষে বসাইলাম, শ্রীযুক্ত শ্রীরাম শিরোমণি ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত মাধব তর্কসিদ্ধান্ত

ভট্টাচার্য্য ও পূর্ব্বোক্ত মহামহোপাধ্যায় সকলকে মধ্যস্থলে মধ্যস্থালি কার্য্যে রাখিলাম, শ্রীমান্ নন্দকুমার শক্তিবাদের অম্মচ্ছন্দ শক্তি-বিচার প্রকরণের এক আপত্তি করিলেন, ইহাতে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের সুবিচার হইল, পরে আমরা শ্রীশ্রীযুতের বাম ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলাম, 'হে সভ্য বভ্য মহাশয় সকল, আমারদিগের বাক্য অবধান করুন, এ বিচার; বিচার সমর নহে; এ সমর সেইরূপ সমর, যেমন কিরাতবেশি মহাদেবের সহিত অর্জ্জুনের সমর হইয়াছিল, ধনঞ্জয়ের যুদ্ধ পরাক্রমে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন, নন্দকুমার এক শিশু-বিশেষ গোলকনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় নবদ্বীপের এক জন প্রধানাধ্যাপক, অথচ বর্দ্ধমান-রাজ্যেশ্বর শ্রীল শ্রীযুত বাহাদুরের সমক্ষে নন্দকুমার এই ঘোরতর বিচার করিলেন, অতএব আপনারা সন্তুষ্ট হইয়া নন্দকুমারকে বর প্রদান করুন!' ইহাতে অধ্যাপক মাত্র সকলেই নন্দকুমারকে প্রতিষ্ঠা-পত্র করিলেন এবং আশীর্ব্বচন দ্বারা কহিলেন, হে বালক, তুমি চিরজীবী হইয়া ন্যায় বিস্তার কর, ইহাতেই ন্যায়-শাস্ত্র বিচারের পরিশেষ হইল।"

নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান দুই জন নৈয়ায়িককে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করায় নন্দকুমারের নাম চারি দিকে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তিনি "ন্যায়চুঞ্চু"র পরিবর্ত্তে "তর্করত্ন" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।* "বর্দ্ধমানের মহারাজ

---

* "ইঁহার উপাধি ন্যায়চুঞ্চু কিন্তু বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ ও বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি মহামান্যবর্গ 'ন্যায়চুঞ্চু, উপাধির পরিবর্ত্তে তর্করত্ন উপাধি দিয়াছেন।" ('সংবাদ প্রভাকর,' ২ চৈত্র ১২৬৫)

ত পূর্ব্ব হইতেই প্রায়ই তাঁহাকে বর্দ্ধমানে লইয়া যাইতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া নৈহাটির বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরটি নিজ ব্যয়ে করাইয়া দেন ও নানা ভাবে তাঁহার অন্তরিক প্রীতিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।"

সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপন

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁহার সকল কাজের সাফল্যের মূলে ছিল একটি গুণ; উহা উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচনের ক্ষমতা। নন্দকুমারের অসাধারণ প্রতিভার কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল; উহা যাহাতে ন্যায়শাস্ত্রের মল্লযুদ্ধেই পর্য্যবসিত না হয়; সে জন্য তিনি নন্দকুমারকে কলিকাতা আনাইয়া কি করিয়া সংস্কৃত কলেজে আকৃষ্ট করা যায়, তাহাই ভাবিতেছিলেন। এমন সময় রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় বর্দ্ধমানের রাজবাটী হইতে নন্দকুমারকে বিদ্যাসাগরের নিকট হাজির করিলেন। বিদ্যাসাগরের হাতে তখন কোন উপযুক্ত চাকরি ছিল না, এজন্য তিনি নন্দকুমারকে আপাততঃ ব্যাকরণ-শ্রেণীর প্রতিনিধি-অধ্যাপকের পদই গ্রহণ করিতে রাজী করাইলেন। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যেও নন্দকুমারের বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র পাঠে জানা যায়, নন্দকুমার ১৮৫৬ হইতে ১৮৬০ সন পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজের বিভিন্ন ব্যাকরণ-শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ১৮৫৬, সেপ্টেম্বর

মাসে মসিক ৩০৲ টাকা বেতনে ব্যাকরণ: ৭ম শ্রেণীর প্রতিনিধি-অধ্যাপক নিযুক্ত হন।*

পরবর্ত্তী নবেম্বর মাসে ছাত্রাধিক্যবশতঃ সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ: ৮ম শ্রেণীর উদ্ভব হইলে নন্দকুমারই ৩০৲ টাকা বেতনে ঐ শ্রেণীর অধ্যাপক নির্ব্বাচিত হন। ১৮৬০ সনের এপ্রিল মাসে তিনি ব্যাকরণ: ৭ম শ্রেণীর অধ্যাপক হন এবং এই পদে পরবর্ত্তী ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করেন। সংস্কৃত কলেজ অবস্থান কালে, রমাপ্রসাদ রায়ের পরামর্শে,নন্দকুমার ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কাজ চালাইবার মত ইংরেজী জ্ঞানও তাঁহার জন্মিয়াছিল।

* নন্দকুমারের নিয়োগ সম্বন্ধে ১৮৫৬,২৭এ অক্টোবর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-রূপে বিদ্যাসাগর শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরকে লিখিয়াছিলেন:—
"I have the honor to forward in original an application with a medical certificate, from Pundit Ramgovind Tarkaratna, Third professor of Grammar, applying for leave of absence for one month and to recommend that Pundit Nundcumar Tarkaratna who has already been nominated to act for him provisionally, be appointed to oifficiate for him during his absence. In September last Pundit Nundcumar officiated for the last Professor of Grammar for about a month and discharged the duties entrusted to him very satisfactorily."

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিতে' লিখিয়াছেন:—"ইনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন না এ কারণ শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টার ইয়ং সাহেবের নানা আপত্তি খণ্ডন করিয়া আপাতত কিছুকালের জন্য ঐ পদে রাখিলেন। কিন্তু সংস্কৃত বিদ্যালয়ে পূজ্যপাদ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সহিত বিচার হওয়ায় নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু উৎকৃষ্ট সাব্যস্ত হয়েন।" (পৃ. ১০৯)

কান্দী-স্কুলে হেডপণ্ডিত

১৮৫৮ সনের ৫ই আগষ্ট বিদ্যাসাগর শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট কর্ম্মত্যাগ-পত্র প্রেরণ করেন। নন্দকুমারও অন্যত্র উপযুক্ত চাকুরীর সন্ধান করা সমীচীন বোধ করিলেন; কারণ, বিদ্যাসাগরের অবর্ত্তমানে সংস্কৃত কলেজে তাঁহার ভবিষ্যৎ তেমন উজ্জ্বল বোধ হইল না। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল প্রশংসা-পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মাত্র দুইখানি—বিদ্যাসাগর ও রমাপ্রসাদ রায়ের—এখানে উদ্ধৃত করিতেছি; এগুলি হইতে তাঁহার বিদ্যাবিত্তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে:—

"I have known Nanda Kumar Tarkaratna and his family for years. His ancestors on both sides were pandits of great ability and celebrity—and his father Ramkamal Nyayaratna is well known as one of the most distinguished pandits of Bengal. Pandit Nanda Kumar is a young man of extraordinary talents. He distinguished himslef at a very early age in that most abstruse branch of Sanskritic studies the Nyaya or Logic. He has also acquired a very considerable knowledge of the Sanskrit Language and Literature—a qualification rarely to be met with amongst Sanskrit logicians.

He has lately commenced to study the English language and literature and I have no doubt that he will soon make himself a respectable scholar.

Being anxious to secure the services of such a man to the Sanskirt College, I offered him the post

of a Junior Professor in the absence of a better berth, and he accepted it, because he thought that by so doing he would be able to remain in Calcutta, where he would have better opportunities of improving himself than anywhere else. He has been attached to the Institution for the last two years,.. He bears an excellent character and is a man of great independence of spirit, a quality very rare among the class of Pandits in this country. He deserves every encouragement from those who appreciate true merit. 18th September, 1858."

"Pandit Nanda Kumar Tarkaratna is a young man of extraordinary talents and ability,...

When I was first introduced to him by the Raja of Burdwan some six years ago, I could hardly believe that a young man of his age about 18 had completed the study of Sanskrit Logic, a branch of study which generally takes up a third of a man's life. Since then I have had constant opportunities of observing and appreciating his genius and talents. I spoke about him to several public officers and among others I strongly recommended him to our much esteemed friend the Principal of the Sanskrit College. Thinking that his talents might be otherwise rendered useful in the public service I advised him a few months ago to study English which I believe he has commenced···2nd October 1858."

১৮৬১ সনের গোড়ায় নন্দকুমার, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুপারিশে, পাইকপাড়া-রাজাদের কান্দী-স্কুলে হেডপণ্ডিতের পদলাভ করেন। এই

পদে তাঁহার বেতন ছিল ৮০৲। পরবর্ত্তী ৪ঠা অক্টোবর পিতা রামকমলের মৃত্যু হইলে নন্দকুমারকে নৈহাটি আসিতে হইয়াছিল। পিতৃশ্রাদ্ধের পর তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে লইয়া কান্দী ফিরিয়া গিয়াছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন :—

"বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে আমার দাদা ৺নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু কান্দীর হেডপণ্ডিত ছিলেন। তখন কান্দীর ইস্কুল এ্যাঙ্গলো-সংস্কৃত ইস্কুল ছিল। হেডমাষ্টার ও হেডপণ্ডিত প্রায় সমান বেতন পাইতেন। আমার এ বি সি শিক্ষা কান্দীর ইস্কুলেই হয়। আমরা প্রায় এক বৎসর কান্দীতে ছিলাম। তখন আমার বয়স ৯ বৎসর।—২রা জুলাই ১৯২৩।" ('বঙ্গশ্রী', মাঘ ১৩৪০)

মৃত্যু

পিতার সপিণ্ডীকরণের সময় নন্দকুমার ভ্রাতাদের লইয়া নৈহাটি ফিরিয়াছিলেন। ইহার এক মাস পরে—১৮৬২ সনের অক্টোবর মাসে নিঃসন্তান নন্দকুমার অকালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার রাজযক্ষ্মা হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে কলিকাতায় আনাইয়া ডাঃ গুডিবের চিকিৎসাধীন রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই।

রচনাবলী

সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনাকালে নন্দকুমার মাতৃভাষার সেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন। ১৮৫৯ সনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রতিষ্ঠিত 'সংবাদ প্রভাকরে' তাঁহার একাধিক রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল।

গুপ্ত-কবির মৃত্যু হইলে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব করিয়া ১৪ ফাল্গুন ১২৬৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' নন্দকুমারের একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। প্রতি বৎসর একটি কমিটি দ্বারা প্রবন্ধ আহ্বান করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার লেখককে পুরস্কার দিবার প্রস্তাব তাঁহার পত্রে ছিল।

২ চৈত্র ১২৬৫ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' পঞ্জিকা সম্বন্ধে তাঁহার একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাংলা পঞ্জিকায় যে কত ভুল প্রবেশ করিয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়া তিনি পঞ্জিকা সম্বন্ধে একটি দুরূহ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পত্রিকা-সম্পাদক ঘোষণা করিয়াছিলেন :—"যে ব্যক্তি এ বিষয়ের সদুত্তর প্রদান করিতে পারিবেন, তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক বিখ্যাত নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত নন্দকুমার তর্করত্ন ভট্টাচার্য্যের নিকট ২৫৲ টাকা পারিতোষিক পাইবেন।'

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে ১৯১৬ সংবতে (ইং ১৮৫৯) মুদ্রিত 'সংস্কৃত প্রস্তাব' নামে নন্দকুমারের লিখিত ২৮ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তিকা আছে। পুস্তিকাখানি অতীব দুষ্প্রাপ্য। ইহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের ঔচিত্য এবং সংস্কৃত ও ইংরেজী—এই উভয় ভাষা হইতে অনুবাদের সাহায্যে অপুষ্ট মাতৃভাষার সমৃদ্ধি-সাধন। আমরা রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'সংস্কৃত প্রস্তাব' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "এক্ষণে ইংরাজ রাজাদিগের অধিকার হইয়া এদেশের অবস্থা পুনর্ব্বার উন্নত হইবার উপক্রম হইতেছে। বিলুপ্ত-প্রায় সংস্কৃত ভাষার প্রতি রাজপুরুষদিগের অনুরাগ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পদার্থবিদ্যার প্রভাও কিছু কিছু প্রকাশ পাইতেছে, নগর সন্নিধানে কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যতারও সঞ্চার হইয়া আসিতেছে। এ অবস্থায়

বঙ্গভাষার বিলক্ষণ চর্চ্চা ব্যাতিরেকে আর কিছুতেই বঙ্গসমাজের উন্নতি হইতে পারে না। বঙ্গভাষা এদেশের মাতৃভাষা, এই ভাষা শিক্ষা করা ইহাদিগের অনায়াসে ও অবিলম্বেই সম্পন্ন হইতে পারে। অতএব ইহাতে জ্ঞানসাধন শিক্ষণীয় বিষয়সকল সন্নিবেশিত করিয়া সাধারণ সমাজে প্রচারিত করিতে পারিলেই রাজা ও প্রজা উভয়েরই ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে।...

পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞানোন্নতি-সাধন বিষয়সকল ইংরাজী ভাষাতে যেরূপ উৎকৃষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে, তেমন আর কোন ভাষাতেই দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং পদার্থবিদ্যা, শারীরকবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতি অতি-প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট বিষয়সকল ইংরাজী হইতেই সঙ্কলন করা কর্ত্তব্য। অতএব ইংরাজী ভাষার সবিশেষ চর্চ্চা এতদ্দেশের পরম মঙ্গলকর, সন্দেহ নাই। আর সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন ব্যতিরেকেও এতদ্দেশের মঙ্গল-বিধান কোন প্রকারেই সুসাধ্য হইতে পারে না। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে বঙ্গভাষার অধিকতর আলোচনা হইলেও, অদ্যাপি ইহা অসম্পূর্ণ ও হীন অবস্থাতেই রহিয়াছে। ইহার রীতি-নীতির অদ্যাপি স্থিরতা হয় নাই, বিন্যাস-পারিপাট্যের কোন সুশৃঙ্খলাও নিয়মিত হয় নাই, শ্রোতার চমৎকারজনক রসভাবাদি সন্নিবিষ্ট করিবারও কোন প্রকৃষ্ট প্রণালী প্রচলিত হয় নাই। এই ভাষায় জ্ঞানোন্নতি সাধক ও সভ্যতাদি সম্পাদক পদার্থসকলও সন্নিবেশিত হয় নাই। ফলতঃ ভাষায় যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, বঙ্গভাষায় তাহার বিস্তর ন্যূনতা রহিয়াছে। বঙ্গভাষায় কেবল কথঞ্চিৎ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী কতগুলি শব্দ আছে মাত্র। কোন একটা নূতন বিষয় বর্ণনা করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষা হইতে প্রায় সকল শব্দই

সঙ্কলন করিয়া লইতেই হয়। সংস্কৃত ভাষায় যে কোন বিষয় লিখিবার প্রয়োজন হয়, শব্দের অসদ্ভাব প্রায়ই ঘটে না। অতএব বঙ্গভাষার পদার্থ-সঙ্কলন বিষয়ে যেমন ইংরাজী ভাষার সাহায্য আবশ্যক, সেরূপ শব্দ-সঙ্কলন ও বিন্যাস পারিপাট্যাদি বিধান বিষয়েও সংস্কৃত ভাষার সম্পূর্ণ সাহায্য লইতে হইবে।

এক্ষণে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি ব্যতিরেকে বঙ্গসমাজের উন্নতির আর কোন বিশিষ্ট উপায় নাই এবং সংস্কৃতানুশীলন ব্যতিরেকেও বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, ইহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্তিত হইল।..."

"পুরাতন পন্থার পণ্ডিতের মধ্যে প্রায় এক শত বর্ষ পূর্ব্বে এইরূপ পক্ষপাতশূন্য উদার আধুনিক 'দৃষ্টিভঙ্গী' সত্যই আশ্চর্য্য।"

নন্দকুমার একটি বড় কাজে হাত দিয়াছিলেন; তিনি সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের সহিত 'বৈশেষিক দর্শন' সম্পাদনে প্রবৃত্ত হন। 'বৈশেষিক দর্শন' কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে খণ্ডশঃ প্রচারিত হয়। যুগ্ম-সম্পাদনায় ইহার ১ম খণ্ড (Fas. 1) প্রকাশের সংবাদ ১৮৬১, ৯ই জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে ঘোষিত হয়; প্রকাশকাল বোধ হয় ইহার কিছু পূর্ব্বে। নন্দকুমার ইহার আর কোন খণ্ড প্রকাশে জয়নারায়ণের সহযোগীতা করিতে পারেন নাই;—কান্দী গমনই যে ইহার একমাত্র কারণ, এশিয়াটিক সোসাইটির (সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ) ই. বি. কাওয়েলের নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি পাঠ করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে:—

Calcutta 23rd January 1861.

My dear Nandakumar,

I received your letter about resigning the editorship of the "Vaiseshika Sutras." I think you have done right to resign, as your residence away from Calcutta would have caused much delay in printing, but in some respect I am sorry that you were obliged to do so. I hope some future time the Society may have the benefit of your services as editor of some other Sanskrit work.

I remain,
Yours sincerely,
Edward B. Cowell
Secretary, Asiatic Society

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন

১৮০৬—১৮৭২

বংশ-পরিচয় ; শিক্ষা

১৮০৬ সনের এপ্রিল মাসে কলিকাতার দক্ষিণে ২৪-পরগণার অন্তর্গত মুচাদিপুর গ্রামে জয়নারায়ণের জন্ম হয়। তিনি স্বীয় বংশ-পরিচয় ও শিক্ষার কথা সংক্ষেপে সংস্কৃতে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :—

"পূর্ব্বে সাবর্ণগণ বড়িসাতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকে বসতিস্থান দিয়া স্থাপিত করেন। শ্যামসুন্দর বাচস্পতি নামে পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর এক ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের মধ্যে সকলেরই পূজনীয় ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার; রামচন্দ্রের পুত্র হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। হরিশ্চন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। ইনি বাল্যকালে পিতার নিকটে ব্যাকরণ প্রভৃতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেন। পরে 'প্রাণতোষণীলতা'-প্রণেতা রামতোষণ বিদ্যালঙ্কারের নিকট অলঙ্কারশাস্ত্র, শালিখা নিবাসী জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের নিকট ন্যায়শাস্ত্র, এবং গুর্জ্জরদেশীয় পণ্ডিত নাথুরাম শাস্ত্রীর নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।..."
(দ্র° 'পদার্থতত্ত্বসারঃ')

স্বীয় অধ্যাপক জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের মৃত্যু (ইং ১৮৩১ ?) হইলে জয়নারায়ণ শালিখায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তথায় অধ্যাপনা করিতে করিতে তিনি হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা দেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি জজ-পণ্ডিত পদের প্রশংসা-পত্র লাভ করেন। তিনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একই বৎসরে (ইং ১৮৩৯) এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে প্রথমে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত-সাহিত্যের পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়। কাঁচরাপাড়া-নিবাসী নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। ১৮৪০ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হইলে পরবর্ত্তী ১১ই আগষ্ট জয়নারায়ণ মাসিক ৮০৲ বেতনে ঐ শূন্য পদে নিযুক্ত হন। তিনি ৩০ বৎসর অতীব সুনামের সহিত সংস্কৃত কলেজে ন্যায়দর্শনের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। অবসরগ্রহণের কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ছুটি লইয়া তিনি কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন। ২৪এ জুলাই ১৮৬৯ তারিখে কাশী "মানসসরোবর" হইতে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে কর্ম্ম হইতে অবসর লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তিনি একখানি পত্র লেখেন, জীবনের অবশিষ্ট কাল কাশীতেই কাটাইবেন—এ কথারও ইঙ্গিত পত্রে ছিল।

কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ১৮৬৯ সনের ১০ই আগষ্ট শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্ত্তাকে জয়নারায়ণের চাকুরীর

যে বিবরণ পেশ করেন, তাহাতে প্রকাশ, ঐ তারিখে তাঁহার বেতন ১২০৲, বয়স ৬৩ বৎসর ৪ মাস, এবং কার্য্যকাল ২৯ বৎসর ৩ মাস ২১ দিন। তিনি পেন্‌সনের সুপারিশ করিয়া লেখেন :—

"..in consideration of the continuous services of the venerable Professor and of his vast and profound erudition by which the College has benefited so long, the highest scale of pension allowed by the rules be granted to him, namely, half of his average monthly salary for the last five years amounting to Rs. 57-5-1."

১৮৬৯, ৩রা নবেম্বর হইতে 'জয়নারায়ণ পেন্‌সন গ্রহণ করেন; তাঁহার পেন্‌সনের পরিমাণ ছিল ৫৭৷০।

মৃত্যু

সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসরগ্রহণের তিন বৎসর পরে ১২ নবেম্বর ১৮৭২ (২৮ কার্ত্তিক ১২৭৯) তারিখে জয়নারায়ণ কাশীতে দেহরক্ষা করেন।* মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন-প্রবর্ত্তিত 'সুলভ সমাচার' পরবর্ত্তী ২৬এ নবেম্বর তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

* শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'চরিতমালা,' ২য় ভাগে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। তাহাতে তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু-তারিখ ভ্রমক্রমে "১২৮০ সালের অগ্রহায়ণ মাস" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 'বিশ্বকোষে'র "জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন" প্রবন্ধটি (পৃ. ৬৭০) প্রধানত: 'চরিতমালা' অবলম্বনে লিখিত, সুতরাং ইহাতেও এই ভুলের পুনরাবৃত্তি আছে।

"পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন।—…গত ২৮শে কার্ত্তিক সোমবার ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন।

ইহাঁর সমান নৈয়ায়িক বাঙ্গালাদেশে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশের নৈয়ায়িকেরা সচরাচর কাজ চালানমত দুই একখান গ্রন্থ পড়িয়া, দুই চারটা ফাঁকি শিখিয়া কেবল টিকি নাড়িয়া "অবচ্ছেদাবচ্ছেদক" করিয়া বেড়ান। কিন্তু তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের ন্যায়শাস্ত্রে প্রকৃত গভীর বিদ্যা ছিল। তাঁহার নিকট যাঁহারা পড়িতেন তাঁহারা সকলেই তাঁহাব গভীর বিদ্যা ও পরিষ্কার বিচারশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেন। অধিক সুখের বিষয় এই যে, এত বিদ্যা থাকিয়াও তাঁহার লোক দেখান ছিল না, বৃথা আস্ফালন তিনি কখন করিতেন না। কোন প্রশ্ন হইলে অতি ধীব, প্রশান্ত ও গম্ভীরভাবে ফল কথাগুলি বলিয়া দিতেন। তিনি দুই পক্ষের মধ্যস্থতা করিবার অত্যন্ত উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সমক্ষে আসল কথা ছাড়িয়া আগড়ম বাগড়ম বকা কাহারও সাধ্য হইত না। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রকৃত পথে আনিয়া দিতেন। ন্যায়ে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল বটে, কিন্তু অন্য সকল বিষয়েও তিনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন যে, "তর্কপঞ্চানন মহাশয় ভিন্ন প্রকৃত পণ্ডিত আমি দেখিতে পাই না।"

তাঁর সরলতা, মৃদুতা, শান্ত স্বভাব মনে হইলে তাঁহাকে যথার্থ অন্তরে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার এই সকল গুণের পরিচয়স্বরূপ দুই একটি কথা পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে। তিনি স্থূলকায় ছিলেন ও ইদানীং এক প্রকার অথর্ব্ব

হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তিনি একখানি সামান্য তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী ভাড়া করিয়া কলেজে আসিতেন। এক দিন কলেজ হইতে যাইবার সময় তিনি গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় স্কুলের একপাল ছোট ছোট ছেলে তাঁহার গাড়ীর পিছন ও চাকা ধরিয়া পিছন দিকে টানিতে লাগিল; ঘোড়া আর চলিতে পারে না; গাড়োয়ান মহারাগে বকাবকি করিতে লাগিল। কিন্তু ছেলেরা শুনে না; অবশেষে তর্কপঞ্চানন মহাশয় মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, "ও বাবারা, তোমরা টানিলে ঘোড়া যাবে কেন?" ছেলেরা আরও আনন্দ পাইল, এবং আরও টানাটানি করিতে লাগিল। অবশেষে অন্য একজন আসিয়া ছেলেদের হস্ত হইতে তাঁহার গাড়ী উদ্ধার করিয়া দিল। তিনি স্বভাবতঃ এমনি শান্তপ্রকৃতি ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তাঁহার মন আবার এমন উদার ছিল যে, ইংরাজী হইতে ভাল ভাল মত ও ভাল ভাল কথা বলিলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতেন এবং ইংরাজদিগের শাস্ত্রের উপর তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা বাড়িত। এক দিন ন্যায় পড়াইবার সময় ন্যায়ের যেখানে আছে যে বায়ুর ভার নাই, সেইখানে একজন ছাত্র বলিলেন যে "বায়ুর ভার আছে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! কেমন করিয়া জানিলে?" তাহাতে সেই ছাত্র যে-উপায়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বাতাসের ভার সপ্রমাণ করিয়াছেন তাহা বুঝাইয়া দিলেন। শুনিয়া তিনি ৫।৭ মিনিট চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে বলিলেন, "দেখ দেখি বাবা, এই উপায়টি না জানার জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এমন সত্যটি জানিতে পারেন নাই।" এমন কি তিনি 'পদার্থতত্ত্বসার' নামে যে ন্যায়ের গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন,

তাহাতে অনেক ইংরাজ মত নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহার আর একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে তিনি অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। একটু বুদ্ধিমান্ ও পরিশ্রমী দেখিলে তিনি একেবারে মোহিত হইতেন। এমন অনেক দিন হইয়াছে যে, তিনি নিজকৃত কবিতা আনিয়া ছাত্রদিগকে বলিয়াছেন, "বাবারা, একবার দেখিয়া কাটিয়া কুটিয়া দেও দেখি, তোমরা আমা অপেক্ষা এ সব বোঝ ভাল।" বাস্তবিক তাঁহার সরলতা ও বিনয় মনে হইলে গায়ে কাঁটা দেয়। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে শান্তিতে রক্ষা করুন। তাঁহার নাম স্মরণ রাখিবার জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং তাঁহার ছাত্রদের কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার একখানি ছবি সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে রাখিলে অতি উত্তম হয়। বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী এবং তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এ-বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত।"

গ্রন্থাবলী

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের রচিত ও সম্পাদিত যে সকল গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি, সেগুলির তালিকা :—

১। উদয়নাচার্য্য-কৃত **'আত্মতত্ত্ববিবেকঃ'**। ১৯০৬ সংবৎ (ইং ১৮৪৯)

২। **বৈশেষিক দর্শন** (কণাদসূত্রবিবৃতিঃ টীকা সহ)। ইং ১৮৬১। বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা

৩। **সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ।** ইং ১৮৬১

বাংলায় লিখিত ও বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত।

৪। গৌতম মুনি-কৃত **'ন্যায়দর্শনম্'** বাৎস্যায়ন-ভাষ্য। সমেত।
ইং ১৮৬৫। বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা

৫। **পদার্থতত্ত্বসারঃ।** ইং ১৮৬৭

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আনুকূল্যে প্রকাশিত।

৬। আনন্দগিরি-কৃত **'শঙ্করবিজয়ঃ'**। ইং ১৮৬৮। বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা

এই গ্রন্থে জয়নারায়ণ তাঁহার দুই জন অতিশয় প্রিয় ছাত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাদের একজন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অপর জন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (সংস্কৃত কলেজের ছাত্র নহেন)।

'পদার্থতত্ত্বসারঃ' পুস্তকে জয়নারায়ণ সংক্ষেপে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আরও কয়েকখানি পুস্তকের উল্লেখ আছে; সেগুলি—

(ক) নীরাজনপ্রকাশঃ *

(খ) স্বরসংক্রমদীপিকা *

(গ) তারকেশস্তবঃ

(ঘ) বচঃপুষ্পাঞ্জলিঃ (চামুণ্ডাশতকং)।

জয়নারায়ণ সুকবিও ছিলেন। 'তারকেশস্তবঃ' ও 'চামুণ্ডাশতকং'-এর ন্যায় তিনি সংস্কৃত পদ্যে আরও একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন; উহা—'পদ্যপদ্মমালানামিকা ভৈরবপঞ্চাশিকা'; ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৬, প্রকাশকাল ১৭৯০ শকাব্দা (ইং ১৮৬৮)।

---

* ইহার প্রতিলিপি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে আছে। Des. Cat. of Sans. Mss. Sanskrit College, Calcutta. *Smriti*, pp. 321-2, 360-61.

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৭৯

রজনীকান্ত সেন

১৮৬৫—১৯১০

রজনীকান্ত সেন

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

জন্ম : বংশ-পরিচয়

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য-বংশে ১৮৬৫ সনের ২৬এ জুলাই (১২৭২, ১২ই শ্রাবণ) বুধবার রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গুরুপ্রসাদ সেন তখন কাটোয়ার মুন্‌সেফ।

রজনীকান্তের সাহিত্য-সাধনায় পারিবারিক প্রভাব নিতান্ত অল্প ছিল না। পিতা গুরুপ্রসাদ সঙ্গীতজ্ঞ ও সুকবি ছিলেন। ব্রজবুলিতে রচিত তাঁহার কীর্ত্তন-সমষ্টি 'পদচিন্তামণিমালা' ১২৮৩ সালে মুদ্রিত হয়।* সুগায়ক পিতার সান্নিধ্যে থাকিয়া পুত্রও বাল্যে সঙ্গীত অভ্যাসের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন ; রজনীকান্ত না কি চারি বৎসর বয়সে সাধক রামপ্রসাদের গানগুলি সুর করিয়া গাহিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা মনোমোহিনী দেবীও এক জন গুণবতী মহিলা। কাব্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি বাল্যকাল হইতেই পুত্রের হৃদয়ে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। এই পরিবারের অম্বুজাসুন্দরীও (রজনীকান্তের জ্যেষ্ঠতাত-কন্যা) উত্তরকালে কবি-খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

---

* গুরুপ্রসাদ শেষ বয়সে 'অভয়া বিহার' নামে একখানি গীতি-কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে দক্ষপ্রজাপতি-গৃহে সতীর জন্ম হইতে দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ পর্য্যন্ত ঘটনা ছয়টি কাননে বর্ণিত হইয়াছে। (জগদীশ্বর রায় : "একখানি অপ্রকাশিত কাব্য"—'প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩১৮)

শিক্ষা

রজনীকান্ত গ্রাম্য পাঠশালায় পড়েন নাই। তাঁহার প্রাথমিক সাধারণ শিক্ষা হয় রাজসাহীতে। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দনাথ সেন রাজসাহীর খ্যাতনামা উকীল ছিলেন। রাজনীকান্ত কোন দিনই "গ্রন্থ-কীট" ছিলেন না, প্রতিভা ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন বলিয়া পরীক্ষার কাছাকাছি সময়ে মনোযোগ সহকারে দিন-কয়েক পড়িয়া সকল পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—

"দাবা, হারমোনিয়ম, তাস, ফুটবল—এই নিয়ে কাটিয়েছি। যে বার বি. এ পাস হলাম, সে-বার বাটীতে ব'সে কেবল হিন্দু হোস্টেলেরই ৮০।৮২ খানা পোষ্টকার্ড পাই—যে এমন পাস।··· আমি যদি পড়তাম, তবে আমি স্পর্দ্ধা ক'রে বলতে পারি যে, কেউ আমার সঙ্গে compete কত্তে পারত না। আমি গান গেয়ে হেসে নেচে পাস হয়েছি। I was never a book-worm, for I was blessed with very brilliant parts" ("হাসপাতালের রোজনামচা": নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-প্রণীত 'কান্তকবি রজনীকান্ত')

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারের সাহায্যে রজনীকান্ত কোন্ সালে কোন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাহার আভাস দিতেছি :—

ইং ১৮৮৩ ··· এন্‌ট্রান্স, ৩য় বিভাগ ··· কুচবিহার জেন্‌কিন্স স্কুল (বয়স ১৭ বৎসর)

১৮৮৫ ·· এফ. এ. ২য় বিভাগ ··· রাজসাহী কলেজ

১৮৮৯ ··· বি. এ. ··· সিটি কলেজ

১৮৯১ ··· বি. এল., ২য় বিভাগ ·· সিটি কলেজ

বিবাহ

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার অল্প দিন পরেই—১২৯০ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ রজনীকান্তের বিবাহ হয়। পাত্রী—স্কুল-বিভাগের ডেপুটি ইন্স্পেক্টর, ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার বেউথা গ্রাম-নিবাসী তারকনাথ সেনের কন্যা, উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষায় বৃত্তিধারিণী হিরণ্ময়ী দেবী।

ওকালতি ও সাহিত্য-সাধনা

রজনীকান্ত যখন সিটি কলেজে বি. এ. পড়িতেছেন, সেই সময়ে তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত উভয়েই পরলোকগমন করেন (ফাল্গুন ১২৯২)। সমৃদ্ধ সেন-পরিবারের অবস্থা দিন দিন হীন হইয়া আসিতে লাগিল। সংসারের অবস্থা বুঝিয়া রজনীকান্ত বি. এল. পরীক্ষা দিয়া স্বাধীন ভাবে রাজসাহীতে ওকালতি সুরু করিলেন, কিছু দিন নাটোর ও নওগাঁয় অস্থায়ী ভাবে মুন্সেফের কাজও করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সাহিত্যগতপ্রাণ; ওকালতিতে তাঁহার তেমন প্রসার-প্রতিপত্তি হইতে পারে নাই। রজনীকান্ত একখানি পত্রে দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমারকে লিখিয়াছিলেন :—

"কুমার, আমি আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম,

কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম। আমার চিত্ত তাই লইয়া জীবিত ছিল।"

আইন-ব্যবসায় সম্বন্ধে তিনি তাঁহার হাসপাতালের রোজনামচার এক স্থলে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি :—

"সৎপথে থেকে ওকালতি করা বড় কঠিন হয়েছে। টাকার লোভ এতো হবে যে, সত্যাসত্য বিচার-ক্ষমতা blunt হয়ে heart callous হবে, তখন টাকা হ'তে পারে, অর্থ হবে, তার পায়ে পরামার্থটি রেখে হবে। ইতি মে মতিঃ।"

রজনীকান্ত রাজসাহীতে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ী ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। শৈশব হইতেই তিনি কবিতা রচনা করিতেন, কিন্তু তাঁহার কাব্যপ্রতিভা প্রকৃতপক্ষে রাজসাহীতেই বিকাশ লাভ করে। এই রাজসাহীতে অবস্থানকালেই তিনি স্বনামধন্য সাহিত্যিক ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। অক্ষয়কুমারের ভবনে প্রায়ই গানের আসর বসিত, সে আসর মাতিয়া উঠিত সুকণ্ঠ রজনীকান্তের স্বরচিত গানে। এইখানেই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের কণ্ঠে হাসির গান শুনিয়া রজনীকান্ত হাসির গান রচনায় প্রবৃত্ত হন।

স্থানীয় সভা-সমিতির অনুষ্ঠানে রজনীকান্তকেই গান রচনা করিয়া দিতে, এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই গান গাহিয়া সমবেত জনের মনোরঞ্জন করিতে হইত। এক কথায় রজনীকান্ত বিনা রাজসাহীর কোন আনন্দোৎসবই যেন জমাট বাঁধিত না। তিনি কিরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত গান রচনা করিতে পারিতেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। জলধর সেন লিখিয়াছেন :—

"এক রবিবারে রাজসাহীর লাইব্রেরিতে কিসের জন্য যেন একটা সভা হইবার কথা ছিল। রজনী বেলা প্রায় তিনটার সময় অক্ষয়ের বাসায় আসিল। অক্ষয় বলিল, 'রজনীভায়া, খালি হাতে সভায় যাইবে। একটা গান বাঁধিয়া লও না।' রজনী যে গান বাঁধিতে পারিত, তাহা আমি জানিতাম না; আমি জানিতাম, সে গান গাহিতেই পারে। আমি বলিলাম, 'এক ঘণ্টা পরে সভা হইবে, এখন কি গান বাঁধিবার সময় আছে?' অক্ষয় বলিল, 'রজনী একটু বসিলেই গান বাঁধিতে পারে।' রজনী অক্ষয়কে বড় ভক্তি করিত। সে তখন টেবিলের নিকট একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া অল্প ক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। তাহার পরেই কাগজ টানিয়া লইয়া একটা গান লিখিয়া ফেলিল। আমি ত অবাক্। গানটা চাহিয়া লইয়া পড়িয়া দেখি, অতি সুন্দর রচনা হইয়াছে। গানটি এখন সর্ব্বজন-পরিচিত—

তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা;
ঊর্দ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত নভোনীলাঞ্চলা,
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।"

১৩০৪ সালে রাজসাহী হইতে 'উৎসাহ' নামে যে মাসিক-পত্রখানি প্রকাশিত হয়, অক্ষয়কুমার ও রজনীকান্ত তাহার সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; উভয়েরই বহু রচনা 'উৎসাহে'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছে।

বাণী-সাধনায় সবিশেষ উৎসাহী রজনীকান্ত কিন্তু মোটেই কবিযশঃপ্রার্থী ছিলেন না। অক্ষয়কুমারের নির্ব্বন্ধাতিশয়েই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'বাণী' ১৩০৯ সালে মুদ্রিত হয়। এই প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার "কান্তকবির স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনা" প্রবন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এখানে উদ্ধৃত করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না:—

"...কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া রজনীকান্ত রচনা-প্রতিভা-বিকাশে যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন। অনেক সঙ্গীত আমার সমক্ষে রচিত হইয়াছে, অন্যকে শুনাইবার পূর্ব্বে আমাকে শুনান হইয়াছে; মজলিসে সভামণ্ডপে পুনঃ পুনঃ প্রশংসিত হইয়াছে।...তথাপি সঙ্গীতগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে রজনীকান্তের ইতস্ততের অভাব ছিল না। রজনীকান্তের গুণগ্রাহিতা ছিল, সরলতা ছিল, সহৃদয়তা ছিল, রচনা-প্রতিভা ছিল, কিন্তু আত্মপ্রকাশে ইতস্ততের অভাব ছিল না। কিরূপে তাহা কাটিয়া গেল, তাহা তাঁহার সাহিত্য-জীবনের একটি জ্ঞাতব্য কথা।...

সে-বার বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতায় যাইবার জন্য একখানি ডিঙ্গী নৌকায় উঠিয়া পদ্মাবক্ষে ভাসিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে তীর হইতে রজনী ডাকিলেন,—'দাদা! ঠাঁই আছে?'

তাঁহার স্বভাব এইরূপই প্রফুল্লতাময় ছিল। অল্প কাল পূর্ব্বে 'সোনার তরী' বাহির হইয়াছিল। রজনী তাহারই উপর ইঙ্গিত করিয়া এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন; হয়ত আশা ছিল, আমি বলিয়া উঠিব—

'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট এ তরী,
আমারই সোনার ধানে গিয়াছে ভরি!'

আমি বলিলাম,—'ভয় নাই, নির্ভয়ে আসিতে পার, আমি ধানের ব্যবসায় করি না।' এইরূপে দুই জনে কলিকাতায় চলিলাম। সেখান হইতে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বোলপুর যাইবার সময়ে, রজনীকান্তকেও সঙ্গে লইয়া চলিলাম। সেখানে রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার আমন্ত্রিত সুধীবর্গের নিকটে উৎসাহ পাইয়াও, রজনীকান্তের ইতস্ততঃ দূর হইল না। কলিকাতায় ফিরিয়া

আসিয়া রজনীকান্ত বলিল,—সমাজপতি থাকিতে আমি কবিতা ছাপাইতে পারিব না।'

মুখে যে যাহা বলুক, সমাজপতির সমালোচনার ভয়ে কবিকুল যে কিরূপ আকুল, তাহার এইরূপ অভ্রান্ত পরিচয় পাইয়া, প্রিয়বন্ধু জলধরের সাহায্যে সমাজপতিকে জলধরের কলিকাতার বাসায় আনাইয়া, নূতন কবির পরিচয় না দিয়া, গান গাহিতে লাগাইয়া দিলাম। প্রাতঃকাল কাটিয়া গেল, মধ্যাহ্ন অতীত হইতে চলিল, সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সঙ্গীত-সুধাপানে আহারের কথাও বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কাহাকেও কিছু করিতে হইল না;—সমাজপতি নিজেই গানগুলি পুস্তকাকারে ছাপাইয়া দিবার কথা পাড়িলেন। ইহার পর আলবার্ট হলের এক সভায় রবীন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতের পরে রজনীর সঙ্গীত যখন দশজনে কান পাতিয়া শুনিল, তখন রজনীর ইতস্ততঃ মিটিয়া গিয়া আমার ইতস্ততের আরম্ভ হইল।

আমার ইতস্ততের যথেষ্ট কারণ ছিল। আমাকে পুস্তকের ও পুস্তকে মুদ্রিতব্য প্রত্যেক সঙ্গীতের নামকরণ করিতে হইবে, গানগুলির শ্রেণী-বিভাগ করিয়া, কোন্ পর্য্যায়ে কোন্ শ্রেণী স্থান পাইবে, তাহাও স্থির করিয়া দিতে হইবে, এবং গ্রন্থের ভূমিকাও লিখিতে হইবে,—এই সকল সর্ত্তে রজনীকান্ত গ্রন্থ-প্রকাশের অনুমতি দিয়া, আমাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমি যাহা করিয়াছি, তাহা সঙ্গত হইয়াছে কি না, ভবিষ্যৎ তাহার বিচার করিবে। তবে আমার পক্ষে দুই একটি কথা বলিবার আছে। গ্রন্থের নাম হইল—'বাণী'। সঙ্গীতগুলিরও একরূপ নামকরণ হইয়া গেল। শ্রেণী-বিভাগও হইল,—তাহার নামকরণ হইল আলাপে, বিলাপে, প্রলাপে।...রজনীকান্তের "আলাপ"ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া

আমার ধারণা ;—তাহা অনাবিল, তাহা মধুময় ; তাহা ভাবে ভক্তিতে রচনা-লালিত্যে অনুপম।" ('মানসী,' কার্ত্তিক ১৩১৯)

'বাণী'র তিন বৎসর পরে রজনীকান্তের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কল্যাণী' (ভাদ্র ১৩১২) মুদ্রিত হয়। বঙ্গব্যবচ্ছেদ লইয়া দেশে তখন স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল ঢেউ উঠিয়াছে। প্রতিবাদ-সভায় বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের প্রস্তাবও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া গেল। এই সময়ে রজনীকান্ত দেশাত্মবোধমূলক গান রচনায় মাতিয়া উঠিলেন। ইহার একটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই ;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে, মায়েব
অপাব স্নেহ দেখ্‌তে পাই ;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।
ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই ,
তবু, তাই বেচে কাচ, সাবান মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয় রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা ক'রব ভাই ;
পরের জিনিস কিন্‌বো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

রজনীকান্ত তাঁহার হাসপাতালের রোজনামচায় লিখিয়াছেন :—
"যে দিন 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গান লিখে দিলাম, আর এই কলিকাতার ছেলেরা আমাকে আগে করে procession বের ক'রে এই গান গাইতে গাইতে গেল, সে দিনের কথা মনে ক'রে আমার আজও চক্ষে জল আসে।"

দেশাত্মবোধের এই অপূর্ব্ব গানখানি 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে মুগ্ধ করিয়াছিল ; তিনি এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন, তাহাও উদ্ধারযোগ্য :—

> "কান্তকবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' নামক প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশী সঙ্গীত-সাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে। বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে। ইহা সফল গান। যে-সকল গান ক্ষুদ্র-প্রাণ প্রজাপতির ন্যায় কিয়ৎকাল ফুল-বাগানে প্রাতঃসূর্য্যের মৃদু কিরণ উপভোগ করিয়া মধ্যাহ্নে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়, ইহা সে শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। যে গান দেববাণীর ন্যায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যদ্বাণীর মত সফল হয়, ইহা সেই শ্রেণীর গান। ইহাতে মিনতির অশ্রু আছে,—নিয়তির বিধান আছে। সে অশ্রু, পুরুষের অশ্রু—বিলাসিনীর নহে। সে আদেশ যাহার কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহাকেই পাগল হইতে হইয়াছে। স্বদেশী-যুগের বাংলা-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' ভিন্ন আর কোন গান ব্যাপ্তি, সৌভাগ্য ও সফলতায় এমন চরিতার্থ হয় নাই, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করি।"

স্বদেশী-আন্দোলনের মধ্যেই বাঙালী রজনীকান্তকে আরও ভাল করিয়া চিনিল— তাঁহার নাম ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িল।

মৃত্যু

রজনীকান্তের ভাগ্যে যখন যশ ও গৌরবের দিন আসিল, ঠিক সেই সময়েই নিষ্ঠুর নিয়তি বাদ সাধিলেন। ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইলেন। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হইল। গলদেশে অস্ত্রোপচারও হইল, কিন্তু কাল রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ছিন্নকণ্ঠ বাক্‌শক্তিশূন্য মুমূর্ষু কবির শেষ দিনগুলি বেদনায় করুণ। দারুণ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে ভগবদ্বিশ্বাসী কবি এক দিনের তরেও বিচলিত হন নাই; তিনি অকম্পিত হস্তে লিখিয়াছেন :—

আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছে,
গর্ব্ব করিতে চূর;
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
সকলি করেছে দূর।
ঐগুলো সব মায়াময় রূপে,
ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছে দীন আতুর;
আমায়, সকল রকমে কাঙাল করিয়া
গর্ব্ব করিছে চূর।
যায় নি এখনো দেহাত্মিকা মতি,
এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি,
এই দেহটা যে আমি, সেই ধারণায়
হয়ে আছি ভরপুর,

তাই, সকল রকমে কাঙাল করিয়া
গর্ব্ব করিছে চুর।
ভাবিতাম, "আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,"
তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
বেদনা দিল প্রচুর;
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে,
গর্ব্ব করিতে চুর!

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল,
২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

২৮এ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ অনন্তপথের যাত্রীকে মেডিকেল কলেজের কটেজ-গৃহে দেখিতে গিয়াছিলেন। কবিগুরুর দর্শন লাভ করিয়া রোগ-যন্ত্রণাক্লিষ্ট রজনীকান্ত আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠেন। রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়া গিয়া ১৬ই আষাঢ় তাঁহাকে যে পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:

"প্রীতিপূর্ণ নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন—সেদিন আপনার রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি-মাংস, স্নায়ু-পেশী দিয়া চারি দিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রাণী' নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন,—

'—এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় ?'

ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখ-দুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না ? শরীর হার মানিয়াছে কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত-স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে ? মানুষের আত্মার সত্য-প্রতিষ্ঠা যে কোথায়, তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য্য !

যেদিন আপনার সহিত দেখা হইয়াছে, সেই দিনই আমি বোলপুরে চলিয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে আবার যদি কলিকাতায় যাওয়া ঘটে তবে নিশ্চয় দেখা হইবে।

আপনি যে গানটি ["আমায়, সকল রকমে···] পাঠাইয়াছেন তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা ত আপনার কিছুই

অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই ত তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত ত তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ ত একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন; আজ আপনার জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে। ইতি—আপনার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" ('কান্তকবি রজনীকান্ত,' পৃ. ২৩৪-৩৬)

১৩১৭ সালের ২৮এ ভাদ্র (১৩ সেপ্টেম্বর ১৯১০) রজনীকান্তের জীবন-দীপ অকালে নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

"যে সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করা মানবশক্তির পক্ষে একান্ত অসম্ভব না হইলেও নিতান্ত কঠিন, তাহার প্রাচুর্য্য তাঁহাকে যতই ঘিরিয়া বসিয়াছে, তিনি তাহার মধ্যে ততই শ্রীভগবানের প্রেমলীলার অনুভূতিতে তাঁহার উপরেই একান্ত নির্ভর করিয়া রহিয়াছেন;—কদাপি তাঁহার দয়ার বিধানে সন্দিহান হইয়া, 'হা ভগবন্ কি করিলে' বলিয়া আর্ত্তনাদ করেন নাই। ইহাতেই তাঁহার তৃপ্তি; ইহাতেই তাঁহার সিদ্ধি।

তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।
তব পুণ্য-কিরণ দিয়ে যাক্ মোর মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।

কবির প্রথম জীবনের এই আকুল প্রার্থনা, শেষ-জীবনে পূর্ণ হইয়াছিল। ...রাজসাহীতে সম্মিলিত বঙ্গসাহিত্য-সুহৃদ্বর্গের অভ্যর্থনায় কান্তকবি যে স্বাগত-গীতি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আনন্দোচ্ছ্বাস যেমন সমাগত বিদ্বজ্জনকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিয়াছিল, বিদায়-গীতিটি সেইরূপ সকলকেই বিষাদমগ্ন করিয়া, বিদায় দান করিয়াছিল। কান্তকবির জীবনগীতিও সেইরূপ। তাহা আরম্ভে আমাদিগকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিয়াছিল,

অবসান সময়ে সেইরূপ অবসন্ন করিয়া চলিয়া গিয়াছে! তাঁহার কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া, আমরা এখন তাঁহার মতই কাঁদিতেছি—

সুখের হাট কি ভেঙ্গে নিলে!
মোদের মর্ম্মে মর্ম্মে রইল গাঁথা,
ভাঙ্গা বীণায় কি সুর দিলে!*

গ্রন্থাবলী

রজনীকান্তের পুস্তক-সংখ্যা মোট ৮খানি; ইহার তিনখানি তাঁহার জীবিতকালে প্রকাশিত হয়। এগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি; বন্ধনী-মধ্যে যে ইংরাজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। বাণী (কাব্য)। (২৪-৮-১৯০২) পৃ. ৮২।†

---

* অক্ষয়কুমার মৈত্রেয: "কান্তকবি রজনীকান্ত"—'সচিত্র শিশির', ১৩ পৌষ, ১৩৩০।

† বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে 'বাণী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয। এই সংস্করণের জন্য গ্রন্থকার বিশেষভাবে সাতটি স্বদেশী-গান রচনা করেন। এই গ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন কলিকাতার মজুমদার লাইব্রেরী। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই সরকারেব কোপদৃষ্টি পতিত হয। ফলে ঐ দ্বিতীয সংস্করণের 'বাণী' সরকাব বাজেযাপ্ত করেন। গ্রন্থকারের বান্ধবগণের চেষ্টায় ঐ এগারটি সঙ্গীত পরবর্ত্তী সংস্করণে বাদ দেওযা হইবে—এই অঙ্গীকারে 'বাণী'র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয। এ যাবৎ 'বাণী'র খণ্ডিতরূপ প্রচারিত হইতে ছিল। ১৩৫৯ সালের ফাল্গুন মাসে 'বাণী'র পূর্ণরূপ দীর্ঘকাল পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয। এই সংস্করণটি সম্পাদনা করেন শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত।

ইহার ভূমিকায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিয়াছেন :—"কাহারও বাণী গদ্যে, কাহার পদ্যে, কাহারও বা সঙ্গীতে অভিব্যক্ত। রজনীকান্তের কান্ত-পদাবলী কেবল সঙ্গীত।" ১৯০৬ সনের মার্চ মাসে প্রকাশিত ২য় সংস্করণটি পরিবর্দ্ধিত।

২। **কল্যাণী** (কাব্য)। ভাদ্র ১৩১২ (ইং ১৯০৫)।

৩। **অমৃত** (নীতি-কবিতা)। বৈশাখ ১৩১৭ (২৪-৫-১৯১০)। পৃ. ৪০।

দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়কে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গ-পত্রে কবি লিখিয়াছেন :—

নয়নের আগে মোর মৃত্যু-বিভীষিকা ;
রুগ্ন, ক্ষীণ, অবসন্ন, এ প্রাণ-কণিকা।
ধূলি হ'তে উঠাইয়া বক্ষে নিলে তারে,
কে ক'রেছে তুমি ছাড়া ? আর কেবা পারে ?
কি দিব, কাঙ্গাল আমি ? রোগশয্যোপরি,
গেঁথেছি এ ক্ষুদ্র মালা, বহুকষ্ট করি ;
ধর দীন-উপহার ; এই মোর শেষ ;
কুমার ! করুণানিধে ! দে'খো, র'ল দেশ।

[মৃত্যুর পরে]

৪। **আনন্দময়ী** (আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত)। ১৩১৭ সাল (৫-১০-১৯১০)। পৃ. ৮৬। সারদাচরণ মিত্র-লিখিত ভূমিকা সহ।

"ভগবান্‌কে কন্যারূপে আর কোনও জাতি ভজন করে নি। যশোদার গোপাল, আর মেনকার উমা ভগবান্‌কে সন্তানরূপে পাওয়ার দৃষ্টান্ত। সেই বাৎসল্য ভাবটা পরিস্ফুট ক'রে তোলাই

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ও আছে। প্রেমই নানা আকারে খেলা করে। বাৎসল্য একটা আকার, যে বাৎসল্যে জগৎ চলছে, শুধু দাম্পত্য-প্রেমের ফলে সন্তান জন্মগ্রহণ করতো মানে সৃষ্টি হ'তো, কিন্তু বাৎসল্য না থাকলে সৃজন পর্য্যন্তই থাকতো—পালন আর হ'তো না, একেবারেই সংহার এসে উপস্থিত হ'তো। সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার—এই তিনটি অবস্থার (stage) মধ্যে স্থিতিটাই বাৎসল্য। এই ভাবটা মনে ক'রে বই আরম্ভ করেছি, এই ভাব দিয়েই বই শেষ করবো।" —হাসপাতালের রোজনামচা।

৫। **বিশ্রাম** (কাব্য)। (১০-১০-১৯১০)। পৃ. ৮৭।

৬। **অভয়া** (কাব্য)। ১৩১৭ সাল (৫-১১-১৯১০)। পৃ. ১০১।

৭। **সদ্ভাব-কুসুম** (নীতি-কবিতা)। ইং ১৯১৩ (৩১এ মে)। পৃ. ৪৭।

৮। **শেষ দান** (কাব্য)। ১৩৩৪ সাল (সেপ্টেম্বর ১৯২৭)। পৃ. ১১৩। "কবির অপ্রকাশিতপূর্ব্ব রচনার সঙ্কলন।"

রজনীকান্ত ও বাংলা-সাহিত্য

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যে-রজনীকান্তকে বাংলা দেশে প্রচার করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ যাঁহাকে মৃত্যুশয্যায় আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, বাংলার গীতিকাব্যে তাঁহার যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভগবদ্‌ভক্তির এমন সহজ অনাবিল প্রকাশ ইদানীং কালে আর দেখা যায় নাই। রজনীকান্তের ভগবদ্‌নির্ভরশীলতার গান এক সময়ে সারা বাংলা দেশকে মাতাইয়া দিয়াছিল। এইগুলি এবং অন্যান্য ভাবে কয়েকটি গানের মধ্য দিয়াই রজনীকান্ত চিরজীবী

থাকিবেন। প্রবন্ধ-মধ্যে দুটি গান উদ্ধৃত হইয়াছে, আরও কয়েকটি গান নিম্নে সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিয়া আমরা রজনীকান্ত-প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

'বাণী' ঃ

মা

স্নেহ-বিহ্বল, করুণা-ছলছল,
শিয়রে জাগে কার আঁখি রে!
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে, আশরণ লাগি রে।
শ্রান্ত অবিরত যামিনী-জাগরণে,
অবশ কৃশ তনু মলিন অনশনে;
আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজ সুখে,
তপ্ত তনু মম, করুণা-ভরা বুকে
টানিয়া লয় তুলি', যাতনা-তাপ ভুলি',
বদন-পানে চেয়ে থাকি রে!
করুণে বরষিছে মধুর সান্ত্বনা,
শান্ত করি' মম গভীর যন্ত্রণা;
স্নেহ-অঞ্চলে মুছায়ে আঁখিজল,
ব্যথিত মস্তক চুম্বে অবিরল,
চরণ-ধূলি সাথে, আশীষ রাখে মাথে,
সুপ্ত হৃদি উঠে জাগি রে।
আপনি মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি',
শিয়রে দিল দেখা পুণ্য-স্নেহ রাশি,

বক্ষে ধরি' চির-পীযূষ-নির্ঝর,
নিরাশ্রয়-শিশু-অসীম-নির্ভর ;
নমো নমো নমঃ, জননি দেবি মম !
অচলা মতি পদে মাগি রে !

মিশ্র ইমন—তেওরা

মোহ

(মা গো) এ পাতকী ডুবে যদি যায়
অন্ধকারচিরমরণসিন্ধু-নীরে—
তোমার মহিমা কিছু বাড়িবে না তায় ;
(কত) জ্ঞান, বুদ্ধি বল, স্নেহ, করুণা, দেহ,
স্বাস্থ্য, সাধু-জন-সঙ্গ, বন্ধু, গেহ,
নিষ্কলঙ্ক মন, মধুময় পরিজন,
পুণ্য-চরণ-ধূলি দিয়েছ আমায়।
(মম) সুপ্তহৃদয় করি' নয়ন-নিমীলন,
না করিল তব করুণা-অনুশীলন ;
মোহ ঘিরিল মোরে, রহি' চির-ঘুম-ঘোরে,
ব্যর্থ জীবন গেল ফুরাইয়ে হায় !
(এস) দীনদয়াময়ি ! রক্ষ রক্ষ, লহ
কোলে ; ভীত, হেরি' নরক ভয়াবহ ;
দুষ্কৃত এ পতিতে, হবে গো স্থান দিতে,
অশরণের শরণ শ্রীচরণ-ছায়।

"নিপট কপট তুঁহু শ্যাম—সুর"

আমরা

আমরা, নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট
তবু, আজি সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠ !
জুড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান ;
বিদেশে না যায় ভাই, গোলারি ধান ;
আমরা, মোটা খাব, ভাই রে প'র্‌ব মোটা,
মাখ্‌ব না ল্যাভেণ্ডার চাই নে 'অটো'।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে,
আমরা, রব ।ক উপোসী ঘরে শুয়ে ?
হারাস্‌ নে ভাই রে আর এমন সুদিন ;
মায়ের পায়ের কাছে এসে যোটো ;
ঘরের দিয়ে, আমরা পরের মেঙ্গে,
কিন্‌বো না ঠুন্‌কো কাচ, যায় যে ভেঙ্গে ;
থাক্‌লে, গরীব হ'য়ে, ভাই রে, গরীব চালে,
তাতে হবে নাকো মান খাটো।

মিশ্র বারোঁয়া—কাওয়ালী

'কল্যাণী' ঃ

পাতকী

পাতকী বলিয়ে কি গো, পায়ে ঠেলা ভাল হয় ?
তবে কেন পাপী তাপী, এত আশা ক'রে রয় ?
করিতে এ ধূলাখেলা, অবসান হ'ল বেলা,
যারা এসেছিল সাথে, ফেলে গেল অসময়।

হারাইয়ে লাভে মূলে, মরণের সিন্ধু-কূলে
পথশ্রান্ত দেহখানি টানিয়া এনেছি হায়!
জীবনে কখন আমি, ডাকি নি, হৃদয়-স্বামি!
(তাই) এ অদিনে এ অধীনে ত্যজিবে কি দয়াময়?

মিশ্র বেহাগ—যৎ

কেন?

যদি, মরমে লুকায়ে র'বে, হৃদয়ে শুকায়ে যাবে,
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো?
তব, চরণ-শরণ-তরে, এত ব্যাকুলতা-ভরে,
কেন ধাই, যদি নাহি মিলে গো?

পাপী তাপী কেন সবে, তোমারে ডাকিয়া ক'বে,
মনোব্যথা তুমি না শুনিলে গো?
যদি, মধুর সান্ত্বনা-ভরে তুমি না মুছাবে করে,
কেন ভাসি নয়ন-সলিলে গো?

আনন্দে অনন্ত প্রাণ, করিছে বন্দনা-গান,
অবিশ্রান্ত অনন্ত নিখিলে গো,
ওগো, সকলি কি অর্থহীন। শূন্য, শূন্যে হবে লীন?
তবে কেন সে গীত সৃজিলে গো?

এতই আবেগ প্রভু, ব্যর্থ কি হইবে কভু,
একান্ত ও চরণে সঁপিলে গো?

যদি, পাতকী না পায় গতি, কেন, ত্রিভুবন-পতি,
পতিত-পাবন নাম নিলে গো ?

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

কবে ?

কবে, তৃষিত এ মরু, ছাড়িয়া যাইব,
তোমারি রসাল নন্দনে ;
কবে, তাপিত এ চিত, করিব শীতল,
তোমারি করুণা-চন্দনে !

কবে, তোমাতে হ'য়ে যাব, আমার আমিহারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ,
বিপুল পুলক-স্পন্দনে !

কবে, ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া,
যাত্রা করিব গো, শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না,
কাহারো, আকুল ক্রন্দনে ।

বেহাগ—কাওয়ালী

বুয়ার যুদ্ধ

বুয়ারে ইংরেজে, যুদ্ধ বেধে গেছে,
নিত্য আসিতেছে খবর তার ;

আজ্‌কে এরা ওরে গুঁতুলে বেড়ে ক'রে,
কাল্‌কে ওরা ধ'রে জবর মার!

ভীষণ কি তুমুল কাণ্ড গোল্‌মেলে!
আমরা করি হেথা যুদ্ধ বোলচেলে,
তর্কে হেরে গেলে, মাথায় ঘোল ঢেলে,
ধরিয়ে চৈতন, করি দেশের বা'র।
কামান ছোঁড়ে তারা, সঙীনে মারে খোঁচা
প্রাণটা ধাঁ করে বেরিয়ে যায় সোজা;
কাগজে পড়ি যবে এ সব বিবরণ,
ধড়াস্ ক'রে উঠে প্রাণটা কি কারণ!
চম্‌কে উঠি রেতে দেখিয়ে কুস্বপন,
ঘুমটি ভেঙ্গে, ভয়ে রাত কাবার!

আমরা কোথায় আছি, লড়াই কোথা হয়;
তবু এ প্রাণে যেন সদাই ভয় ভয়!
খবরগুলো যেন, কামান গোলা নিয়ে,
কানের কাছে এসে যায় গো ফেলে দিয়ে;
নয়ন মুদে দেখি, শোণিত নদী, এ কি!
কে যেন ব'লে যায় 'খবরদার!'
সোনার খনি দিয়ে বল কি হবে বাবা;
থাক্‌লে ধড়ে প্রাণ অনেকখানি পাবা,
কেন এ কাটাকাটি, পরাণ বধাবধি?
কেন এ খোঁচাখুঁচি, রক্তে নদানদী?

অনেক দেশ আছে ;—প্রাণটা যদি বাঁচে,
খুঁচিয়ে কেন কর সেটাকে বা'র ?

শ্বশুর, শালী, শালা, শাশুড়ী, মাগ, ছেলে,
বহুত মিলে যাবে, প্রাণটা বেঁচে গেলে ;
পালিয়ে এস চ'লে ও কচু দেশ ফেলে,
দুঃখ যাবে ক'ছিলিম তামাক খেলে,
চেহারা যাবে ফিরে, বেরোবে কালশিঁরে,
ভুঁড়িটা যাবে বেড়ে, চমৎকার !

মিশ্র ইমন্—তেওরা

বুড়ো বাঙ্গাল

[তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রতি]

বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা, ঢাইলা দিচি পায় ;
তোমার লাগে কেম্‌তে পারুম, হৈয়্যা উঠ্‌চে দায় !
আরসি দিচি, কাহই দিচি, গাওমাজনের হাপান দিচি,
চুল বান্দনের ফিত্যা দিচি, আর কি ছাওন যায় ?
বেলোয়ারী-চুরি দিচি, পাছা-পাইর‍্যা কাপর দিচি,
পিরান দিচি, মজা কৈর‍্যা দিবার লাগ্‌চ গায়।
উলের হুতা দিচি আইন্যা, কিসের লাইগা মন্‌ড়া পাইন্যা ?
ওজন কৈর‍্যা ব্যাবাক্ দিচি, পরাণ দিচি ফায় !
বুরা বুরা কৈয়্যা ক্যাবল, খ্যাপাইয়া ক্যান্ করচ পাগল ?

যহন বিয়্যা কোর্‌চ, ফেল্‌বো ক্যাম্‌তে?
কৈয়্যা দ্যাও আমায়।

মিশ্র-সিন্ধু—ঝাঁপতাল

'অভয়া':

অবোধ

বেলা যে ফুরায়ে যায়, খেলা কি ভাঙ্গে না, হায়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!
কে ভুলায়ে বসাইল কপট পাশায়?
সকলি হারিলি তায়, তবু খেলা না ফুরায়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!
পথের সম্বল, গৃহের দান,
বিবেক উজ্জ্বল, সুন্দর প্রাণ,—
তা'কি পণে রাখা যায়, খেলায় তা' কে হারায়?
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!
আসিছে রাতি, কত র'বি মাতি?
সাথীরা যে চ'লে যায়, খেলা ফে'লে চ'লে আয়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রি!

"তুমি গতি তুমি সাব"—সুর

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৮০

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৮৪৪—১৮৯৮

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এখন পর্য্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্যসাধকদের যত জীবনী ও চরিত্র আমরা আলোচনা করিয়াছি, দুই এক জন ছাড়া তাঁহাদের কেহই দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত কর্ম্মবীর ছিলেন না। মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দী কালের (৫৪ বৎসর) জীবনে তিনি যে-সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, অথবা যে-সকল কাজের সূত্রপাত করিয়াছেন, নিরলস অক্লান্ত কর্ম্মী না হইলে কাহারও পক্ষে তাহা করা সম্ভব নয়। এই কর্ম্মবীরের জীবন সাহিত্যসাধনার দিক্ দিয়াও বিচিত্র। তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-চেষ্টা দেশপ্রাণতায় ওতপ্রোত ছিল। তাঁহার আদর্শবাদ বড় ছিল বলিয়াই তাঁহার সাহিত্যসাধনা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে নাই, স্বীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অবিরত সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিচিত্র জীবন-কাহিনী প্রত্যেক বাঙালীর জানা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।

জন্ম : বংশ-পরিচয় : শিক্ষা

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ এপ্রিল (৯ বৈশাখ ১২৫১) তারিখে বিক্রমপুরের অন্তর্গত মাগুরখণ্ড গ্রামে বাঘিয়ার বিখ্যাত গাঙ্গুলী-বংশে দ্বারকানাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা—কৃষ্ণপ্রাণ গঙ্গোপাধ্যায় একজন উচ্চবংশীয় কুলীন ব্রাহ্মণ; মাতা—উদয়তারা দেবী ত্রিপুরা জেলার সামগ্রামবাসী জমিদার রায়-বংশের কন্যা। কৃষ্ণপ্রাণ পরদুঃখকাতর

দয়ালু লোক ছিলেন। উদয়তারা ছিলেন—মনস্বিনী, দৃঢ়চিত্তা ও ধর্ম্মপরায়ণা নারী; তিনি একবার বিপৎসঙ্কুল পথে পদব্রজে ঢাকা হইতে শ্রীক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা করিবার সঙ্কল্প করেন, তাঁহার পতি ও আত্মীয়স্বজন কেহই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। দ্বারকানাথ উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার সহৃদয়তা এবং মাতার সাহস, দৃঢ়চিত্ততা ও ধর্ম্মানুরাগের অধিকারী হইয়াছিলেন।

দরিদ্র কৃষ্ণপ্রাণ জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ফরিদপুরে বাস করিতেন। দ্বারকানাথের লালনপালন ও শিক্ষার ভার ছিল মাতার উপর। মাতা বিদুষী ছিলেন না বটে, কিন্তু পুত্রকে সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও ধর্ম্মভীরু হইতে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা তাহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। দ্বারকানাথ সাত বৎসর পর্য্যন্ত গ্রাম্য পাঠশালায় অতিবাহিত করিয়া স্কুলে পড়িবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। অগত্যা তাঁহার মাতা তাঁহাকে স্বামীর নিকট ফরিদপুরে পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হন। কিন্তু ফরিদপুরের জলবায়ু স্বাস্থ্যের অনুকূল না হওয়ায় দ্বারকানাথ কিছু দিন পরে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর তিনি পার্শ্ববর্ত্তী কালীপাড়া গ্রামের এনট্রান্স স্কুলে প্রবিষ্ট হন।

এই কালীপাড়া স্কুলেই দ্বারকানাথের ভবিষ্যৎ জীবনের গোড়াপত্তন হয়। স্কুলে মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের 'ধর্ম্মনীতি' (১৮৫৬) ও 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার' (১৮৫২-৩) পড়ান হইত। উভয় গ্রন্থেই অবৈধ বিবাহের ফল; অল্প-বয়স্ক, বৃদ্ধ, উৎকট-রোগগ্রস্ত ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদিগের বিবাহের অকর্ত্তব্যতা, অসবর্ণ বিবাহের বৈধতা প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারমূলক নানা বিষয়ের অবতারণা আছে। এগুলির অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত হওয়ায় নানা স্থানে নানা প্রকার আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। দ্বারকানাথ যে স্কুলের ছাত্র, সেই

কালীপাড়া স্কুলেও এরূপ এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি 'শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্তে' (১৮৮৫) দ্বারকানাথেরই বিবৃত এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে কালীপাড়ার স্কুলে ধর্ম্মনীতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার পুস্তকের অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রচলিত হওয়াতে, কতকগুলি ছাত্র একটি সভা স্থাপন করে এবং প্রতিজ্ঞা-পত্রে এই বলিয়া স্বাক্ষর করে যে, 'আমরা এই পুস্তকে লিখিত বিবাহাদির নিয়ম সকল অবলম্বন করিব।' তাহাতে প্রাচীন পক্ষীয়েরা এত রুষ্ট হইয়াছিলেন যে, স্কুল-গৃহ দগ্ধ করিতে উদ্যত হন। কিন্তু ঐ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ ছাত্রেরা কিছুতেই পরাঙ্মুখ হয় নাই। অনেকে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন ঐ নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক চলিতেছেন।

একটি ছাত্রের অভিভাবক তাহাকে বিস্তর তিরস্কার করিয়া কহে, 'যদি তুই সভায় যাস্, তবে তোকে বিনামা প্রহার করিব।' তাহাতে সে বালকটি বড় সদুত্তর করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, 'লোকে অসৎ কর্ম্ম করিয়া জুতা খায়, সেটি কষ্টের বিষয়। কিন্তু আমি সৎ কর্ম্ম করিয়াছি, ইহাতে যদি জুতা খাই, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই ; আমি সভা পরিত্যাগ করিব না।'

উপস্থিত বৃত্তান্তটি সঞ্জীবনী-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি ঐ সময়ে ঐ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি কুলীন। তাঁহার বাটীর প্রত্যেকে পুরুষানুক্রমে ৪০।৫০টি করিয়া বিবাহ করিতেন। কিন্তু বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার ও ধর্ম্মনীতি অধ্যয়ন

করিয়া তাঁহার মনে এটি ঘোরতর দুষ্কর্ম বলিয়া অবধারণ হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'আমি এক বই দুই বিবাহ করিব না।' এ পর্য্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াও চলিতেছেন। পরিবারদের সহিত মনান্তর হওয়াতে তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন।" (পৃ. ১১৮-১৯)

অক্ষয়কুমারের রচনা তাঁহাকে কিরূপ যুক্তি-পথাবলম্বী করিয়াছিল—চিত্তসংশোধন ও মত-পরিবর্ত্তনে সহায়তা করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে দ্বারকানাথ স্বয়ং উত্তরকালে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন :—"ইনিই প্রকাশ্যরূপে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের অবৈধতা, বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের আবশ্যকতা দেশীয় লোকদিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন।... বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলীর ভাব ও চিন্তার গতি ইনি যে পরিমাণে পরিচালিত করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত আর কোন ব্যক্তি সেরূপ পারিয়াছেন কি না সন্দেহস্থল।" ('নববার্ষিকী', পৃ. ১৮৯)

স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা-আন্দোলন

দ্বারকানাথ কালীপাড়া স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি গৃহ ছাড়িয়া কর্ম্মপ্রার্থী হইতে বাধ্য হইলেন। কখন বিক্রমপুরের সোনারং, কখন ফরিদপুরের ওলপুরে শিক্ষকতা করিয়া, তিনি শেষে লোনসিংহ গ্রামে গিয়া স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী হন। এই লোনসিংহে অবস্থানকালেই ১৮৬৯ সনের মে মাসে অবনত নারীজাতির মুক্তি-সাধনায় তাঁহার 'অবলাবান্ধব' প্রচারিত হয়। এই পত্রিকার খ্যাতিই উত্তরকালে জনসমাজে তাঁহাকে 'অবলাবান্ধব দ্বারকানাথ' নামে পরিচিত

করিয়াছিল। কি ঘটনায় 'অবলাবান্ধবে'র উদ্ভব হয়, দ্বারকানাথ স্বীয় পত্রিকাতে তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ঘটনাটি এইরূপ :—

"এ দেশীয় কুলকন্যাগণ জীবনে যে বিষম দুঃখ দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা যাঁহাদিগের চক্ষু আছে, তাঁহাদিগের অগোচর নাই। কিন্তু যাঁহারা চক্ষু থাকিতে অন্ধ, তাঁহারা ইহা দেখিতে পান না। যদি একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা আমাদিগের চক্ষু প্রস্ফুটিত না করিত, হয়ত আমরাও আজীবন অন্ধই থাকিতাম। একটি পরমাসুন্দরী যুবতী কুলীন কন্যাকে তাঁহার আত্মীয়েরা বিষপ্রয়োগ করিয়া বধ করেন। তখন আমাদিগের বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ। লোকপরম্পরায় এই ঘটনা আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইল। এইরূপে যাহার অপমৃত্যু ঘটিল, আমরা তাহাকে জানিতাম; সুতরাং আমাদিগের হৃদয়ে একটি দারুণ আঘাত লাগিল। আমাদিগের জনৈক সমবয়স্ক ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাইলাম, এরূপ ঘটনা বিরল নহে, প্রায় প্রতি বর্ষেই ইহা ঘটিয়া থাকে। অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিলাম, তাঁহার কথা সত্য; তৎপূর্ব্বগত দশ বৎসরে একটি গ্রাম হইতে ৩২।৩৩টি স্ত্রীলোকের এইরূপে মৃত্যু হইয়াছে। মানুষের হৃদয় এককালে পাষাণ না হইলে, এ অবস্থায় দ্রব না হইয়া থাকিতে পারে না। আমরা বাল্যকালে চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোকসকল পাঠ করিয়া স্ত্রীজাতির ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলাম। তাহাদিগকে সর্ব্বদা বিদ্রূপ ও উপহাস করিতে আমাদিগের আমোদ বোধ হইত। কিন্তু তখন বুঝিলাম, ইহারা উপহাসের পাত্র নহে, কৃপার সামগ্রী। এই সময় হইতে স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদের মমতা জন্মিল। তখন ভাবিলাম, যদি বিন্দু পরিমাণেও ইহাদিগের

এই দুঃখ দুর্গতি দূর করিতে পারি, জীবন সার্থক হইবে। এই অভিপ্রায়েই অবলাবান্ধবের জন্ম হয়।” (১৮৯৮, ২রা জুলাই তারিখের 'সঞ্জীবনী'তে উদ্ধৃত)

১৮৭০ সনের প্রথম ভাগে দ্বারকানাথ 'অবলাবান্ধব' লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। "কলিকাতাতে আসিয়া নূতন নূতন লেখকদিগের সাহায্যে অবলাবান্ধবের শক্তি ব্রাহ্মসমাজ-মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে।" শিবনাথ শাস্ত্রীর চেষ্টায় ব্রাহ্ম-মেসে বাস ও ব্রাহ্ম-সংসর্গের ফলে দ্বারকানাথ ক্রমশঃ ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী হইয়া উঠেন এবং অচিরকাল-মধ্যে উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক প্রগতির একজন ধারক হন। এই সময়ে বরিশাল হইতে সমাজ-সংস্কারক দুর্গামোহন দাসের কলিকাতা আগমনে যেন মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন :—

"১৮৭০ কি ১৮৭১ সালে দুর্গামোহন দাস মহাশয় হাইকোর্টে ওকালতি করিবার জন্য কলিকাতাতে আসিলেন। তিনি আসিয়া বসিবা মাত্র কলিকাতায় সমাজসংস্কারার্থী নব্য ব্রাহ্মদলের কেন্দ্রস্বরূপ হইলেন। তাঁহার ভবন ঐ যুবক-দলের এক প্রধান আড্ডা হইয়া উঠিল। তখন 'অবলাবান্ধব'-সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার কাগজ লইয়া কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; এবং নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দ্বারকানাথের পশ্চাতে পরবর্ত্তী সময়ের ডেপুটি কন্‌ট্রোলার-জেনারেল রজনীনাথ রায় প্রভৃতি এক দল যুবক আছেন। ইঁহারা দুর্গামোহন দাসকে পাইয়া, খোঁটার জোরে মেড়ার ন্যায়, বলশালী হইয়া স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই প্রবল আন্দোলন

উপস্থিত করিলেন।" ('রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ,' ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩৩৭)

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে নারীগণের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল পর্দ্দার অন্তরালে। দ্বারকানাথ, দুর্গামোহন দাস, রজনীনাথ রায়, অন্নদাচরণ খাস্তগির প্রমুখ কয়েক জন পরিবারস্থ মহিলাদিগকে লইয়া পর্দ্দার বাহিরে বসিবার ইচ্ছা কেশবচন্দ্রের নিকট প্রকাশ করেন। এই লইয়া আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। শিবনাথ লিখিয়াছেন, "আমার বন্ধু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই স্ত্রী-স্বাধীনতা পক্ষের প্রধান নেতা হইলেন।" কেশবচন্দ্র উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অত্যগ্রসর দল বিলম্ব সহ্য না করিয়া কেবল মন্দিরে আসা বন্ধ নহে, বউবাজারে খাস্তগির-ভবনে স্বতন্ত্রভাবে উপাসনার ব্যবস্থা করিলেন।* কেশবচন্দ্র এ বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' (১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ শক) লিখিলেন:—
"সম্প্রতি ব্রহ্মমন্দিরে স্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্থান লইয়া যে গোলযোগ হইতেছিল, আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে তাহার এক প্রকার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। যেখানে অর্গান বাদ্য আছে তাহার পূর্ব্ব দিকের স্থান রেল দিয়া ঘেরা হইবার কথা হইতেছে।"

স্ত্রী-স্বাধীনতার দল স্বতন্ত্র সমাজ তুলিয়া দিয়া আবার মন্দিরে আসিতে সুরু করিলেন বটে, কিন্তু শীঘ্রই স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও সামাজিক অধিকার লইয়া তাঁহাদের সহিত কেশবচন্দ্রের যে মতভেদ ঘটিল, তাহা আর মিটিল না।

---

* "ব্রহ্মোপাসনা। অন্নদাচরণ খাস্তগির ভবনে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য কর্তৃক বিবৃত হয়। ৩০ ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৭৯৩ শক" (১২-৩-১৮৭২) —'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ শক দ্র°।

১৮৭১, ১লা ফেব্রুয়ারি কেশবচন্দ্র যে "শিক্ষয়িত্রী ও বয়স্থা বিদ্যালয়ে"র স্থচনা করিয়াছিলেন, তাহা এই সময়ে তাঁহার ভারত-আশ্রমে (প্রতিষ্ঠা : ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২) অধিষ্ঠিত ছিল। "ঐ বিদ্যালয় স্ত্রীস্বাধীনতা-পক্ষীয়দিগের মনপূঃত হইল না। কারণ ঐ বিদ্যালয়ে কেশববাবু মহিলাদিগের শিক্ষার যে আদর্শ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা স্ত্রীস্বাধীনতা-পক্ষীয়গণের মতে প্রকৃত আদর্শ অপেক্ষা হীন ছিল। কেশবচন্দ্র নারীদিগকে উচ্চ গণিত, জ্যামিতি, লজিক, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবলম্বিত অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেন না। তিনি শিক্ষা বিষয়ে পুরুষে ও নারীতে ভেদ রাখিতে চাহিতেন। নারীগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া উচিত বোধ করিতেন না। অপর পক্ষ ইহার বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা নারীদিগকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবলম্বিত উচ্চ শিক্ষা দিতে চাহিতেন।" এই কারণে তাঁহারা আশ্রমের মহিলা-বিদ্যালয়ে সন্তুষ্ট না হইয়া নারীগণের উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রসর হইলেন।

মনোমোহন ঘোষ, দুর্গামোহন দাস ও তৎপত্নী ব্রহ্মময়ী প্রভৃতির সহায়তা ও আনুকূল্যে ১৮৭৩ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর ২২নং বেনিয়াপুকুর লেনে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া, মাত্র পাঁচটি ছাত্রী লইয়া 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' নামে একটি বোর্ডিং স্কুলের স্থচনা হইল। বিলাত হইতে নবাগতা কুমারী এক্রয়েড ইহার তত্ত্বাবধায়িকা এবং দ্বারকানাথ পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন। বিদ্যালয়টিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য দ্বারকানাথ তাঁহার দেহ মন নিয়োগ করিলেন। শিবনাথ বলিয়াছেন :—

"১৮৭৩ সালে গাঙ্গুলী ভায়া কুমারী এক্রয়েড নামক নবাগতা স্থশিক্ষিতা ইংরাজ মহিলাকে তত্ত্বাবধায়িকা করিয়া 'হিন্দুমহিলা

বিদ্যালয়' নামে বালিকাদিগের জন্য উচ্চশ্রেণীর এক বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করিলেন। তাহার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা, যানবাহনাদির বন্দোবস্ত করা, পাঠাদির ব্যবস্থা করা, ছাত্রীনিবাসে ছাত্রীগণের আহারাদির ব্যবস্থা করা, তাহাদের পীড়াদির সময়ে চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত করা, প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যের ভার একা গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর পড়িয়া গেল। তিনি আহ্লাদিতচিত্তে সেই সকল শ্রম বহন করিতে লাগিলেন। আমরা দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতাম যে মানুষ এত দূর শ্রম করিতে পারে ইহাই আশ্চর্য্য।" —'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ' (২য় সং); পৃ. ৩৪৩।

১৮৭৫ সনের এপ্রিল মাসে কুমারী এক্রয়েডের সহিত ঐতিহাসিক হেন্‌রি বেভারিজের বিবাহ হয়। ইহার অল্পদিন পরেই—১৮৭৬ সনের মার্চ মাসে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়টি উঠিয়া যায়। কিন্তু দ্বারকানাথ দমিবার পাত্র ছিলেন না; তিনি দুই মাস যাইতে-না-যাইতেই ১লা জুন ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে পূর্ব্বকার আদর্শে আর একটি মহিলা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এবার উহার নাম হইল—বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়। এই কার্য্যে আনন্দমোহন বসু ও দুর্গামোহন দাস আনুকূল্য করিতে কার্পণ্য করেন নাই। দ্বারকানাথ এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন; শিক্ষকতা হইতে আরম্ভ করিয়া কুলীর কাজ পর্য্যন্ত করিয়া গিয়াছেন। এখানে অনুসৃত শিক্ষাপদ্ধতি সরকারী শিক্ষা-বিভাগের প্রশংসা অর্জ্জন করে—"In every sense the most advanced school in Bengal." এই সকল কারণে তাঁহাকে বঙ্গমহিলাগণের উচ্চ শিক্ষার পথপ্রদর্শক বলিলে অন্যায় হয় না। শিক্ষিত ব্রাহ্মগৃহিণীদের অনেকেই হিন্দুমহিলা বিদ্যালয় ও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ভগিনী স্বর্ণপ্রভা বসু (আনন্দমোহনের

পত্নী), দুর্গামোহন দাসের দুই কন্যা—লেডী অবলা বসু (জগদীশচন্দ্রের পত্নী) ও সরলা রায় (ডঃ প্রসন্নকুমার রায়ের পত্নী), গিরিজাকুমারী সেন (শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী), ব্রজকিশোর বসুর কন্যা—কাদম্বিনী বসু (দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী) ও শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা দেবীর নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৭৮ সনের ১লা আগষ্ট বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় বেথুন স্কুলের সহিত মিলিত হইয়া যায়।*

নারীকল্যাণ-কার্য্যে দ্বারকানাথের প্রচেষ্টা এইখানেই শেষ নহে। ১৮৭৯ সনে (৬ আশ্বিন ১২৮৬) তিনি ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীটে 'বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন। সভার উদ্দেশ্য ছিল—"বিক্রমপুরের নৈতিক উন্নতি, স্ত্রীশিক্ষা ও অন্যান্য হিতকর কার্য্য সাধন এবং আপাততঃ মুখ্যরূপে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার।" তিনি এই সভার সভাপতি ছিলেন। সম্মিলনীর উদ্যোগে প্রথম বর্ষেই বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামে কয়েকটি বালিকা-বিদ্যালয়ের সূচনা হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম বার্ষিক বিবরণে নারীজাতির শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে দ্বারকানাথ তাঁহার ধারণা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন ; তিনি লেখেন :—

> "আর একটি গুরুতর বিষয়েও এই সভা ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা এবং অন্যান্য স্ত্রীশিক্ষা সভা হইতে ভিন্ন প্রণালীতে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। যাঁহারা এই সভার যত্নে শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারিবেন। ইহা প্রত্যাশা করা যায় না। যদি সে সম্ভাবনা থাকিত

* হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় ও বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় সম্বন্ধে শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।—'প্রবাসী,' শ্রাবণ ১৩৫৭ দ্রষ্টব্য।

তাহা হইলেও ইহা বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক হইত যে, কোন্ বিষয় অগ্রে এবং কোন্ বিষয় পশ্চাৎ শিক্ষা করিলে অল্প সময়ে অধিক সুফল লাভ হইতে পারে। এইরূপ স্থির চিন্তা করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা করা সকল সময়ে এবং সর্ব্বাবস্থায়ই একান্ত আবশ্যক। কিন্তু যখন আমাদিগের দেশের স্ত্রালোকের পাণ্ডিত্যজ্ঞাপক শিক্ষালাভের সম্ভাবনা নাই তখন কেবল মাত্র চিরাচরিত পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া অগ্রে ইহাই বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত, কোন্ কোন্ বিষয়ে শিক্ষিত ও সদুপদিষ্ট হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। এই সভা আত্মবিবেচনায় যত দূর নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে ইতিহাস ও ভূগোল পাঠের বর্ত্তমান রীতি এককালে পরিত্যাগ করা শ্রেয় বোধ করিয়াছেন।

* * *

ব্যাকরণ যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে তাহাও সভার বিবেচনায় অনেক পরিমাণে পণ্ডশ্রম মাত্র। ব্যাকরণের পূর্ব্বে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, শিক্ষাপ্রণালী নির্দ্ধারণকালে এইটা অনেকে বিস্মৃত হইয়া যান। ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত যে ভাষার অনেক দূর শিক্ষা করা যাইতে পারে, তাহা তাঁহাদিগের স্মরণ থাকে না। তাঁহারা নিতান্ত সুকুমারমতি বালক বালিকাদিগকেও ব্যাকরণের দুর্ব্বোধ ও নীরস নিয়মগুলি কণ্ঠস্থ করাইতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এইরূপে যে সময় ব্যয় হইয়া থাকে তাহা যদি ভাষা শিক্ষায় ব্যয় করা যায় আমাদিগের বিবেচনায় শতগুণ সুফল লাভ হইতে পারে। এই সকল চিন্তা করিয়া সভা নিম্নশ্রেণীতে ব্যাকরণের পাঠনা এককালে রহিত করিয়াছেন।

* * *

যে প্রণালীতে ইতিহাস লিখিত হইয়া থাকে, তাহা পাঠ করিয়া কুলকন্যাদিগের কোন উপকারের সম্ভাবনা আছে, এমত বোধ হয় না। তবে যদি প্রকৃত রাজনৈতিক ও জাতীয় উন্নতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়, প্রাপ্তবয়স্কা শিক্ষিতা কুলকন্যাগণ তাহা পাঠ করিতে পারেন। ভূগোলের স্থূল জ্ঞান থাকা আবশ্যক বটে; কিন্তু বয়স্কা কুলকন্যাগণ সে জ্ঞান মানচিত্র দেখিয়া তিন চারি দিবসে অনায়াসে উপার্জ্জন করিতে পারেন। তজ্জন্য বর্ত্তমান রীতিতে বহু পরিশ্রম করিয়া ভূগোল অধ্যয়ন করিবার কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। যাঁহারা নিজ দেহের রক্তবাহী শিরাসকলের নির্দ্দিষ্ট স্থান অবগত নহেন, তাঁহাদিগকে সাইবেরিয়ার বিজন প্রান্তরবাহী নদীসমূহের নামমালা কণ্ঠস্থ করাইয়া কি ফল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন দেশের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভৌগোলিক বিবরণ কণ্ঠস্থ করা অপেক্ষা দেহতত্ত্বের কিঞ্চিৎ বিবরণ পরিজ্ঞাত হইলে যে অধিক উপকারের সম্ভাবনা আছে, তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে।" ('বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার প্রথম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, ১২৮৬-৮৭')

আর একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত দ্বারকানাথ কিছু কাল বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; উহা—ব্রাহ্ম বালিকা-বিদ্যালয়। ১৮৯০ সনের মে মাসে ইহা স্থাপিত হয়। চারি বৎসর পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আর্থিক অনটনের জন্য বিদ্যালয়টি তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিলে, ধনী না হইয়াও দ্বারকানাথই উহার জীবনরক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিলেন; ১৮৯৫ সন হইতে উহার সর্ব্বপ্রকার আর্থিক দায়িত্ব সানন্দে নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শেষ পর্য্যন্ত

বিদ্যালয়টিকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমৃত্যু উহার সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন।

"নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জ্জনেও দ্বারকানাথের উৎসাহ বড় কম ছিল না। জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই দ্বারকানাথ নারীগণের ডেলিগেট হইবার দাবী লইয়া আন্দোলন উপস্থিত করেন ও পঞ্চম অধিবেশন হইবার পূর্ব্বেই কংগ্রেস সেই দাবী পূরণ করাতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের যে পঞ্চম অধিবেশন হয় তাহাতে ছয় জন মহিলা ডেলিগেটরূপে উপস্থিত হন—তন্মধ্যে দ্বারকানাথের পত্নী কাদম্বিনী অন্যতমা ছিলেন।···দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সুপ্রসিদ্ধা মহিলা লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী ঘোষালও ডেলিগেটের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন।"*

রাজনীতিক্ষেত্রে

দ্বারকানাথ দেশের রাজনীতির চর্চাতেও উদাসীন ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠায় তাঁহাব উদ্যোগিতা, 'সঞ্জীবনী' প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন এবং জাতীয় মহাসমিতির কার্য্যে সহায়তা সাধন বিশেষভাবে স্মরণীয়।

"কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের আনুগত্য না করিয়া সাধারণভাবে সকল সম্প্রদায়ের ও সর্ব্বপ্রকার অবস্থার লোকের ন্যায়মতে কল্যাণ সাধন করা"—এই উদ্দেশ্য লইয়া আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবিশেষ যত্নে, এবং দ্বারকানাথ, শিবনাথ-প্রমুখ

* প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়: 'বাংলার নারী-জাগরণ,' পৃ. ৮৭।

কতিপয় উৎসাহী সভ্যের আন্তরিক সহায়তায় ১৮৭৬ সনের ২৬এ জুলাই কলিকাতায় (৯৩ কলেজ ষ্ট্রীট) ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারত-সভার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সভার সূচনায় সভাপতি ছিলেন—শ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকার, সম্পাদক—আনন্দমোহন বসু, যুগ্ম-সহকারী সম্পাদক—'সাধারণী'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও 'আর্য্যদর্শন'-সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। দ্বারকানাথ আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁহাকে আমরা ১৮৭৬-৭৮ ও ১৮৮১ সনে ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য, এবং ১৮৮২-৯৮ সনে সহকারী সম্পাদক-রূপে দেখিতে পাই। অনেক সময় বিপদ্ মাথায় করিয়া ভারত-সভার কাজে তাঁহাকে বিদেশ যাত্রা করিতে হইয়াছে। ১৮৮৬ সনের জুলাই মাসের কথা। দ্বারকানাথ সভার তরফ হইতে চা-বাগানে কুলীদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য আসামে গিয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে চা-কর অঞ্চলে কিরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয—তাঁহার গতিবিধির উপর কিরূপ সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল, শিবনাথ তাহা লিখিয়া গিয়াছেন :—

"তাঁহার প্রকৃতিই এই ছিল যে, যে-কার্য্যে হাত দিতেন তাহা প্রাণ মনের সহিত করিতেন। একবার তিনি আসামের কুলীদিগের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য স্বয়ং আসামে গমন করিলেন। তখন বর্ষা-কাল সমাগত, ব্রহ্মপুত্র জলপূর্ণ হইয়া দুই ধার প্লাবিত করিতেছে ; যাতায়াত দুঃসাধ্য, তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য কত অনুরোধ করা গেল, তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না ; জলে ঝড়ে প্লাবনে স্বকার্য্য সাধনে রত রহিলেন। এক দিন পথে চলিতে চলিতে নদীর স্রোতে জলমগ্ন হইলেন। সে দিন অতি কষ্টে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইল। তথাপি তাঁহার উৎসাহ বা কার্য্যতৎপরতার বিরাম

হইল না। সেই কার্য্যেই প্রবৃত্ত রহিলেন। ওদিকে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি আসামে কেন, এই বলিয়া সর্ব্বত্রই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তিনি যেখানেই যান সঙ্গে সঙ্গে পুলিস; অধিকাংশ স্থলে ডেপুটি কমিশনরগণ বাঙ্গালি ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতে তাঁহার বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করেন।

এইরূপ অসুবিধার মধ্যে কার্য্য করিয়াও তিনি চা-বাগানের কুলীদের বিষয়ে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিলেন; এবং সঞ্জীবনীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই হতভাগ্য কুলীদের দুরবস্থার বিষয়ে লোকে অজ্ঞ ছিল, তাঁহার প্রেরিত সংবাদে লোকের চিত্ত চমকিয়া উঠিল, কুলীদের রক্ষার জন্য মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দিন দিন কুলীসংক্রান্ত মোকদ্দমার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট কুলী আইনের সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ঐ আইন সংশোধন করিয়াও এক্ষণে যাহা আছে তাহাও নির্দ্দোষ নহে। এখনও হতভাগ্য কুলীগণ না জানিয়া আপনাদিগকে দাসত্বে বিক্রয় করিয়া বন্দীদশাতে দিন যাপন করিতেছে। আর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় নাই, তাহাদের জন্য কাঁদিবার লোকও নাই।" ('রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ,' ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩৪৪। এই প্রসঙ্গে শিবনাথের 'আত্মচরিত'ও দ্রষ্টব্য)

প্রকৃতপক্ষে ভারত-সভার কার্য্যে "অক্লান্তকর্ম্মী" দ্বারকানাথ দেশপ্রাণ সুরেন্দ্রনাথের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার *A Nation in Making* গ্রন্থে দ্বারকানাথ সম্বন্ধে যে প্রশস্তি করিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য; তিনি লিখিয়াছেন :—

"Associated with us in our efforts to organise a new Association upon popular lines was a devoted worker, comparatively unknown then, and, I fear, even now, whose memory deserves to be rescued from oblivion. His co-operation in the organization of the new Association was of great value, to us; and so long as health and strength were spared to him he worked in the cause of the Association with an energy and devotion, the memory of which, now that he is dead, his friends cherish with affectionate gratitude."

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা

কর্ম্মবীর দ্বারকানাথ "যখন রাজনীতি ক্ষেত্রে বীরের ন্যায় কার্য্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় ও তাঁহার আশ্চর্য্য কার্য্যশক্তি আর এক দিকে ব্যাপৃত ছিল।"

কেবল স্ত্রীস্বাধীনতা বা স্ত্রীশিক্ষা নহে, আদেশবাদ, নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া কেশবচন্দ্র ও তাঁহার দলের সহিত যুবক ব্রাহ্মদলের মতভেদ এবং তজ্জনিত বিচ্ছেদ দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল। শেষে ১৮৭৮, ৬ই মার্চ কেশবচন্দ্র যখন অনেকটা হিন্দু-মতে কুচবিহার রাজপরিবারে অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যার বিবাহ দিলেন, তখন বিরোধ চরমে পৌঁছিল। প্রতিপক্ষের প্রতিবাদ-ধ্বনি উঠিল—তিনি বিবাহযোগ্য বয়সের পূর্ব্বেই কন্যা-সম্প্রদান করিয়া ব্রাহ্ম-বিবাহবিধি লঙ্ঘন করিয়াছেন। দলাদলির অন্ধতায় শিবনাথ 'এই কি ব্রাহ্মবিবাহ' লিখিলেন; আনন্দচন্দ্র মিত্র ছদ্ম নামে 'কপালে ছিল

বিয়ে কাঁদ্‌লে হবে কি?' নামে নাটিকা লিখিয়া আচার্য্য-পত্নীর প্রতিও লঘুভাবে শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতে লজ্জিত হইলেন না। আন্দোলন চালাইবার জন্য কুচবিহার-বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বেই 'সমালোচক' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক-পত্রের উদ্ভব হইয়াছিল; শিবনাথ তাহার দুই-তিন সংখ্যা পরিচালন করিবার পর দ্বারকানাথ সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়া প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিলেন; "কেবল তাহা নহে, সে সময়ের বিবাদ বিসম্বাদে তিনি অগ্রণী হইতে লাগিলেন।" কেশবচন্দ্রকে আচার্য্যের পদ হইতে, এমন কি, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক-পদ হইতেও অপসৃত করিবার চেষ্টা চলিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া বিরোধী দল তাঁহাকে বর্জন করিয়া, ১৮৭৮ সনের ১৫ই মে টাউন-হলে সভা করিয়া 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামে একটি স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল ভাঙিয়া দুই ভাগ হইয়া গেল। শিবনাথ সত্যই লিখিয়া গিয়াছেন, ইহার প্রতিষ্ঠার সময় দ্বারকানাথ "ইহার একজন প্রধান সারথি ছিলেন।" তিনি প্রথমে ১৮৮৩ সনে ও পরে ১৮৯৬ হইতে ১৮৯৮ সনে মৃত্যু পর্য্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের কার্য্য সুচারুভাবে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

সাহিত্য-সেবা

দ্বারকানাথ কেবল মাত্র রাজনীতির চর্চা বা ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারেই জীবন অতিবাহিত করিয়া যান নাই। এত কার্য্যের মধ্যেও বাংলা-সাহিত্যে তিনি যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা পরিমাণে বিপুল না হউক—অকিঞ্চিৎকরও নহে। তিনি কোন দিনই নামের কাঙাল

ছিলেন না ; তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থেই গ্রন্থকার বা সংগ্রাহক হিসাবে তাঁহার নামের উল্লেখ নাই। গ্রন্থকার হিসাবে তিনি কিরূপ নিরভিমানী ছিলেন, তাঁহার লিখিত একখানি পত্রে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'জন্মভূমি' পত্রিকার পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত "বাঙ্গালা ভাষার লেখক" প্রবন্ধের জন্য তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী চাহিয়া পাঠাইলে তিনি কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিয়াছিলেন :—

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮।

সবিনয় নিবেদন,—

আপনার অনুগ্রহ-পত্র পাইয়া বিশেষ বাধিত হইলাম। কস্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমি এমন কিছু কাজ করি নাই, যাহা আপনার ইতিহাসে উল্লেখের যোগ্য। আমি বীরনারী ও সুরুচির কুটীর নামক দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছিলাম, এবং নববার্ষিকী বলিয়া আর একখানি বিবিধ বিষয় সম্বলিত গ্রন্থ প্রতি বৎসর প্রকাশ করিবার সূচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু যদিও প্রথম দুইখানি গ্রন্থ ভাষান্তরিত হইয়া ভারতের অন্য স্থানে কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, উহার কোনও একখানি বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতে আদৃত হইয়াছে বলিতে পারি না। সুতরাং এই অবস্থায় আমার নাম প্রতিষ্ঠাভাজন গ্রন্থকারদিগের সহিত সংযুক্ত না করাই শ্রেয়ঃ। উহাতে আপনার প্রবন্ধের গৌরব লাঘব হইবারই সম্ভাবনা। এই কারণে আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারিয়া লজ্জিত হইতেছি। আশা করি, আমার এই অনিবার্য্য ত্রুটি ক্ষমা করিবেন ; আর এক কথা এই, আমার জীবনে স্মরণ-যোগ্য এমন কোন কাজ হয় নাই, যাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন বহু কাল

পূর্ব্বে আমাকে লিখিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর জীবনে তিনটি স্মরণীয় কার্য্য আছে। প্রথম জন্ম, দ্বিতীয় বিবাহ, তৃতীয় মৃত্যু। আমার জীবনে প্রথম দুইটি ঘটিয়াছে। তৃতীয়টি এখনও ঘটে নাই। তবে যাঁহারা জগতের হিতে রত না থাকিয়া, কেবল আপনার চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা জীবিতাবস্থায়ও মৃত। সেই হিসাবে মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমিও মৃতসংখ্যার মধ্যে গণ্য।

নিবেদক

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়*

গ্রন্থাবলী : আমরা দ্বারকানাথের গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **পদ্যমালা**। ইং ১৮৬৯।

"পদ্যমালা। শ্রী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত, ও বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত। এই পুস্তক একখানি অনতিবৃহৎ চম্পূ কাব্য। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য সৃষ্টি, পরোপকারশক্তি প্রভৃতি কতকগুলি হিতকর বিষয় লইয়া গ্রন্থকার আদ্যোপান্ত পদ্যেতে রচনা করিয়াছেন। পুস্তকখানির সমুদায় অংশই গ্রন্থকারের সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। বর্ণনার আড়ম্বর নাই, কল্পনার তীক্ষ্ণতা নাই; গ্রন্থকার কেবল স্পৃহণীয় সাধু ভাবে আর্দ্র হইয়া পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, এই জন্য ইহা পাঠমাত্রেই পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ করে ও সদ্ভাব জাগ্রৎ করিয়া দেয়। এইরূপ পদ্যময় পুস্তক বাঙ্গলা

* 'জন্মভূমি,' পৌষ ১৩০৪ দ্রষ্টব্য।

বিদ্যালয়ে প্রবেশ করান উচিত ; তাহা হইলে বালকগণের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব ম্লান হইতে পারে না।”—‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,’ অগ্রহায়ণ ১৭৯১ শক।

২। **বীর-নারী** (ঐতিহাসিক নাটক)। ১২৮১ সাল (১৫ মার্চ ১৮৭৫)। পৃ. ৭৫।

নাটকে গ্রন্থকারের নাম নাই ; বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-মতে ইহার স্বত্বাধিকারী—মুসলমানপাড়া লেনের দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত। ‘বীর-নারী’ রায়-যন্ত্রে মুদ্রিত ও ক্যানিং লাইব্রেরির যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। “উৎসর্গ” পত্রে আছে—“স্নেহপ্রবণ-হৃদয়া শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু [আনন্দমোহন বসুর সহধর্ম্মিণী] ও শ্রীমতী বিধুমুখী রায় [রজনীনাথ রায়ের পত্নী] করকমলেষু।” নাটকখানি চারি অঙ্কে সমাপ্ত ; ইহার শেষ গানখানি—“সোনার ভারত আজ যবনাধিকারে” দ্বারকানাথের পরবর্ত্তী গ্রন্থ ‘জাতীয় সঙ্গীতে’ স্থান লাভ করিযাছে।

৩। **জাতীয় সঙ্গীত,** ১ম ভাগ। ইং ১৮৭৬ (২৯ ফেব্রুয়ারি)। পৃ. ৪২।

নানা স্থান হইতে সংগৃহীত “স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীত-মালা”। জাতীয় সঙ্গীতের ইহাই সর্ব্বপ্রথম সংগ্রহ-পুস্তক। সংগ্রহকার (নাম নাই) পুস্তকের “বিজ্ঞাপনে” লিখিয়াছেন :—“এই ‘জাতীয়-সঙ্গীত’ প্রচারের উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা যাইবে।···যদি এই গ্রন্থ দ্বারা অন্ততঃ এক ব্যক্তিরও স্বদেশানুরাগ উদ্দীপ্ত হয় সংগ্রাহক কৃতার্থ হইবেন এবং সামাজিক ও বিশুদ্ধ প্রণয়-ঘটিত সঙ্গীত সকল সংগ্রহ করিয়া জাতীয়-সঙ্গীতের অপর ভাগ প্রকাশ করিবেন। এই গ্রন্থ

বিক্রয় দ্বারা কিছু লাভ হইলে তাহা কোন প্রকার জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত ব্যয় হইবে, সংগ্রাহকের এই আকাঙ্ক্ষা রহিল।"

'জাতীয় সঙ্গীতে' দ্বারকানাথের আটটি গান আছে। একটি 'বীর-নারী' হইতে গৃহীত; বাকী সাতটি—"না জাগিলে সব ভারত-ললনা" প্রভৃতির শেষে রচয়িতার নামের স্থলে "(অপ্রকাশিত)" বলিয়া উল্লেখ আছে। এগুলি দ্বারকানাথেরই রচিত; ইহার পাঁচটি ১২৯১ সালে প্রকাশিত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়-সঙ্কলিত 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী'র "জাতীয় সঙ্গীত"-বিভাগে দ্বারকানাথেরই নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

১২৮৫ সালের ভাদ্র (ইং ১৮৭৮) মাসে 'জাতীয় সঙ্গীতে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের চারিটি নূতন সঙ্গীত সংযোজিত হইয়াছে।

৪। **জীবনালেখ্য** (জীবনী)। ১২৮৩ সাল (৫-১২-১৮৭৬) পৃ. ১১৪।

"শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাসের সহধর্ম্মিণী ব্রহ্মময়ীর সংক্ষেপ জীবন বৃত্তান্ত"। ব্রহ্মময়ী ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জ্যেঠাই-মা।

৫। **নববার্ষিকী**। ১২৮৪ সাল (৭ জুলাই ১৮৭৭)। পৃ. ২৭০ + ৫।

"বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় ও সাময়িক খ্যাতিমান ব্যক্তিদিগের সংক্ষেপ জীবনী সম্বলিত"। বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম 'ইয়ার বুক'।

৬। **সুরুচির কুটীর** (উপন্যাস):

১ম ভাগ। মাঘ ১২৮৬ (জানুয়ারি ১৮৮০)। পৃ. ৭৪।

২য় ভাগ। ১২৯১ সাল (১১-৮-১৮৮৪)। পৃ. ১১৮।

উপন্যাসখানির প্রথম ভাগ "মাঘোৎসবের উপহার"-রূপে প্রথমে ১৮৮০ সনের জানুয়ারি মাসে প্রচারিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ডিসেম্বর

মাসে ইহার ২য় সংস্করণ 'মেরী কার্পেণ্টার গ্রন্থাবলী'ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়; গ্রন্থের "বিজ্ঞাপন"টি এইরূপ :—

"জাতীয় ভারতসভার [ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন] স্থাপয়িত্রী কুমারী মেরী কার্পেণ্টার লোকান্তরিত হইলে তাঁহার তিচিহ্ন রাখিবার জন্য তদীয় সম্মানিত নামে বঙ্গীয় মহিলাদিগের পাঠোপযোগী গ্রন্থাবলী প্রচারের প্রস্তাব হয়। আশা করা যাইতেছে যে দ্বিতীয় সম্বৎসর প্রচারিত বর্ত্তমান গ্রন্থ বঙ্গকামিনীগণের সাহিত্য শিক্ষার বিশেষ উপযোগী হইবে।—শ্রীমনোমোহন ঘোষ। এম্, এস্, নাইট। জাতীয় ভারতসভার বঙ্গশাখার অবৈতনিক সম্পাদক।"

১ম ভাগ 'সুরুচির কুটীর' পাঠ করিযা মনীষী রাজনারায়ণ বসু তাঁহার "দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি"তে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"২৪ ভাদ্র ১৮০২ শক : অদ্য সুরুচির কুটীর পাঠ সমাপ্ত করি। ইহাতে উপন্যাস ছলে অল্প আয়ে সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের এবং পরোপকার সাধনের উপায় সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। এই উপন্যাসটি নীরস বিষয় কর্ম্মের প্রণালী অনুসারে লিখিত হইয়াছে, "In a businesslike manner"। যে যে স্থানে ভাবের উচ্ছ্বাস হওয়া কর্ত্তব্য, সে সকল স্থান অতি নীরস ভাবে লিখিত হইয়াছে। এমন যে সুরেশ ও সুরুচির প্রথম প্রণয়ালাপ তাহা লোকে যেমন পাট্টা কবুলিয়ত লেখা কার্য্য সম্পাদন করে, সেইরূপ প্রকারে সম্পাদিত হইয়াছে; তাহাতে ভাবের লেশ মাত্র নাই। এই উপন্যাসটি [মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের] 'সুশীলার উপাখ্যানের' ন্যায় সাধারণ হিন্দু সমাজের উপযোগী করিয়া লেখা হয় নাই; কেবল ব্রাহ্মদিগের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। যাহা হউক, উহা

হইতে আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্য অর্থসঞ্চয় ও পরোপকার বিষয়ে অমূল্য উপদেশ লাভ করিতে পারেন।”—‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’, কার্ত্তিক ১৮০৭ শক।

২য় ভাগ ‘সুরুচির কুটীরে’ গল্পচ্ছলে শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের আলোচনা আছে। ইতিহাস সম্বন্ধে দ্বারকানাথ বলিতেছেন :—

“কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সুরীতিসঙ্গ ইতিহাসের নিতান্ত অপ্রতুল। রাজবংশ ও রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের নীরস নামমালা ও জীবন বিবরণেই ইতিহাসের অস্থিপঞ্জর গঠন করা হয়। পূর্ব্বে রাজ্যেশ্বরই রাজ্যের সর্ব্বস্ব বলিয়া গণ্য হইতেন, রাজ্যে যে প্রজার কোন অধিকার আছে, রাজা তাহা স্বীকার করিতেন না, প্রজারও সে বোধ ছিল না। সুতরাং প্রাচীন ইতিহাস রাজাদিগের জীবনের ইতিবৃত্ত মাত্র, সমাজস্থিতির প্রায় কোন বিবরণই তাহাতে নাই। কিন্তু এখন রাজা রাজ্যের সর্ব্বাধিকারী বলিয়া গণ্য নহেন, প্রজাবর্গেরই রাজ্যের উপর সর্ব্ব প্রধান অধিকার। প্রজাবর্গকে লইয়াই রাজ্য ও সমাজ সংগঠিত হয়, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আধুনিক ইতিহাসও রাজা ও রাজপ্রতিনিধিদিগের বিবরণেই পরিপূর্ণ। আমেরিকার আধুনিক ইতিহাস-লেখকেরা এই দোষ কিয়দংশে পরিহার করিয়াছেন ; কিন্তু আমাদিগের দেশের ইতিহাস-লেখকদিগের চক্ষে ইহা বোধ হয় এখনও দোষ বলিয়া গণ্য হয় নাই।” (পৃ. ৫৩)

‘সুরুচির কুটীর’ বহুল প্রচারিত উপন্যাস। গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় ইহার প্রথম ভাগের ২য় সংস্করণ ১৮৮০ সনের ডিসেম্বর মাসে ও ৩য় সংস্করণ ১৮৮৪ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে ১৯০০ সনে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে প্রচারিত হয় ; ইহাতে “দ্বারকানাথ

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী" [কৃষ্ণকুমার মিত্র-লিখিত ?] স্থান পাইয়াছে।

পাঠ্য পুস্তক ঃ দ্বারকানাথ বালক-বালিকাদের জন্য সুপ্রণালীতে রচিত কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এগুলির রচনায় তিনি যথেষ্ট চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার সঙ্কলিত ও রচিত বাংলা পাঠ্য পুস্তকগুলিব একটি তালিকা দিলাম ঃ—

১। **'কবিগাথা'** জাতীয় পাঠ্য পুস্তকাবলী (সঙ্কলন) ঃ আশ্বিন ১২৮৪ (ইং ১৮৭৭)।

এই পুস্তকের "ভূমিকা" হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ; ইহা হইতে পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইবে ঃ—

"বালক বালিকাবা যে সকল উৎকৃষ্ট কবিতা পাঠ করিলে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষানুরত স্বদেশবৎসল, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সৎসাহসী ও সত্যনিষ্ঠ হইতে পাবে, তাহাদিগেব নিকট এরূপ ভাবের কবিতাই অধিক পরিমাণে উপস্থিত কবা আবশ্যক। প্রচলিত যাবতীয় গ্রন্থ অপেক্ষা বর্ত্তমান সংগ্রহে এ বিষয়ে যে অধিকতর দৃষ্টি রাখা হইযাছে, আশা করি, তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত থাকিবে না। স্বদেশানুরাগ উদ্দীপক যে কয়েকটি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা সঙ্কলন সময়ে আমি একটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি ; প্রচলিত শাসনতন্ত্রেব প্রতি বিরাগ প্রদর্শনকে কেহ কেহ স্বদেশানুরাগিতার লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। এই ভ্রম সংস্কার যে অনেক প্রকার অমঙ্গলেব হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অনেকে আমাদিগের রাজভক্তি দেখিয়া মনে করিতে পারেন, পরাধীনতাই আমাদিগের পূজ্য, বস্তুতঃ তাহা নহে।

জাতীয় স্বার্থ আমাদিগের রাজভক্তির মূল—বর্ত্তমান সময়ে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শাসনতন্ত্র আমরা আশা করিতে পারি না বলিয়া আমরা প্রচলিত শাসনতন্ত্রে সন্তুষ্ট। অধিকন্তু ইংরাজ রাজত্বে যে সকল দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা তাহার প্রকৃতিগত নহে; প্রচলিত শাসনতন্ত্রের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করিয়া বৈধ উপায়ে চেষ্টা করিলে ক্রমে তাহা সংশোধিত হইতে পারে। যে সকল অভ্যাস-দোষ নিবন্ধন আমরা এত দূর হেয় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছি, সর্ব্বাগ্রে আমাদিগের তাহা সংশোধন করা আবশ্যক; আত্মশুদ্ধি ভিন্ন জাতীয় উন্নতির পথে আমাদিগের অভ্যুত্থানের প্রত্যাশা নাই। অতএব যে সকল ভাব কষ্ট-কল্পনায়ও রাজভক্তির প্রতিকূল বলিয়া গণ্য হইতে পারে, আমি যত্নপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। যে সকল ভাব হৃদয়ে নিহিত ও উদ্দীপিত হইলে প্রকৃতপক্ষে আমাদিগের জাতীয় অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা কেবলমাত্র তাহাই সমাবেশিত হইয়াছে।”

২। **‘শিশুর সদাচার’**। (১৯ জানুয়ারি ১৮৮০)। পৃ. ৩০।

৩। **‘কবিতামালা’** জাতীয় পাঠ্য পুস্তকাবলী (সঙ্কলন):
১ম ভাগ···শ্রাবণ ১২৮৭ (ইং ১৮৮০)।
২য় ভাগ···

৪। **সুলভ পাটীগণিত**। (২৭ ডিসেম্বর ১৮৮১)। পৃ. ৪২৮।

৫। **শিক্ষাপ্রবেশ**: ১ম ও ২য় ভাগ।

৬। **স্বাস্থ্যতত্ত্ব**।

গান: দ্বারকানাথ সঙ্গীত-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পরপদানত ভীরু বাঙ্গালীর প্রাণে উৎসাহ ও সাহস সঞ্চারের আশায় তিনি ‘জাতীয়

সঙ্গীত' নামে সঙ্গীত-সংগ্রহ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। 'জাতীয় সঙ্গীতে'র ২য় ভাগে সামাজিক ও বিশুদ্ধ প্রণয়ঘটিত সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল, কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠে নাই। তবে 'ভারতীয় সঙ্গীত-মুক্তাবলী'র "সামাজিক সঙ্গীত"-বিভাগে তাঁহার রচিত দুইটি গান আছে। দ্বারকানাথ অনেকগুলি ব্রাহ্মসঙ্গীতেরও রচয়িতা; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীতে' তাঁহার চারিটি গান মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বাঙ্গালীর গানে' তাঁহার রচিত বিবিধবিষয়ক পনরটি গানের মধ্যে ৩টি 'জাতীয় সঙ্গীত,' ১টি 'ব্রহ্মসঙ্গীত' ও ২টি 'ভারতীয় সঙ্গীত-মুক্তাবলী'র সামাজিক সঙ্গীত-বিভাগে পূর্ব্বেই স্থান লাভ করিয়াছিল।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা দ্বারকানাথের তিনটি সুপরিচিত গান নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।
অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি,
হও "বীরজায়া, বীরপ্রসবিনী।"
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীরগুণ গাঁথা, বিক্রম কাহিনী,
স্তন্য দুগ্ধ যবে পিয়াও জননি।
বীরগর্ব্বে তার, নাচুক্ ধমনী,
তোরা না করিলে এ মহা সাধনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি

কি পাপে পাঠালে বিধি করে বঙ্গনারী।
প্রকৃতিরঞ্জিত ছবি জন-মনোহারী॥
জলে স্থলে শূন্যে একা, স্বরূপ লাবণ্য মাখা,
এ পোড়া নয়ন আছে দেখিতে না পারি।
পিঞ্জরের পাখীসম, দিবানিশি অষ্ট যাম,
ঘুরে ফিরে এক ঠাঁই, বার বার তা নেহারি।
সেই বাড়ী সেই ঘর, সেই দ্বার নিরন্তর,
দেখে দেখে ক্লান্ত আঁখি আর ত দেখিতে নারি।
এ চক্ষের কি এই ফল, দিবানিশি অশ্রুজল,
বহিছে অজস্রধারে, যেন নির্ঝরের বারি।
মোরে অন্ধকারে রাখ, প্রকৃতির রূপ ঢাক,
তামসী নিশার সম ঘোর আঁধার প্রসারি॥

বেহাগ, আড়া

এ গৃহ-উদ্যানে, নাথ, পুন তোমারি নিদেশে
ফুটিল নব কুসুম, সু-নব রঞ্জিত বেশে;
আজ যে শয্যায় শোয়া, সম্বল ক্রন্দন "ওঁয়া"
চলিবে বলিবে ক্রমে, তোমারি শুভ আশীষে।
এ কোমল কলেবর, হবে পুষ্ট দৃঢ়তর,
কত আশা, কত চিন্তা, কালে উদিবে মানসে।
পৌরুষ-প্রধান ধীর, ধর্ম্মযুদ্ধে ক'রো বীর,
দেশের কল্যাণে প্রাণ যেন উৎসর্গে হরষে।
অশান্তির অশ্রুজল, এ কোমল গণ্ডস্থল,
ভাসায় না যেন আর, পূর্ণ ক'রো অভিলাষে।

সাময়িকপত্র পরিচালন

সাময়িকপত্র-সম্পাদনেও দ্বারকানাথের বিলক্ষণ দক্ষতা ছিল। তাঁহার পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

অবলাবন্ধু: কি অবস্থায় এই পত্রিকার উদ্ভব হয়, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 'অবলাবান্ধব' পাক্ষিক পত্রিকা, ঢাকা সুলভযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া সম্পাদকের কর্ম্মস্থল লোনসিংহ হইতে প্রকাশিত হইত। এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন ঢাকার অভয়কুমার দাসের পুত্র প্রাণকুমার ও আরও কতিপয় উৎসাহী যুবক। 'অবলাবান্ধবে'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—২২ মে ১৮৬৯ (১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬)। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে (১৯এ জ্যৈষ্ঠ) প্রকাশ :—

> অবলা বান্ধব।—এখানি পাক্ষিক পত্র। গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ অবধি ঢাকা সুলভ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৪ টাকা। শ্রীযুত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক। সংসারে স্ত্রীলোকের উপযোগিতা ও স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা করাই এতৎ পত্রের উদ্দেশ্য। এই শ্লোকেই তাহার স্পষ্ট ভাব ব্যক্ত হইতেছে। যথা :—
>
> 'সন্তুষ্টো ভার্য্যা ভর্ত্তা,
> ভর্ত্তা ভার্য্যা তথৈবচ।
> যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং,
> কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবহ।'
>
> প্রথম সংখ্যার লেখাও মন্দ হয় নাই।

পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দ্বারকানাথ প্রথম সংখ্যায় যে বিস্তৃত আলোচনা করেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য ; তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"আমাদিগের আত্মক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া অবলাবান্ধব প্রচারিত হইল না। যে অসীম ক্ষমতাবানের ইচ্ছায় দুর্ব্বল দেহে নববলের সঞ্চার হইতেছে, নিতান্ত অক্ষমেরও মহাক্ষমতা জন্মিতেছে, সেই পূর্ণ ক্ষমতাবান মহাপুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই আমরা এই প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 'এ কথায় যাহাদিগের অসুখ জন্মায়, আমরা তাহাদিগের প্রত্যাশী নহি। এ স্থলে ইহা বলাও অসঙ্গত নহে, আমরা যে সমাজের পক্ষ সমর্থন করিতে উপস্থিত হইতেছি, সেই স্ত্রী সমাজের সহিত বাল্যকাল হইতে আমাদিগের বিলক্ষণ আপ্যায়িততা আছে, আত্মীয়তা ধর্ম্মে তাঁহারা আমাদিগের নিকট অনেক মনোগত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাদিগের কোন বিষয়ে কিরূপ রুচি আমরা অভিনিবেশ চিত্তে তাহা নিরীক্ষণ করিয়াছি, বামাকুলের অনেক গুণ দোষ আমাদিগের নিকট স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত আছে সুতরাং অবলাবান্ধব তাহাদিগের নিতান্ত অযোগ্য প্রতিনিধি হইবে না ভরসা হইতেছে, কিন্তু আমাদিগের বাক্য পাঠক সমাজে কত দুর আদৃত হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। জনসাধারণে আমাদিগের পরামর্শ অধিক পরিমাণে আশু গ্রহণ করিবে এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না, স্ত্রীজাতির প্রকৃত মঙ্গল কামনা করেন এমন লোকের সংখ্যা বঙ্গদেশে অতি অল্প আছে। কুলকামিনীদিগকে অবজ্ঞা করা অধিকাংশ লোকেরই প্রকৃতি, কতকগুলা লোকের প্রকৃতি এত তীব্র যে, নারীদিগের মঙ্গলার্থক একটি বাক্য শুনিলেও নিতান্ত বিরক্ত হন। যিনি ওরূপ কথা উত্থাপন করেন তাহাকে বিদ্রূপ ও

অপমান কবিতে ক্রুটি করেন না। মেয়ে মানুষের পক্ষ সমর্থন করেন বিধায় তাঁহাদিগকে "মেগে" বলিয়া উপহাস করেন। এ সকল লোকের নিকট অবলাবান্ধবের যত আদর হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। বঙ্গবাসিনী কামিনীদিগের মঙ্গল কামনায় ও পক্ষ রক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়াতে তাহারা ঐ বিদ্রূপার্থক উপাধি হয়ত আমাদিগকেও প্রদান করিবেন। কিন্তু আমরা তজ্জন্য কিছুমাত্র রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইব না; বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুচ্চ সম্মানাত্মক উপাধি হইতেও উহাকে অধিক আদর ও গৌরবের চিহ্ন মনে করিব।

এক্ষণে যে যে বিষয়ে প্রধান লক্ষ্য বাখিয়া অবলাবান্ধব প্রচারিত হইল তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। যাহাতে বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হয়, তাহাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, আত্মকর্ত্তব্যবিধারণের ক্ষমতা জন্মে, সামাজিক ও পারিবারিক সুখের বৃদ্ধি হয়, সমাজ ও পরিবার মধ্যে তাহাদিগের ঈশ্বরানুমোদিত যে সকল প্রকৃত অধিকার আছে, তাহা অব্যাহতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাদিগের দুর্নীতি দূর হইয়া সুনীতি সংস্থাপিত হয়, আত্মার প্রকৃত উন্নতি হয়, এবং বিদ্যা বিষয়ে সবিশেষ অনুবাগ জন্মে, তাহার নিয়ত চেষ্টাই আলোচনা করিবার জন্যই অবলাবান্ধবের জন্ম হইল। যে সকল কীর্ত্তিমতী প্রসিদ্ধা নারীদিগের জীবনবৃত্তান্ত এই সকল উদ্দেশ্য রক্ষার অনুকূল হইবে, সময়ে২ তাহাও পত্রিকাস্থ করা যাইবে। এবং যে সকল শুশ্রূষণীয় সংবাদ রমণীদিগের বিশেষ জ্ঞাতব্য ও উপকারক, সংবাদ স্তম্ভে কেবল তাহাই গৃহীত হইবে। এই সকল বিশেষ লক্ষ্য ব্যতীত সাধারণ হিতকর বিষয় সমূহের সমালোচনা পক্ষেও অবলাবান্ধব উদাসীন থাকিবে না। অবলাবলীর

রচনাবলী প্রকাশ করাও অবলাবান্ধবের এক কর্ত্তব্য পরিগণিত হইবে।

স্ত্রীদিগকে দেববৎ পূজা করিবার জন্য এই পত্রিকা প্রচারিত হইল কেহ যেন এরূপ মনে করেন না। এতদ্দেশীয় অবলাদিগকে ভগিনীবৎ শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিয়া তাহাদিগের মঙ্গল বর্দ্ধন করাই আমাদিগের অভিপ্রায়। আমরা তাঁহাদিগের গুণের যেরূপ গৌরব ও প্রতিষ্ঠা করিব, দোষেরও সেইরূপ উল্লেখ করিয়া তন্নিরাকরণ চেষ্টা পাইব।

উপসংহার কালে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে নমস্কার করিয়া প্রার্থনা এই, যাহাতে অবলাবান্ধবের এই সকল উদ্দেশ্য রক্ষা পাইয়া ইহার দীর্ঘজীবন হয়, তিনি এমন ক্ষমতা প্রদান করুন।"

শিবনাথ শাস্ত্রীর গদ্য-পদ্য রচনা 'অবলাবান্ধবে' প্রকাশিত হইত। তিনি লিখিয়াছেন :—

"প্রাণকুমার দাস একবার কলিকাতাতে আসিয়া আমাদের কয়েক জনকে 'অবলাবান্ধবে' মধ্যে মধ্যে লিখিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া গেলেন। আমরা 'অবলাবান্ধব' পড়িয়া অবাক হইতে লাগিলাম। কোন্ দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে এ কোন্ ব্যক্তি নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতি সম্বন্ধে এরূপ উদার মত ব্যক্ত করিতেছেন। ক্রমে গাঙ্গুলি ভায়া তাঁর কলিকাতাবাসী প্রবন্ধলেখক বন্ধুদিগকে দেখিবার জন্য একবার সহরে আসিলেন। আমরা আমাদের 'হীরোকে' দেখিয়া লইলাম! বন্ধু সমাগমে স্থির হইল যে অবলাবান্ধব কলিকাতায় তুলিয়া আনা হইবে।"

১৮৭০ সনের প্রথম ভাগে দ্বারকানাথ 'অবলাবান্ধব' লইয়া কলিকাতায় আসেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র (বৈশাখ ১২৭৭)

নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি হইতে ইহার আভাস পাওয়া যায় :—

"অবলাবান্ধব পত্রে শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ীর দানের একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার দানশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত পত্রের মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপনের সাহায্যার্থে ৫০৲ টাকা ও যাওয়া-আসার পাথেয় বলিয়া ২৫৲ টাকা সমুদয়ে ৭৫৲ টাকা তিনি পুনরায় দান করিয়াছেন।"

'অবলাবান্ধব' কলিকাতা হইতে প্রচারিত হইতে লাগিল। ঢাকার বন্ধুগণের সাহায্য-বিরহিত হওয়ায় পত্রিকা-সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্যের ভার একা দ্বারকানাথের উপর পড়িল ; তিনি সোৎসাহে দিন রাত্রি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা পাঠে জানা যায়, ৬ষ্ঠ বর্ষের ১ম সংখ্যা 'অবলাবান্ধব' মাসিক আকারে ১২৮১ সালের শ্রাবণ মাসে (৩০ জুলাই ১৮৭৪) প্রকাশিত হয়। অর্থাভাবে ঐ বৎসরেই পত্রিকাখানির বিলুপ্তি ঘটে। দ্বারকানাথ 'নববার্ষিকী'তে লিখিয়াছেন :—

"১৮৬৯ অব্দের মে মাসে অবলাবান্ধব নামক আর একখানি পত্র ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এক বৎসরান্তর কলিকাতায় উঠিয়া আইসে এবং পাঁচ বৎসর কাল প্রকাশিত হইয়া অর্থাভাবে ইহার প্রচার রহিত হয়। এই পত্রের লেখকেরা স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী এবং স্ত্রীপুরুষের শিক্ষাগত অপ্রমাণিত পার্থক্য রক্ষার বিরোধী ছিলেন।"

ইহার পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৭৯ সনের প্রথম ভাগে, দ্বারকানাথ মাসিক আকারে নব পর্য্যায় 'অবলাবান্ধব' প্রকাশ করিয়াছিলেন। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় ইহার ১ম খণ্ড, ৭ম-৮ম সংখ্যার প্রকাশ-কাল—২০ নবেম্বর ১৮৭৯। ইহাও দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই।

'সমালোচক'ঃ ১৮৭৮ সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি 'ইণ্ডিয়ান মীরারে' কুচবিহার-বিবাহ-সুনিশ্চিত বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইলে কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রগতিবাদী ব্রাহ্ম-দল তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। মুখ্যতঃ এই আন্দোলন চালাইবার জন্যই 'সমালোচকে'র আবির্ভাব। ইহা একখানি সাপ্তাহিক পত্র; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ (৬ ফাল্গুন ১২৮৪)। দুর্গামোহন দাস ও আনন্দমোহন বসুর অর্থানুকূল্যে 'সমালোচক' প্রকাশিত হইত। প্রথম দুই-তিন সপ্তাহ শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হইবার পর দ্বারকানাথ ইহার সম্পাদক হন। শিবনাথের 'আত্মচরিতে' প্রকাশ:—"এদিকে আমি বড় নরম লোক বলিয়া বন্ধুরা আমার হাত হইতে 'সমালোচক' তুলিয়া লইয়া দ্বারিকবাবুর হাতে দিলেন। তিনি একেবারে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যত দূর স্মরণ হয়, সে সময় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, ৯৩ কলেজ ষ্ট্রীটে আমাদের সঙ্গে থাকিতেন, তিনি দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির সহিত একযোগে সমালোচকের ভার লইলেন।" দ্বারকানাথ দুই বৎসর 'সমালোচক' সম্পাদন করিয়াছিলেন।

'সঞ্জীবনী': সংবাদপত্র-জগতে 'সঞ্জীবনী'র নাম সুপ্রসিদ্ধ। প্রধানতঃ সমাজনীতি ও রাজনীতির আন্দোলনের জন্য দ্বারকানাথই কয়েক জন বন্ধুর সহযোগে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন; তিনিই ইহার প্রথম সম্পাদক। 'সঞ্জবীনী'র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১৫ এপ্রিল ১৮৮৩ (৩ বৈশাখ ১২৯০)। দ্বারকানাথের মৃত্যুতে 'সঞ্জীবনী' লিখিয়াছিলেন:—

> "খ্যাতনামা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সঞ্জবীনীর জন্মদাতা ও স্বত্বাধিকারীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন,...যখন সঞ্জীবনীর সৃষ্টি হয়, তখন হইতে তিনি ইহার চালক ও রক্ষকদিগের মধ্যে এক জন ছিলেন।"

দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ

প্রগতিশীল ব্রাহ্ম-দলে যোগদানের বহু পূর্ব্বেই হিন্দুমতে দ্বারকানাথের প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা ১৮৬২ কি ১৮৬৩ সনের কথা। ১৮৭০ সনে তিনি যখন কলিকাতায় আসেন, তখন মৃতদ্বার। ইহার বহু দিন পরে, ১৮৮৩ সনের প্রথমার্দ্ধে, প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে, তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ কবেন। পাত্রী—বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী ও ১৮৮২ সনে উত্তীর্ণা কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েটদ্বয়ের অন্যতরা কাদম্বিনী বসু; ইনি ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের মাতুল ব্রজকিশোর বসুব কন্যা। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে ২০-২১ বৎসর বয়স্কা তরুণীর পাণিগ্রহণ দ্বারকানাথের বন্ধুবর্গ মনে মনে অনুমোদন করিতে পারেন নাই। আর্য্যনারীসমাজের মুখপত্র 'পরিচারিকা'র (জ্যৈষ্ঠ ১২৯০) নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে তাহাই মনে হয়:—

"সংবাদ।—বি. এ. পরীক্ষোত্তীর্ণা শ্রীমতী কাদম্বিনী বসুর সঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছে, শুনিলাম এই বিবাহে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু র‍্যাংলার, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি. এ., শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এম. এ., শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন বাবু প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণ নিমন্ত্রিত হইয়াও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বিবাহসভায় উপস্থিত হন নাই। শুনা যায় দ্বারি বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটরি, অথচ তাঁহার বিবাহে সাধারণ সমাজের উচ্চশ্রেণীর সভ্য ও

প্রচারকগণ উপস্থিত হইলেন না। কেন যে উপস্থিত হইলেন না তাহা আমরা বুঝিতে কষ্ট পাই।"

"নারীগণ চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা না করিলে নারীজাতিসুলভ নানা প্রকার কঠিন পীড়ার সুচিকিৎসা হইতে পারে না এবং নারীজাতির স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের পথ উন্মুক্ত হইবে না, এ জন্য তিনি সর্ব্বপ্রথমে আপনার পত্নীকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন।" বিবাহের পর তাঁহার পত্নী পাঁচ বৎসর মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। দ্বারকানাথ তাঁহাকে চিকিৎসাশাস্ত্রে আরও উচ্চশিক্ষা দানের অভিপ্রায়ে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। কাদম্বিনী এডিনবরা ও গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল. আর. সি. পি. ও এল. আর. সি. এস. উপাধি লাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন।

মৃত্যু ; চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

দ্বারকানাথ কিছু দিন হইতে যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন। ১৮৯৮ সনের জুন মাসে এই পীড়া গুরুতর আকার ধারণ করে। তিনি ২৭এ জুন, সোমবার, শেষ রাত্রে (১৩ আষাঢ় ১৩০৫), মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে, পরলোকগমন করেন। এই তেজস্বী পুরুষের তিরোধানে 'সঞ্জীবনী' পরবর্ত্তী ২রা জুলাই যে শোক-সংবাদ প্রকাশ করেন, তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি ; ইহা হইতে তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে :—

"আজ শত্রু মিত্র সকলেই হায় হায় করিতেছেন, একজন মানুষের মত মানুষই আমাদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইলেন।...

তাঁহার প্রকৃতি এই ছিল যে, তিনি যাহা একবার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেন, তাহার সাধনে ফলাফল, লাভালাভ, স্তুতি নিন্দা কিছুই গণনা করিতেন না।...

তাঁহার প্রকৃতিতে এই একটা মহৎ গুণ ছিল যে, তিনি যে কার্য্যে মন দিতেন, তাহাতে সমগ্র হৃদয় মনের শক্তি দিতেন, অর্দ্ধেক হৃদয় দিয়া দুর্ব্বলভাবে কাজ করিতে পারিতেন না। সাহস ও সত্যনিষ্ঠাতে তিনি বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যিনি যত বড় লোকই হউন না কেন, তাঁহাকে স্পষ্ট কথাটি বলিতে ও তাঁহার সমক্ষে নিজ কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপরে দাঁড়াইতে কিছু মাত্র ভীত হইতেন না। শত্রু, মিত্র সকলকেই আজ বলিতে হইবে, গাঙ্গুলি ডরাইবার ছেলে ছিলেন না। তোষামোদ, পদস্থ ব্যক্তির উপযাচকতা, পদগৌরবের লোভ এ সকল তাঁহাতে ছিল না। তাঁহার অতি বড় শত্রুও এ কথা বলিতে পারিবেন না যে, গাঙ্গুলি কাপুরুষের ন্যায় গোপনে, পরোক্ষে কাহাকেও আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার মহৎ মন এরূপ নীচাশয়তার অনেক উপরে বাস করিত। তাঁহার নির্ভীকতা ও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানের অনেক নিদর্শন আছে, সে সকল শুনিলে বাঙ্গালীর রক্তেও মনুষ্যত্বের স্পৃহা উদ্দীপ্ত হয়।...

একবার দ্বারকানাথ বৈঠকখানার রাস্তায় একটি গলির সম্মুখে রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া একজন বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। এমন সময়ে একখানি গাড়ী আসিয়া ঐ গলির মুখে লাগিল। গাঙ্গুলি দেখিলেন, একজন ইংরাজ গাড়ী হইতে নামিয়া গলির মধ্যে গেলেন। গাড়ীর গাড়োয়ান "সাহেব ভাড়া, সাহেব ভাড়া" বলিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল।

ইংরাজটি ফিরিয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত। সে পশ্চাতে সরিয়া পড়িল। এইরূপে সে সঙ্গে যায়, ইংরাজ তাড়া করে ও সে সরিয়া পড়ে। অবশেষে সে গাঙ্গুলি মহাশয়ের সাহায্য চাহিল। গাঙ্গুলি তাহাকে বলিলেন, "চল সাহেবের নাম জিজ্ঞাসা করি ও বাড়ীর নম্বর দেখি, কাল ওর নামে নালিশ করিস, আমি সাক্ষী দিব।" এই বলিয়া ইংরাজটির নিকটে তাহার নাম জানিতে চাহিলেন। সে নাম দিল না, পরন্তু তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। গাঙ্গুলি মহাশয় আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। দুই জনে খুব ঘুষাঘুষি চলিল। এই ব্যাপার ঐ ইংরাজের দ্বারের সম্মুখে চলিল। তৎক্ষণাৎ তাহার ভবন হইতে অপর তিন চারি জন ইংরাজ আসিয়া মধ্যস্থ হইলেন ও গাড়োয়ানের ভাড়া দিতে চাহিলেন। বিবাদ থামিয়া গেলে, প্রথমোক্ত ইংরাজ যখন গাঙ্গুলি মহাশয়ের সহিত শেক্‌হাণ্ড করিতে আসিল, তখন তিনি বলিলেন, আমি তোমার মত কাপুরুষের সহিত শেক্‌হাণ্ড করি না। ইহা এক দিনের একটি ঘটনা মাত্র। এরূপ ঘটনা আরও অনেক আছে। অন্যায় নিবারণের জন্য তিনি প্রাণকে প্রাণ জ্ঞান করিতেন না। তাঁহার অনেক গুণের কথাই মনে হইতেছে। যে তাঁহার ঘোর শত্রু, তাহাকেও কেহ অন্যায়রূপে নিন্দা করিতেছে দেখিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য অগ্রসর হইতেন। অপরকে কোনও স্বার্থত্যাগ করিতে বলিবার পূর্ব্বে নিজে তাহা করিতেন ; নিজে যাহা করিতেন না, তাহা কাহাকেও করিতে বলিতেন না। অধিক কি বলিব, তিনি আপাদমস্তক নিরেট ও খাঁটি ছিলেন। তাঁহার সমক্ষে রাজাধিরাজ রাজাও যাহা, আর একজন দীন দরিদ্রও তাহা ছিল। মানুষের মনুষ্যত্বের আদর করিতে এরূপ কাহাকেও দেখি নাই।

আমরা তাঁহার বন্ধু বলিয়া কি তাঁহার দোষ দেখি নাই? তাঁহার ন্যায় তেজীয়ান জীয়ন্ত প্রকৃতিতে গুণ ও দোষ দু-ই উৎকট হইয়া থাকে। তাঁহার অত্যুজ্জ্বল গুণাবলীর মধ্যে তাঁহার দোষও দেখিয়াছি। তাহার উল্লেখের সময় এ নয়।...এডওয়ার্ড আর্ভিংএর মৃত্যু হইলে তাঁহার সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ কার্লাইল যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

"That here once more was a genuine man sent into this our ungenuine phantasmagory of a world, which would go to ruin without such :—"

অর্থ—"আমাদের এই কৃত্রিমতাপূর্ণ ও ছায়াময় জগতে একজন খাঁটি মানুষ আসিয়াছিল, এরূপ মানুষ মধ্যে মধ্যে না আসিলে জগৎ মাটি হইয়া যাইত।" ঠিক কথা! ঠিক কথা! কৃত্রিমতাপূর্ণ জগতে এই সকল অকৃত্রিম মানুষ বড়ই স্পৃহণীয়, বড়ই আদরণীয়, বড়ই প্রয়োজনীয়। বিধাতা করুন, আমরা মধ্যে মধ্যে এরূপ মানুষ পাই।"

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৮১

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়
দীনেন্দ্রকুমার রায়

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়
দীনেন্দ্রকুমার রায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

১৮৬২—১৯৩৮

ঔপন্যাসিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান যুগের পাঠক-সমাজে প্রায় অপরিচিত হইলেও এক সময়ে বাংলা দেশের তরুণ-সমাজ ও অন্তঃপুরে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। তাঁহার 'রঙ্গমহাল,' 'শীশ্ মহল,' 'নূরমহল,' 'রূপের মূল্য' প্রভৃতি কাহিনী রোমান্স-প্রিয় বাঙালীকে কিছু কাল যে মাতাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য আমরাই দিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র যে-গগনে দ্যুতিমান্ ছিলেন, হরিসাধনের সাধনা সেখানে তাঁহাকে পৌঁছাইতে না পারিলেও তাঁহার সাহিত্যকর্ম্ম যুগাধিক কাল বাঙালী মাত্রেরই আনন্দবিধান করিয়াছিল, ইহাও কম গৌরবের বিষয় নয়। বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার কালে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে তিনি বাংলায় প্রথমিক ঐতিহাসিক লেখকদের প্রায় সমসাময়িক। তাঁহার সুবৃহৎ 'কলিকাতা—সেকালের ও একালের' গ্রন্থখানি বহু তথ্য ও কিম্বদন্তীর সমাবেশে আজিও আকর-গ্রন্থের খ্যাতি লাভ করিয়া থাকে। হরিসাধনের ভাষা ও লিখনভঙ্গী চিত্তাকর্ষক ছিল। এই ভাষাগুণেই দুর্ভেদ্য মোগল-অন্তঃপুরের রহস্য পাঠকের কাছে তিনি প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান করাইতে পারিতেন। হরিসাধনের নাট্যপ্রতিভায় বঙ্গরঙ্গমঞ্চ কিছু কাল প্রদীপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি অনেক নাটক লিখিয়া সে খ্যাতি দীর্ঘস্থায়ী করিতে পারেন নাই। হরিসাধনের

বইগুলিও আজ সহজলভ্য নয় আমার মনে হয়, তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইলে গল্পপ্রিয় পাঠক-সমাজের কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে।

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

১২৬৯ সালের ১লা ভাদ্র শুভ জন্মাষ্টমীর দিন রাত্রে (১৬ আগষ্ট ১৮৬২) হরিসাধনের জন্ম হয়। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এক জন বঙ্গদেশপূজ্য নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। ইনি নদীয়াধিপ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের একজন বিশিষ্ট সভাসদ্ ছিলেন। হরিসাধনেব জন্মস্থান খিদিরপুর ভূকৈলাসে। এই খিদিবপুরই কবিবর হেমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন ও রঙ্গলালের লীলাক্ষেত্র।

হরিসাধন এক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃদেব গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের আদিনিবাস শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতায় আসেন ও ভূকৈলাসে এক বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করেন।

শিক্ষা ঃ বিবাহ ঃ চাকুরী

১৮৭৫ সনের নবেম্বর মাসে হরিসাধন খিদিরপুর-স্কুল হইতে ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি লাভ কবেন। এই সময় তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৮২ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি হেয়ার-স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। হরিসাধন এল. এ পড়িবার জন্য প্রথমে ডভ্‌টন কলেজে কিছু দিন অধ্যয়ন করিয়া, পরে সিটি কলেজে তাঁহার কলেজ-জীবনের অবসান করেন। সংসারের বোঝা ঘাড়ে পড়ায় তিনি চাকরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দীর্ঘ

৩৫ বৎসর যোগ্যতার সহিত সরকারী কর্ম্ম করিয়া ১৯১৯ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাহিত্যসেবা

বাল্যকাল হইতেই হরিসাধন সাহিত্যানুরাগী। তাঁহার বয়স যখন ২৩, সেই সময়ে মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার রচনা প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, "আমি আমার প্রথম রচনা লইয়া 'নবজীবনে' প্রথম আত্মপ্রকাশ করি।" 'নবজীবন' অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত সেকালের একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র। হরিসাধনের রচনাটির নাম—"প্রাচীন কলিকাতা," উহা ১২৯১ সালের ফাল্গুন-সংখ্যায় প্রথম প্রবন্ধ-রূপে মুদ্রিত হয়। ইহার অনতিকাল পূর্ব্বে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা ও 'প্রচার'-সম্পাদক রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। সাহিত্যিক জীবনের গোড়ার কথা হরিসাধন তাঁহার স্মৃতিকথায়* এইরূপ বলিয়াছেন :—

"যে দিন রাখালবাবুর গৃহে বসিয়া, অদূরবর্ত্তী সম্মুখের বৈঠকখানায় সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমবাবুকে প্রথম দেখি, সে দিন বুঝিলাম, তীর্থদর্শনের ফল হইল। সরলপ্রাণ, সুহৃদ্‌ভক্ত রাখালবাবু আমার ন্যায় অধমকে তাঁহার শ্বশুরের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলেন। আমি সেই সৌম্যমূর্ত্তি, প্রতিভার জীবন্ত আদর্শ সাহিত্য সম্রাটের চরণ বন্দনা করিয়া কৃতার্থ হইলাম। বঙ্কিমবাবুর পরিধানে একখানি পট্টবস্ত্র, গায়ে একখানি গরদের নামাবলী—বোধ হইল যেন 'ভবানী পাঠক' কিম্বা 'সত্যানন্দ' আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

* ১৯২৩ সনে বঙ্কুবিহারী ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'সুখের বাসরে'র ২য় সংস্করণে সংযোজিত হরিসাধনের সংক্ষিপ্ত জীবনী দ্রষ্টব্য।

রাখালবাবু পরিচয় করাইয়া দিলে, সাহিত্য-সম্রাট মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন—'হাঁ, ওঁর লেখা নবজীবনে আমি পড়েছি, বেশ হচ্ছে।'…সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের উৎসাহবাণী, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসন্ন ভাব ও চরণধূলি, আমার মত দীনাতিদীন ক্ষমতাশূন্য লেখককে খুবই উৎসাহিত করিয়া তুলিল। আমি চিরদিনই বঙ্কিমের একজন অন্ধ অনুরাগী।

এই সময় আমি 'প্রচারে'র জন্য "ধ্বংসতরু" নামে একটি প্রবন্ধ লিখি। এই ধ্বংসতরুই লর্ড কার্জ্জনের Tree of Destruction. এই ধ্বংসতরু যেখানে ছিল, লর্ড কার্জ্জন সেই স্থানটি Duel Avenue বলিয়া চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন। ··এই ধ্বংসতরু compose হইবার পর, রাখালবাবু তাঁহার শ্বশুরকে প্রুফটি পড়াইয়া শুনান। প্রবন্ধটি পড়িয়া বঙ্কিমবাবু খুবই সন্তুষ্ট হন এক দিন রাখালবাবুর কাছে গিয়াছি, এমন সময় রাখালবাবু বলিলেন—'কর্ত্তা তোমাকে ডেকেছেন। চল তোমায় তাঁর কাছে নিয়ে যাই। তোমাব আর্টিকেল সম্বন্ধে তিনি কিছু বলতে চান।'

আমার তো ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। ভাবিলাম, হয়ত ভাষাগত, না-হয় ঘটনাগত কি গলদ আছে, তার জন্য এখনই তিরস্কৃত হইব। সাহসে বুক বাঁধিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের পদধূলি লইয়া তাঁহার কাছে বসিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—'তোমার আর্টিকেলটা রাখাল আমায় দেখতে দিয়েছিল। আগাগোড়া পড়েছি। লেখায় বেশ research আছে। কিন্তু ফুটনোটে অত reference দিয়েছ কেন?'

আমি তখন সাহসে ভর করিয়া বলিলাম,—'আমরা নূতন লেখক। যদি কেউ বিশ্বাস না করে, এই জন্যে—'

বঙ্কিমবাবুর চক্ষুদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'কি! নিজের Personality-তে তোমার বিশ্বাস নাই? যে পারে, সে তোমার লেখা contradict করুক। তখন তুমি তোমার নজীর দেখাইও।'

আমি থতমত খাইয়া বলিলাম—'আজ্ঞা তাই ঠিক! আমরা শিক্ষানবিস, এই জন্য এই সব ঘটেছে।'

ইহার পরই 'প্রচারে' "নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন" [১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, মাঘ ১২৯১] বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের একটি লেখা বাহির হয়। ইহাতে আমাদের মত সেকালের নব্য লেখকদের জন্য কয়েকটি উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বঙ্গদেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, ঘটনাচক্রে পড়িয়া 'প্রচারে'র প্রচার সহসা বন্ধ হইয়া যায়। এই ধ্বংসতরু পরে পরিবর্ত্তিত আকারে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ভারতী'তে ['ভারতী ও বালক,' মাঘ ১২৯৬] প্রকাশ হইয়াছিল। 'নবজীবনে' "প্রাচীন কলিকাতা" অর্থাৎ পলাশী আমলের কলিকাতার একটি চিত্র ছিল। তাহার পর আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের উপদেশে আমি প্রাচীন কলিকাতার নবাবী আমলের বড় বড় বাঙালীদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করি। নন্দকুমার সম্বন্ধে ['ভারতী'তে] লিখিবার সময় কাশীমবাজারের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু ও মহারাজ নবকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারি। পরে এই অনুসন্ধানের ফলে 'নবজীবনে' "কাশীম-বাজার রাজবংশ" "জগৎশেঠ" প্রভৃতি সুদীর্ঘ নিবন্ধ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে অঘোরনাথ কুমার-পরিচালিত 'নববিভাকর ও সাধারণী'তে কলিকাতার ঠাকুর-বংশের ইতিহাসও প্রকাশিত হয়।"

১২৯২ সাল হইতে হরিসাধনের রচনা স্বর্ণকুমারী দেবী-সম্পাদিত 'ভারতী' ও 'ভারতী ও বালকে' নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১২৯৭ সাল হইতেই বোধ হয়, তিনি গল্প-রচনায় বিশেষ ভাবে মনঃসংযোগ করেন। 'ভারতী,' 'ভ্রমর,' 'সাহিত্য,' 'সাধনা,' 'প্রদীপ,' 'ঐতিহাসিক চিত্র,' 'প্রবাসী,' 'ভারতবর্ষ,' 'জাহ্নবী,' 'অর্চ্চনা,' 'মানসী,' 'বসুধা' প্রভৃতি মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় হরিসাধনের নানাবিষয়ক বহু রচনার সন্ধান মিলিবে।

গ্রন্থাবলী

হরিসাধন প্রায় ৫০ খানি উপন্যাস ও সহস্রাধিক পৃষ্ঠার একখানি কলিকাতার ইতিহাসের রচয়িতা। ইহা ছাড়া তাঁহার তিনখানি নাট্যগ্রন্থও আছে, এগুলি ন্যাশনাল, কোহিনূর, থেস্‌পিয়ান্‌ ইউনিক প্রভৃতি অধুনা-লুপ্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনিত হইয়াছিল। স্বদেশীর যুগে চাঁদ রায়, কেদার রায়-সম্পর্কীয় তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক 'বঙ্গবিক্রম' ন্যাশনাল থিয়েটারেব অভিনয়-নৈপুণ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। আমরা হরিসাধনের গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি।

১। **পঞ্চপুষ্প** বা পাঁচটি ক্ষুদ্র উপন্যাস। ১২৯৯ সাল (৪-১০-১৮৯২)। পৃ ১৩৪।

সূচী: আলেখ্য, হত্যাকাবী কে? একটি স্মরণীয় ঘটনা, রুধিবোৎসব, লাল বাব দোষাবী।—এগুলি ১২৯৭-৯৯ সালের 'ভাবতী ও বালকে' প্রথম প্রকাশিত।

২। **ছায়াচিত্র** (সামাজিক গল্প-সমষ্টি)। ১৩০৮ সাল (১৫-৬-১৯০১)। পৃ. ২২৬।

সূচী : লাবণ্য, নীরা, প্রতিভা, মাধবীলতা।—ইহার ৩য় সংস্করণে একটি নূতন গল্প সংযোজিত হইয়াছে।

৩। **রঙ্গমহাল** (ঐতিহাসিক গল্প-সমষ্টি, সচিত্র)। ২৯ জুন ১৯০১)। পৃ. ৩২০।

সূচী : সেলিমা বেগম, হিরণ্য-মন্দির, পান্না-মহল, হীরক-বলয়, রত্নমঞ্জিল, মতি-মিনার।

৪। **ঔরঙ্গজেব** (ঐতিহাসিক নাটক)। জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ (ইং ১৯০৪)। পৃ. ২০৮।

"ইউনিক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত"।

৫। **বঙ্গবিক্রম** (ঐতিহাসিক নাটক)। (১-৯-১৯০৬)। পৃ. ৮৬।

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত।

৬। **শীশ্‌মহল** (ঐতিহাসিক উপন্যাস)? (১ ফেব্রুয়ারি ১৯১২)। পৃ. ২৮৫।

সূচী : তসবীরের মূল্য, ঋণ-পরিশোধ।

৭। **আকবরের স্বপ্ন** (ঐতিহাসিক নাটক)। ইং ১৯১২ (২৭এ জুন)। পৃ. ১৩২।

"ইংলণ্ডের স্বনাম-ধন্য রাজকবি, লর্ড টেনিসনের Dreams o Akbar নামক সুপ্রসিদ্ধ কবিতাটির ক্ষীণ ছায়ামাত্র অবলম্বনে এই নাটকের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা।…কোহিনুর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত ১২ই কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩১৭ সাল।

৮। **নূরমহল** (সচিত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস)। আশ্বিন ১৩২০ (৩-১১-১৯১৩)। পৃ. ৫৩৪।

১৯১২-১৪ সনের মধ্যে প্রকাশিত কয়েকটি খণ্ড একত্রে মুদ্রিত।

৯। **ছেলেদের আরব্য উপন্যাস** (সচিত্র)। ইং ১৯১৩ (১০-১-১৯১৪)। পৃ. ২১৬।

১০। **সুখের বাসর** (সচিত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ফাল্গুন ১৩২০ (ইং ১৯১৪)। পৃ. ১২৮

১১। **রূপের মূল্য** ও অন্যান্য ঐতিহাসিক গল্প (সচিত্র)। ১৩২১ সাল (১৫-৭-১৯১৪)। পৃ ২৬৬।

সূচী: রূপের মূল্য, হজরতের মাণিক, আলেখ্য, রুধিরোৎসব, লাল বারদোয়ারী, কল্যাণীমন্দির, ভবিতব্য।

১২। **রঙমহল রহস্য** (সচিত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ১৩২১ সাল (ইং ১৯১৪)। পৃ. ৫৭২।

১৩। **কলিকাতা—সেকালের ও একালের** (ইতিহাস)। ইং ১৯১৫ (৯ই মে)। পৃ ১০২০।

১৪। **সতীলক্ষ্মী** (উপন্যাস)। ১৩২২ সাল (ইং ১৯১৫)।

১৩২২, ভাদ্র-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' সাহিত্য-সংবাদ দ্রষ্টব্য।

১৫। **সুবর্ণ-প্রতিমা** (হারেম কাহিনী, ১ম খণ্ড)। ১৩২২ সাল (২-৩-১৯১৬)। পৃ. ৪৪৬।

১৬। **কঙ্কণ-চোর** (সচিত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ? (৮ এপ্রিল ১৯১৬)। পৃ. ৪৮১।

১৭। **লাল-চিঠি** (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ? (২ ডিসেম্বর ১৯১৬)। পৃ. ১৮৮।

১৮। **মতিমহল** (সচিত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ? (২৩ জানুয়ারি ১৯১৭)। পৃ. ২৮৬।

১৯। **মৃত্যু-প্রহেলিকা** (ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস)। ? (২৫ জানুয়ারি ১৯১৭)। পৃ. ৫৩৮।

২০। **রূপের বালাই** (উপন্যাস)। চৈত্র ১৩২৩ (২৭-৩-১৯১৭)। পৃ. ১৭৪।

নং ১৩— ॥০ সংস্করণ গ্রন্থমালা।

২১। **স্বর্ণ-প্রতিমা** (সচিত্র সামাজিক উপন্যাস)। ১৩২৪ সাল (২০-৮-১৯১৭)। পৃ. ২৪২।

২২। **মরণের পরে** (সচিত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ? (১৬ অক্টোবর ১৯১৭)। পৃ. ৩১৬।

২৩। **অপরাধিনী** (সচিত্র সামাজিক উপন্যাস)। ? (১৬ অক্টোবর ১৯১৭)। পৃ. ২৩৫।

২৪। **কমলার অদৃষ্ট** (সচিত্র সামাজিক উপন্যাস)। ১৩২৪ সাল (২৬-১০-১৯১৭)। পৃ. ২২৫।

২৫। **সফল-স্বপ্ন** (উপন্যাস)। আষাঢ় ১৩২৫ (ইং ১৯১৮)। পৃ. ১৮৪।

২৬। **শাহজাদা খসরু** (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ? (২৪ নবেম্বর ১৯১৮)। পৃ. ২৭৬।

২৭। **নীলা-বেগম** (রঙ্গমহল-কাহিনী—১)। বৈশাখ ১৩২৬ (ইং ১৯১৯)। পৃ. ১৯২।

২৮। **শয়তানের দান** (উপন্যাস)। শ্রাবণ ১৩২৬ (ইং ১৯১৯)। পৃ. ১৪৩।

নং ৩৪—॥০ সংস্করণ গ্রন্থমালা।

২৯। **পান্নার প্রতিশোধ** (রঙ্গমহল-কাহিনী—২)। ভাদ্র ১৩২৬ (৫-১১-১৯১৯)। পৃ. ২০৮।

৩০। **দেওয়ানা** (রঙ্গমহল-কাহিনী—৩)। পৌষ ১৩২৬ (২৫-২-১৯২০)। পৃ ১৯২।

৩১। **চারুদত্ত** (মৃচ্ছকটিক অবলম্বনে)। ফাল্গুন ১৩২৬ (ইং ১৯২০)। পৃ. ৩১০।

৩২। **গুল-কাশেম** (উপন্যাস)। ১ বৈশাখ ১৩২৭ (ইং ১৯২০)। পৃ ১৭০।

৩৩। **সতীর সিন্দুর** (উপন্যাস)। ১৩২৭ সাল (ইং ১৯২০)। পৃ. ২৬২।

১৩২৭, শ্রাবণ-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে'র সাহিত্য-সংবাদ দ্রষ্টব্য।

৩৪। **রূপের মোহ** (উপন্যাস)। ? (৪জুন ১৯২৩)। পৃ. ১৫৬।

* * * *

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন "কেশরঞ্জনের শারদীয় উপহার"-রূপে প্রতি বৎসর এক একখানি উপন্যাস প্রচার করিতেন, ইহার বেশীর ভাগই হরিসাধনের লিখিত। আমরা এই শ্রেণীর কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিতেছি:—সই, সরোজকুমারী (১৩১১), সোনার কমল

(১৩১২), রায়-বাহাদুর (১৩১৪), মাধবী (১৩১৫), পূর্ণিমা (১৩১৬), উইল-চুরি, প্রতিশোধ (১৩১৯); কন্যাদায় (১৩২০), সমাজ-সমস্যা (১৩২১), নূতন বৌ (১৩২২), স্নেহের প্রতিদান (১৩২৯), দেবতার দান (১৩৩৩), রাধারাণী (১৩৩৫)।

মৃত্যু

হরিসাধন দীর্ঘকাল বিপত্নীক অবস্থায় কাটাইয়া গিয়াছেন। ১৯০৮ সনের ১২ই ডিসেম্বর তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। বৃদ্ধ বয়সে তিনি পুত্র পৌত্র, দৌহিত্র-দৌহিত্রীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবানের আরাধনায় জীবনের শেষ অংশ পরমানন্দে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ৭ই বৈশাখ ১৩৪৫ তারিখে, ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনাবসান হইয়াছে।

দীনেন্দ্রকুমার রায়

১৮৬৯—১৯৪৩

অর্থকরী "নন্দন-কানন সিরিজ" বা "রহস্য-লহরী সিরিজ" সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়কে কতকটা পতিত করিলেও সাহিত্যক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই; খরচের খাতে অঙ্কপাত যত বেশীই হউক, জমার ঘরে অঙ্কপাত ততোধিক। তাঁহার 'পল্লীচিত্র,' 'পল্লীবৈচিত্র্য,' 'পল্লী-চরিত্র' এবং বিবিধ স্মৃতিকথা এমনই সরস সচল ভঙ্গীতে লেখা যে, তাহার প্রভাব স্বীয় কালকে অতিক্রম করিয়া আজিও বহমান আছে এবং আরও দীর্ঘকাল বহমান থাকিবে। তাঁহারই 'নেপোলিয়ান বোনাপার্ট,' 'চীনের ড্রাগন,' 'নানা সাহেব' প্রভৃতি এক দিন জীবনী ও গল্প-পিপাসু বাঙ্গালীকে তৃপ্ত করিয়াছিল, এ কথা বিস্মৃত হইলে আমরা সাহিত্য-শিল্পী দীনেন্দ্রকুমারের প্রতি সত্যই অবিচার করিব। পেটের দায়ে অবিশ্রান্ত লিখিতে লিখিতে তাঁহার হাত মিঠা হইয়াছিল, না, অবিশ্রান্ত লেখা সত্ত্বেও তাঁহার মিঠা হাত তিত হইয়া উঠে নাই—এ রহস্য সত্যই উদ্‌ঘাটনের যোগ্য। সরস-সাহিত্য-শিল্পী দীনেন্দ্রকুমারকে প্রায়ান্ধকার হইতে সাধারণের গোচরীভূত করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস করিলাম, সেই জন্য বাংলা মিঃ ব্লেকের জনক দীনেন্দ্রকুমারকে অন্ধকারেই রাখিলাম।

জমার দিকে হিসাব করিতে গেলে দেখা যাইবে, তাঁহার মৌলিক উপন্যাসের সংখ্যা অল্প হইলেও শুচিসুন্দর ছোট গল্প তিনি প্রচুর লিখিয়াছেন। তাহা ছাড়া, প্রাচীন এবং অধুনা দ্রুত পরিবর্ত্তিত

পল্লীজীবনের চিত্র তিনি এমন নিখুঁত ও মনোরম করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহা এক দিন ইতিহাসের মর্য্যাদা লাভ করিবে। এগুলির মধ্যেই তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন। বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে তাঁহার দান বিপুল এবং সুখের বিষয়, পরিমাণ উৎকর্ষকে খণ্ডিত করে নাই।

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

১২৭৬ সালের ১১ই ভাদ্র (১৮৬৯, ২৬এ আগষ্ট), বৃহস্পতিবার, নদীয়া জেলার মেহেরপুরে এক সম্ভ্রান্ত তিলি-পরিবারে দীনেন্দ্রকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—ব্রজনাথ রায়। ব্রজনাথ কৃষ্ণনগরে জমিদারী সেরেস্তায় চাকরি করিতেন।

শিক্ষা ঃ বিবাহ

বিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে দীনেন্দ্রকুমার তাঁহার স্মৃতিকথায় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলীর পর-বৎসর আমরা এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় গোষ্পদ পার হইলাম।* ...আমরা কৃষ্ণনগর কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। ..

দুই বৎসর কৃষ্ণনগরে বেশ আনন্দেই কাটিয়াছিল; কিন্তু সাহিত্যালোচনার উৎসাহে কলেজের পাঠ্য পুস্তকগুলির প্রতি অনুরাগ শিথিল হইয়াছিল। বিশেষতঃ 'ত্রিকোণমিতি' ও

---

* বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে প্রকাশ, দীনেন্দ্রকুমার ১৮৮৮ সনে ("বয়স ১৫ বৎসর ৪ মাস") মহিষাদল এইচ. ই. স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

'কনিক্সেকশনের' সহিত আদা-কাঁচকলা সম্বন্ধ থাকায় অঙ্কশাস্ত্রে পাসের নম্বর রাখিতে পারিলাম না। কাকা রাগ করিয়া বলিলেন, 'আঁকে তুই গোমুখ্খু, কলকাতার জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশনে গৌরীশঙ্কর বাবু খুব ভাল আঁক শেখান, সেখানে ভর্ত্তি হয়ে পড়াশুনা কর। লেখা-লেখিগুলো বন্ধ কর।'—কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া সাহিত্যালোচনা বাড়িয়া গেল, পড়াশুনার সুবিধা হইল না; তখন মহিষাদলে গিয়া স্কুলের মাষ্টারি কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া [এল. এ.] পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়াই স্থির হইল।" ('মাসিক বসুমতী,' শ্রাবণ ১৩৪০)

দীনেন্দ্রকুমার কাকার নিকট মহিষাদলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কাকা তখন মহিষাদল এস্টেটের ম্যানেজার ও মহিষাদল-রাজ এন্‌ট্রান্স স্কুলের প্রেসিডেন্ট। এই স্কুলে তখন তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি ছিল; দীনেন্দ্রকুমার স্কুলের কর্ত্তা তাঁহার কাকাকে ধরিয়া সেই পদে বন্ধু জলধর সেনকে নিযুক্ত করাইবার ব্যবস্থা করেন; জলধর তখন হিমাচলের সুশীতল ক্রোড় হইতে সবে প্রত্যাগত। মহিষাদলে তাঁহাদের দিনগুলি বেশ সুখেই কাটিয়াছিল। উভয় বন্ধুতে মিলিয়া সাহিত্যালোচনারও বিরাম ছিল না। মহিষাদলে থাকিতেই জলধর দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন। দীনেন্দ্রকুমার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন:—"বিবাহের পর জলধরবাবু মহিষাদলে স্বতন্ত্র বাসা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী দীর্ঘকাল পরে সংসারী হইলেন দেখিয়া আমি রাজসাহীতে চাকরি করিতে চলিলাম। সে বোধ হয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের কথা।" 'ভারতবর্ষে' (অগ্রহায়ণ ১৩২৪) দীনেন্দ্রকুমার-লিখিত 'কবি রজনীকান্ত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এখানে বলা প্রয়োজন, এই ঘটনার দুই বৎসর পূর্ব্বে—১২৯৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (ইং ১৮৯০) দীনেন্দ্রকুমারের বিবাহ হইয়াছিল।

অন্নসংস্থানে

রাজসাহী জেলা-জজের কর্ম্মচারী ঃ দীনেন্দ্রকুমারের কর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ রাজসাহীতে। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—

"আমি মহিষাদল হইতে কলিকাতায় আসিয়া কিছু দিন চাকরি-বাকরির চেষ্টা করিয়াছিলাম, এবং ভারতী আফিসেই বাস করিতেছিলাম। কলিকাতার উত্তরাংশে কাশিয়াবাগান বাগান-বাড়িতে তখন ভারতী আফিস প্রতিষ্ঠিত ছিল।...

স্বর্গীয় লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের সহিত ঠাকুর-পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল ; পালিত সাহেব কবিবর পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি তখন রাজসাহীর জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি স্বয়ং আমার জন্য কিছু করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু রাজসাহী জেলা-জজের [ব্রজেন্দ্রকুমার শীলের] নিকট আমার জন্য স্থপারিশ করিয়া এক পত্র দিলেন।...

সুখে দুঃখে দিন কাটিতে লাগিল। তিন বৎসর রাজসাহীতে ছিলাম ; শীল সাহেবের পর ষ্টীনবার্গ, পালিত, ষ্টেলি প্রভৃতি কয়েক জন জজের আমলে চাকরি করিলাম ; কিন্তু সেই একঘেয়ে জীবন।"

রাজসাহীতে দীনেন্দ্রকুমারের প্রবাস-জীবন কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহার আভাস দিবার জন্য তাঁহার স্মৃতিকথা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার মৈত্র তখন রাজসাহীর প্রতিষ্ঠাপন্ন উকীল, তিনি তখন 'ভারতী'র লেখক ; আমার নাম তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। এক দিন তাঁহার বাসায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম ; তিনি

আমাকে একটা ভাল 'মেস্' খুঁজিয়া লইয়া সেখানে বাস করিতে উপদেশ দিলেন। 'মেসে'র সন্ধানে দুই এক দিন কাটিয়া গেল।

এই সময়ে হঠাৎ এক দিন একটি তরুণ যুবকের সহিত পরিচয় হইল, নাম অক্ষয়কুমার সরকার। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ; তিনি আমার লেখা পড়িয়াছিলেন,···অক্ষয়ের পিতৃদেব স্বর্গীয় হরকুমার সরকার মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইলাম। সে দিন আমার জীবনের একটি শুভ দিন মনে করি। হরকুমার বাবুর ন্যায় দেবপ্রকৃতি, সরলহৃদয়, অমায়িক ভদ্রলোক সকল যুগেই এ দেশে দুর্লভ। তিনি জমিদার, রাজসাহীর করচমাড়িয়ার অধিবাসী; কিন্তু রাজসাহীতে বাস করিতেন। তিনি সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক সার যদুনাথ সরকারের পিতৃসহোদর। কি শিক্ষায়, কি সামাজিক শিষ্টাচারে ইঁহারা তখন রাজসাহীর আদর্শ পরিবার ছিলেন।···আমি মেসের সন্ধানে ছিলাম শুনিয়া তিনি সস্নেহে বলিলেন, 'মেসে বাস করিতে তোমার কষ্ট হইবে, অক্ষয়ের ইচ্ছা, আপাততঃ তুমি আমার এখানেই থাক্। তুমি আমার ছেলেদের মত থাকিবে, তাহাতে তোমার কোন অসুবিধা হইবে না। ইহাতে তুমি সঙ্কোচ বোধ করিও না।'···ভগবান্ আমার মনের কষ্ট বুঝিয়াই বুঝি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বিপন্ন প্রবাসীকে আশ্রয় মিলাইয়া দিলেন।···

পূজনীয় হরকুমার সরকার মহাশয়ের বাসায় দীর্ঘকাল বাসের পর আমি তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে এবং তাঁহাকে একটু অসন্তুষ্ট করিয়াই যে সময় রাজসাহীর বিভিন্ন মেসে বাস করি, সে সময় আফিসের কায ভিন্ন সাহিত্যালোচনাতেই আমার অবসরকাল অতিবাহিত হইত। স্মরণ হইতেছে, আমি যখন রাণীবাজারের

মেসে ছিলাম, সেই সময় ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল। ··

মেসে বাস করিবার সময় রাজসাহীর উকীল স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেনের সহিত আমার বন্ধুত্ব ঘনীভূত হইয়াছিল। আমাদের মেসের দক্ষিণাংশে রজনীবাবুর বাসা ছিল। এ জন্ত সকালে অবসরকালে রজনীবাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়া বন্ধুগণের আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতাম। অনেক সময় কোর্ট হইতে গাড়ীতে বাসায় না ফিরিয়া পদ্মাতীরস্থ বাঁধের উপর দিয়া রজনীবাবুর সহিত গল্প করিতে করিতে মেসে ফিরিতাম। রজনীবাবু সদা-প্রফুল্ল, হাস্যরসিক, মজলিসী লোক ছিলেন। অপরাহ্ণে কাছারির পর তাঁহার বাহিরের ঘরে গান-বাজনার বৈঠক বসিত। রজনীবাবু হারমোনিয়ম বাজাইযা স্বরচিত গান গাহিতেন, কিন্তু পেস্কার অবিনাশ রায় তাঁহার গানগুলি আরও ভাল গাহিতেন। সেখানে অনেক যুবকের সমাগম হইত এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গান-বাজনা চলিত। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় একবার সরকারী কার্য্যোপলক্ষে রাজসাহী গিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি হাসির গানে রাজসাহীর শিক্ষিত সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার হাসিব গান শুনিয়া রজনীকান্ত হাসির গান রচনায় মনঃসংযোগ করেন। তাহার পূর্ব্বেও তিনি দুই চারিটি হাসির গান রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবুর হাসির গান শুনিবার পর তিনি উৎসাহভরে অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি গাহিয়া শুনাইয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া কোন কোন দিন বলিয়াছি—'আপনার এ গান ডি. এল. রায়ের কোন হাসির গান অপেক্ষা অপকৃষ্ট নহে।'—আমার কথা শুনিয়া

তিনি ডি. এল. রায়ের উদ্দেশে দুই হাতে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিতেন 'কি যে বল। তিনি আমার গুরুস্থানীয়। আমার গান তাঁহার গানের সমকক্ষ হইবার যোগ্য ? পাগল আর কি!'— বস্তুতঃ, রজনীবাবু অসাধারণ বিনয়ী ছিলেন। তিনি নিজের প্রতিভা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। তাঁহার গল্প বলিবার শক্তিও অসাধারণ ছিল। তাঁহার গল্প শুনিতে শুনিতে কোন কোন দিন আমাদের রাত্রি একটা পর্য্যন্ত কাটিয়া যাইত। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার গল্প শুনিতাম। এক দিন সন্ধ্যার পর তিনি একটি ফরাসী ডিটেক্‌টিভের গল্প বলিতে আরম্ভ করিয়া দুই রাত্রিতে তাহা শেষ করেন। গল্পটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া তিনি আমাকে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি আমাকে রাজসাহীর পাবলিক লাইব্রেরী হইতে সেই ফরাসী উপন্যাসের একখানি ইংরাজী অনুবাদ আনিয়া দিলেন, আমি তাহাই অবলম্বন করিয়া দুই পরিচ্ছেদ লিখিলাম। ফরাসীভূমি আমি রাজ-পুতানায় পরিবর্ত্তিত করিয়া উপন্যাসের ফরাসী নায়ক-নায়িকাগুলিকে রাজপুতে পরিণত করিলাম। রজনীবাবু সেই দুই পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়া আমাকে যে ভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন ও মুক্তকণ্ঠে যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইলে এখনও লজ্জা অনুভব করি। এই উপন্যাসের কিয়দংশ তৎকালপ্রকাশিত 'দাসী' নামক মাসিকপত্রে [১৮৯৭ সনে] 'অজয়সিংহের কুঠী' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।··· ···

কিছু দিন বাসের পর রজনীবাবু আমাকে তাঁহার বাসায় তাঁহার সহিত একত্র বাসের জন্য অনুরোধ করিলে, আমি তাঁহার সহিত সাহচর্য্যের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রস্তাবে

সম্মত হইয়াছিলাম। তাঁহার সহিত অনেক দিন পরম সুখেই অতিবাহিত করিয়াছিলাম। আমরা উভয়ে একত্র কোর্টে যাইতাম, একত্র ফিরিতাম এবং অবসরকাল একত্র কাটাইতাম। সেই সময় আমি 'সাহিত্যে'র ও 'ভারতী'র নিয়মিত লেখক ছিলাম; রজনীবাবু তখন গান রচনা করিতেন। এই সময় তাঁহার 'বাণী' ও 'কল্যাণী'র অধিকাংশ গান রচিত হইয়াছিল। রজনীবাবু রাজসাহীতে ওকালতি করিতে করিতে দুই তিন বার নাটোর ও নওগাঁ মহকুমায় মুন্সেফের একটিনী করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে দীর্ঘকালের জন্য কোথাও মুন্সেফীর একটিনি করিতে হয় নাই। হাকিমী করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তিনি যেন হাঁপাইয়া পড়িতেন। মনে হইত, হাকিমীতেও তাঁহার তেমন অনুরাগ ছিল না। একবার তিনি হাকিমী করিয়া রাজসাহীতে ফিরিয়া হাকিমী সম্বন্ধে একটা হাসির গান রচনা করিয়াছিলেন। আর একবার রাজসাহীর (অধুনা পরলোকগত) কোন স্ত্রৈণ প্রবীণ উকীলের দ্বিতীয় পক্ষের প্রতি অনুরাগের পরিচয়স্বরূপ একটি গান রচনা করিয়া বন্ধুবর্গের নিকট তাহা গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন, তাহার প্রথম লাইনটি এখনও স্মরণ আছে—

'বাজার হুদ্দো কিনে আন্যে ঢেলে দিছি পায়,'

এই গান শুনিয়া সকলেই হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছিলেন।

রজনীবাবুর রচিত 'বেহায়া বেয়াই' শীর্ষক হাসির গানটিও অতি চমৎকার; ...এরূপ ভঙ্গী করিয়া এরূপ কণ্ঠে রজনীবাবু গাহিতেন যে, অতি গম্ভীরপ্রকৃতি লোকেরও হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইত। রজনীবাবুর হৃদয় দয়ায় পূর্ণ ছিল; তিনি দুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন। ওকালতিতে তাঁহার পসারও মন্দ ছিল না,

কিন্তু তিনি এই ব্যবসায়ের অনুরাগী ছিলেন না। তিনি সাহিত্য ও সঙ্গীতেরই অনুরাগী ছিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া গান করিয়াও তিনি ক্লান্ত হইতেন না। যত দিন তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছি, কোন দিন গৃহ-সুখের অভাব অনুভব করিতে পারি নাই। কিন্তু এই সময়ের কিছু দিন পরে আফিসের উপরওয়ালার নিকট এরূপ ব্যবহার পাইলাম যে, চাকরির উপর ঘৃণা হইল, এবং সেই দিন হইতে রাজসাহী-ত্যাগের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম,…তখন রাজসাহীর সেই জজ আমারই মুরুব্বী মিঃ লোকেন্দ্রনাথ পালিত।

কিছু কাল পরে সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। রাজসাহী হইতে সুদীর্ঘ পাড়ি—ভারতের পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে গুর্জ্জরের মরুভূমি! ব্যবধান, সমগ্র ভারতবর্ষের বিশাল বিস্তার, কত নদ, নদী, গিরি, কান্তার।"

অরবিন্দের বাংলা শিক্ষক: শ্রীঅরবিন্দ তখন বরোদা-রাজ্যে। সেখানে তাঁহাকে কথ্য বাংলা শিখাইবার জন্য এক জন বাংলা শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। দীনেন্দ্রকুমারই তাঁহার বাংলা শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বরোদায় গমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শীতের প্রারম্ভে, বোধ হয় পূজার কয়েক সপ্তাহ পর, আমি অরবিন্দকে বাঙ্গলা ভাষা শিখাইবার ভার লইয়া বরোদায় যাই।…আমি দুই বৎসরাধিক কাল তাঁহার সহবাসে যাপন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম।"—'অরবিন্দ-প্রসঙ্গ,' পৃ. ৩, ৮৪।

বরোদা হইতে ফিরিয়া দীনেন্দ্রকুমার বন্ধু জলধর সেনের আহ্বানে সহকারী সম্পাদক-রূপে সাপ্তাহিক 'বসুমতী'তে যোগদান করেন

(ইং ১৯০০)। 'বসুমতী'র তখন বাল্যজীবন, সবে চারি বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগে জলধরের স্কন্ধেই তখন সম্পাদকীয় ভার ন্যস্ত। জলধর তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

"১৩০৬ সালের পূজা কেটে গেল। আমরা অবকাশান্তে এসে কার্য্যে যোগদান করলাম। সেই সময়েই অতর্কিত ভাবে আমাদের নিরুপদ্রব শান্তির ব্যাঘাত উপস্থিত হ'ল, 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রবাবুর সহিত সম্পাদক পাঁচকড়িবাবুর সংঘর্ষ উপস্থিত হ'ল,। এই সংঘর্ষের ফলে পাঁচকড়িবাবু 'বসুমতী' থেকে বিদায় পেলেন এবং তাঁর স্থানে আমি সম্পাদক নিযুক্ত হলাম। অতবড় একখানা কাগজ আমরা একলা কি ক'রে চালাই। ··আমার তখন মনে হ'ল সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের কথা। তিনি তখন সুদূর বরোদায় শ্রীঅরবিন্দকে বাংলা ভাষা শিখাচ্ছিলেন। তাঁরা দুই জন ব্যতীত সেখানে আর বাঙালী ছিল না। দীনেন্দ্রবাবুর কাজকর্ম খুব কমই ছিল এবং অবসরও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তিনি বাঙালীর সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করতে না পেরে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, এ কথা আমি জানতাম। আমি তখন উপেন্দ্রবাবুর সম্মতি নিয়ে বরোদায় দীনেন্দ্রবাবুকে পত্র লিখলাম। তিনি সানন্দে আমার সহযোগী হ'তে সম্মত হলেন এবং দশ পনর দিনের মধ্যে কলিকাতায় এসে আমার পাশে ব'সে তিনিও হাঁফ ছাড়লেন —আমিও হাঁফ ছাড়লাম।" ('ভারতবর্ষ,' আষাঢ় ১৩৪৩)

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে—১৩১৩ সালের শেষ ভাগে জলধর বিদায় গ্রহণ করিলে দীনেন্দ্রকুমারই 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র সম্পাদক-

পদে নিযুক্ত হন। তিনি দীর্ঘকাল 'বসুমতী'র সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'মাসিক বসুমতী' লেখেন :—

"'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে তিনি প্রথম সাংবাদিকের কাযে প্রবৃত্ত হয়েন। তখন তিনি ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতির নিকট সংবাদিকের শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। পরে কিছু কাল 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র সম্পাদকরূপে কায করিয়া তিনি সংবাদপত্রের কায ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আবার আসিয়া কিছু দিন 'দৈনিক বসুমতী'তে কায করেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত 'মাসিক বসুমতী'র সহিত সম্বন্ধ ছিলেন।" (আষাঢ় ১৩৫০)

'নন্দন-কানন' : দীনেন্দ্রকুমার 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্যকালে বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'নন্দন-কানন' নামে "উপন্যাস ও গল্প বিষয়ক মাসিক পত্রিকা" সম্পাদন করিতেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—ফাল্গুন ১৩০৭। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকের "নিবেদনে" তিনি লেখেন :—

"বঙ্গদেশে এখন মাসিক পত্রিকার অভাব নাই; বঙ্গদর্শনের যুগের সহিত তুলনা করিলে, সে কালে আর এ কালে কি প্রভেদ! এখন সহরে মফস্বলে সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা শ্রেণীর, নানা আকার বিশিষ্ট মাসিক পত্রিকার অস্তিত্ব বর্ত্তমানে দেখা যায়; কিন্তু এ কথা বোধ করি কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, ইংলণ্ডের Monthly magazine of fiction প্রভৃতির ন্যায় সর্ব্ব সাধারণের পাঠোপযোগী সুন্দর গল্পপূর্ণ মাসিক পত্রিকার এদেশে আজও প্রচলন হয় নাই; আমাদের বঙ্গসাহিত্যের ইহা একটি প্রধান অভাব। সেই অভাব দূর করিবার জন্য, এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ

কালে, অভিনব শতাব্দীর আবির্ভাবের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ আমরা 'নন্দন-কানন' প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম।... ১লা জানুয়ারি, ১৯০১ সাল।"

পত্রিকাখানির গোড়ার কয়েক সংখ্যা পরিষদ-গ্রন্থাগারে আছে। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকের রচনা ব্যতীত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জলধর সেন ও ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লিখিত গল্পও স্থান পাইয়াছে।*

'হিন্দুরঞ্জিকা': 'বসুমতী'র সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার পূর্ব্বে, রাজসাহীতে অবস্থানকালে দীনেন্দ্রকুমার কিছু দিন আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র—'হিন্দুরঞ্জিকা' পরিচালনে সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

"বহুদিন হইতে রাজসাহী ধর্ম্মসভার মুখপত্রস্বরূপ একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাহার নাম 'হিন্দুরঞ্জিকা'। দুষ্ট ছেলের দল সেই কাগজখানিকে 'হিন্দুর গঞ্জিকা' বলিয়া উপহাস করিত। উহা ধর্ম্মসভা-সংলগ্ন তমোঘ্ন প্রেসেই মুদ্রিত হইত। প্রেস ও কাগজখানি সুপরিচালিত না হওয়ায় ধর্ম্মসভার কর্ত্তৃপক্ষ উহাদের পরিচালনভার পূজনীয় হরকুমার বাবুর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে আমার অনুরাগের পরিচয় পাইয়া তিনি 'হিন্দুরঞ্জিকা'র প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচনের ও পরিদর্শনের ভার আমার হস্তে অর্পণ করিলেন। সে সময় 'হিন্দুরঞ্জিকা'য় নীলামের

* দীনেন্দ্রকুমারের পুত্র দীপ্তেন্দ্রকুমার জানাইয়াছেন যে, তাঁহার পিতা 'তিলি পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা কিছু দিন সম্পাদন করিয়াছিলেন, উহা কলিকাতা কাশিমবাজার-রাজবাটি হইতে প্রকাশিত হইত।

ইস্তাহার, কিছু কিছু বিজ্ঞাপন এবং হিন্দুধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তনের জন্য মামুলী ধরণের দুই একটি পাণ্ডিত্য-খচিত প্রবন্ধ থাকিত, তাহাতে জীবনের কোন লক্ষণ ছিল না; এ জন্য কাগজখানি কেহই প্রায় খুলিতেন না। আমরা ছোকরার দল 'হিন্দুরঞ্জিকা' হাতে লইয়া বিদ্রোহের সুর তুলিলাম, কোন কোন ধার্ম্মিকের গুপ্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতির প্রসঙ্গে আন্দোলন আলোচনা চলিতে লাগিল। খোঁচা খাইয়া সুপ্ত বিষধর ফোঁস করিয়া ফণা তুলিল! সে দলে শক্তিশালী সামাজিক মোড়লদেরও অভাব ছিল না; সেকালের কথা, তাঁহাদের অনেকে পুরুষের চরিত্রদোষটাকে আমোল দিতেন না। আমরা তাঁহাদের দুর্বলতায় আঘাত করায় নানা ভাবে আমাদিগকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। হরকুমার বাবুর চেষ্টায় ও প্রভাবে আমাদের মাথা বাঁচিল। আমরা যুবকের দল কাগজখানি সংস্কারের চেষ্টা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলাম। এই সময় ধর্ম্মসভার তমোঘ্ন প্রেস হইতে আমার একখানি ছোট গল্প-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার নাম 'বাসন্তী'। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার 'নেশনে' তাহার প্রশংসাসূচক একটি ক্ষুদ্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। সেইখানি আমার প্রথম পুস্তক।" (কার্ত্তিক ১৩৪০)

সাহিত্য-সেবা

পঠদ্দশা হইতেই দীনেন্দ্রকুমারের প্রবল সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মূলে পারিবারিক প্রভাব বড় কম ছিল না। দীনেন্দ্রকুমার 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

"আমার পিতৃদেব বাঙ্গালানবিস ছিলেন, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল, সে সময় মেহেরপুরে তাঁহার মত বিশুদ্ধ বাঙ্গালা কেহ লিখিতে পারিতেন না। পিতৃদেব তাঁহার প্রথম যৌবনে 'কুসুম-কামিনী' নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া কলিকাতায় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় বাবুর প্রেস হইতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। মেহেরপুরের শিক্ষিত সমাজে তাঁহার কবিত্বশক্তিরও কিঞ্চিৎ খ্যাতি হইয়াছিল। পিতৃদেবই মেহেরপুরের প্রথম গ্রন্থকার। আমি এই পৈতৃক সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী। (ফাল্গুন ১৩৩৯)

"আমাদের সঙ্গে যাঁহারা কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই উত্তরকালে কর্ম্মজীবনে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে আমি মাননীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদিত 'ভারতী'তে কিছু কিছু লিখিতাম। ইহার কিছু দিন পরে যোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী হইতে 'সাধনা' প্রকাশিত হইলে আমার রচিত 'পল্লীচিত্র'গুলি তাহাতে ধরাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। আমার সতীর্থগণের মধ্যে রায়সাহেব জগদানন্দ রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনিও এই সময় হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভক্ত ছিলেন।

কৃষ্ণনগর কলেজের বাহিরেও আমার দুই একটি বন্ধুলাভ হইয়াছিল, সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ মনোমোহন ঘোষের ভাগিনেয় অতুলচন্দ্র বসু আমার স্নেহাস্পদ সুহৃদ্ ছিলেন, মিঃ ঘোষের দুই ভাগিনেয়ী বিনয়কুমারী বসু ও প্রমীলা বসু চমৎকার কবিতা লিখিতেন, তাঁহাদের দেখাদেখি আমিও কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি, আমার কোন কোন কবিতা সেকালের মাসিকপত্রে প্রকাশিত

হইয়াছিল ;* কিন্তু আমি আমার কবিতায় ভাব ও কবিত্বের দৈন্য বুঝিতে পারিতাম, এ জন্য কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিই। তথাপি কবি ভগিনীদ্বয় সে সময় কবিতা রচনায় আমাকে উৎসাহিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। (শ্রাবণ ১৩৪০)

'ভারতী ও বালকে'র পৃষ্ঠাতেই প্রথমে দীনেন্দ্রকুমারের রচনা প্রকাশিত হয় ; উহা ১২৯৫ সালের বৈশাখ-সংখ্যায় মুদ্রিত "একটি কুসুমের মর্ম্মকথা। প্রবাদ প্রশ্ন।" তদবধি 'ভারতী'তে তাঁহার নানা বিষয়ক রচনা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সহিত মাতৃভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন। 'ভারতী,' 'দাসী,' 'সাহিত্য,' 'সাধনা,' 'প্রদীপ,' 'ভারতবর্ষ,' 'মাসিক বসুমতী' প্রভৃতির পৃষ্ঠায় তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাঁহার বহু রচনা এখনও পুস্তকাকারে অমুদ্রিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে 'মাসিক বসুমতী'তে (১৩৩৯-৪১) প্রকাশিত "সেকালের স্মৃতি" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৩০৮ সালের আষাঢ় ও অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'প্রদীপে' "জামাই-ষষ্ঠী" ও "বর্ষায় পল্লীদৃশ্য," ১২৯৭ আষাঢ়-সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' "দেপাড়ার মেলা" এবং ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত "বৈশাখের পল্লী" চিত্রগুলি বোধ হয় এখনও কোন পুস্তকে স্থান পায় নাই।

দীনেন্দ্রকুমারের গ্রন্থের সংখ্যা বিপুল। এক "রহস্য-লহরী

* দ্র° "কোথা মা আমার!": 'মালঞ্চ', শ্রাবণ-ভাদ্র ১২৯৬। "সুখছায়া": মালঞ্চ, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৯৬। "বিদেশী কবিতা। (সেলী)": 'সাহিত্য,' আশ্বিন ১২৯৮। "ভেসে যাই": 'ভারতী ও বালক,' আশ্বিন-কার্ত্তিক ১২৯৮। "কবিতাসুন্দরী": 'দাসী,' জুন ১৮৯৬।

সিরিজে”ই তাঁহার ২১৭ খানি অনূদিত উপন্যাস মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার সকল রচনার পরিচয় দিবার চেষ্টা না করিয়া, আমরা কেবল কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের প্রকাশকাল-সহ একটি তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।—

১। **বাসন্তী** (গল্প-সমষ্টি)। বোয়ালিয়া, শ্রাবণ ১৩০৫ (২৪-৮-১৮৯৮)। পৃ. ১৪০।

ইহাই দীনেন্দ্রকুমারের প্রকাশিত প্রথম পুস্তক ; “অশেষ গুণসম্পন্ন, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সরকার মহাশয়ের কর কমলে তদীয় ভক্ত গ্রন্থকারের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ…সমর্পিত।”

সূচী : স্বপ্ন, সত্যঘটনা না ভৌতিক কাণ্ড ?, পতিতা।

২। **হামিদা** (উপন্যাস)। বরোদা, গুজরাট্। ? (৩০ আগষ্ট ১৮৯৯)। পৃ. ৯৮।

“কোন কোন পাঠক এই আখ্যায়িকাকে ঐতিহাসিক গল্প বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু ইতিহাসের সহিত ইহার আখ্যানভাগের কোন সংস্রব নাই বলিলেও চলে ; আবশ্যক বোধে মধ্যে মধ্যে দুই একটা ঐতিহাসিক নাম, এবং একটি ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণা করা গিয়াছে—সে ঘটনাটি চিত্রল অভিযান।”—গ্রন্থকারের নিবেদন।

৩। **পট** (ডিটেক্‌টিভ গল্প-সমষ্টি)। ১ বৈশাখ ১৩০৮ (১৫-৬-১৯০১) পৃ. ১৮৯।

“এই পুস্তক কয়েকটি অতি অকিঞ্চিৎকর ডিটেক্‌টিভের গল্প সমষ্টি মাত্র। ইহার কয়েকটি গল্প অনেক দিন পূর্ব্বে ‘ভারতী’তে

প্রকাশিত হইয়াছিল।" পুস্তকখানি "সুহৃদাগ্রগণ্য শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়"কে উৎসর্গীকৃত।

সূচী: শত্রুহস্তে, উদোর ঘাড়ে বুদোর বোঝা, চক্ষুদান, হত্যা-রহস্য, জাল ডিটেক্‌টিভ, গল্প লেখার বিড়ম্বনা।

৪। **অজয়সিংহের কুঠী** (ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩০৯ (৪-১০-১৯০২)। পৃ ৪২৭।

"ফরাসী দেশ এখন 'ডিটেক্‌টিভ' উপন্যাসের শীর্ষস্থানে বিরাজিত। ফরাসী সাহিত্যে সেই সকল উপন্যাসের কতখানি প্রভাব, তাহা ঠিক বলিতে পারি না; তবে সেই উপন্যাসগুলি বড়ই সুপাঠ্য; তাহাদেরই একখানির আখ্যান ভাগ অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান উপন্যাস রচিত হইয়াছে।"—নিবেদন।

১৮৯৭ সনের 'দাসী'তে কিয়দংশ, এবং পরে সমগ্র অংশ ১ম বর্ষের 'নন্দন-কাননে' (১৩০৭-৮) প্রকাশিত।

৫। **সচিত্র আরব্য উপন্যাস,** ১-৩ ভাগ। (অক্টোবর ১৯০২)।

৬। **মজার কথা** (তরুণপাঠ্য)। ইং ১৯০৩ (?)

১৩১০ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচিত।

৭। **নেপোলিয়ান বোনাপার্ট**। ইং ১৯০৩ (?)

১৩১০ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচিত।

৮। **পল্লীচিত্র**। মেহেরপুর, ১ বৈশাখ ১৩১১ (২৫-৫-১৯০৪)। পৃ. ২৮৮।

"এই চিত্রগুলি কিছু দিন পূর্ব্বে প্রধান প্রধান বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার সময় প্রবন্ধগুলিকে যথযোগ্যরূপে পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করা

হইয়াছে। চিত্রগুলি বঙ্গদেশের একাংশের পল্লীচিত্র, প্রথমটি ভিন্ন সকলগুলিই উৎসব-চিত্র।"—নিবেদন।

সূচী : সেকালের পাঠশালা, ভগবতী যাত্রা, দশহরা গঙ্গাপূজা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, নন্দোৎসব, দুর্গোৎসব, কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। গ্রাম্যশব্দ।

১৯২২ সনে রায় এণ্ড রায় চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত ইহার তৃতীয় সংস্করণে "পুস্তকখানির প্রচুর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, এবং ইহাতে একটি নূতন 'চিত্র' [স্নানযাত্রার মেলা] সংযোজিত হইয়াছে।"

৯। **পল্লীবৈচিত্র্য**। মেহেরপুর, ১ আশ্বিন ১৩১২ (৪-৯-১৯০৫)। পৃ. ২৩৪+গ্রাম্য-শব্দ ১৪।

"বঙ্গজননীর সুসন্তান ও বঙ্গসাহিত্যবৎসল মহারাজা শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর দেব মাণিক্য মহোদয়"কে উৎসর্গীকৃত। জলধর সেনের ভূমিকা সহ। গ্রন্থকারের "নিবেদন" এইরূপ :—

"মৎপ্রণীত 'পল্লীচিত্রে' পল্লীসমাজের বিশেষত্ব সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিতে পারি নাই, 'পল্লীবৈচিত্র্যে' সেই সকল কথার আলোচনা করিলাম। যে সকল সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠক মহোদয় পল্লীচিত্রখানি পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন, এই পুস্তকখানিও তাঁহাদের সাহিত্যরসলিপ্সা পূর্ণ করিবে, বন্ধুগণের নিকট এরূপ আশা পাইয়াই ইহার প্রচারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।...

বঙ্গে আজ বাঙ্গালীর হৃদয়ে নূতন স্পন্দন অনুভূত হইতেছে, আজ যেন হঠাৎ বাঙ্গালীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, আজ আপনার জননীকে আমরা চিনিয়াছি, জননীর যাহা আপনার, তাহার আদর করিতেছি, তাহা গৌরবের সহিত গ্রহণ করিতেছি ; আজ বাঙ্গলায়

যে বাতাস বহিতেছে,—তাহা সহস্রাধিক বর্ষের অভিশপ্ত পতিত জাতির দীর্ঘশ্বাসে যেন কলুষিত নহে।

কিন্তু আমরা এই কোটী কোটী বাঙ্গালী,—সকলেই কি নগরবাসী? সাত কোটী বাঙ্গালীর কয় জন নগরে বাস করেন?—কয় দিনের জন্য বাস করেন? অধিকাংশ বাঙ্গালীই পল্লীবাসী;—আমরা পল্লীগ্রামের গাছের ছায়ায় মানুষ হইয়াছি, পল্লীগ্রামে প্রভাতে নদীর ধারে আমবাগানে যে পাখী ডাকিয়াছে, তাহার কলগীতে আমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে; সেখানকার নাপিত কাকা, পুরুত জেঠা, কামার দাদা, গয়লা মাসী ও মালী বৌ আমাদের কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে; সেখানে দেবায়তন হইতে প্রতিদিন যথানিয়মে সংকীর্ত্তনধ্বনি উত্থিত হয়, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কাঁশর ঘণ্টার সুরব ধুপ ধুনার সৌরভের সহিত মিশিয়া বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া যায়; সেখানে হেমন্তের প্রভাবে শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও পত্রপুষ্প-শোভিত কুসুমকুঞ্জ নির্ম্মল শিশিরবিন্দুতে ঝলমল করে; এবং বসন্তের শুক্ল যামিনীতে বিমল চন্দ্রকিরণে বংশতরুবেষ্টিত ক্ষুদ্র মৃৎকুটীরগুলি চিত্রবৎ প্রতীয়মান হয়। আজ আমাদের স্নেহময়ী বঙ্গজননীর সেই সুরম্য লীলানিকেতন,—আমাদের বহু স্বদেশবাসীর শৈশবের সেই শোভাময় সুখকুঞ্জ, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পরিশ্রান্ত যৌবনের সেই বিরামনিলয় তাপদগ্ধ কর্ম্মহীন বার্দ্ধক্যের সেই শান্তিময় অন্তিম আশ্রয়,—বঙ্গপল্লীর বৈচিত্র্যের কথা কি এই অবৈধ প্রণয় ও ব্যভিচারেপূর্ণ রোমাঞ্চকর উপন্যাসের হলাহলে জর্জ্জরিত সমাজের বক্ষে এক বিন্দু সুখের ও শান্তির হিল্লোল বহন করিয়া আনিবে না? বলা বাহুল্য, সে চেষ্টা যদি বিফল হইয়া থাকে, সে অপরাধ আমার; পল্লীজননীর দৈন্য তাহার কারণ নয়।”

'পল্লীবৈচিত্র্যে' এই কয়টি রচনা স্থান পাইয়াছে :—কালীপূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, কার্ত্তিকের লড়াই, নবান্ন, পোষলা, পৌষ-সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ মেলা, শ্রীপঞ্চমী, শীতল-ষষ্ঠী, দোলযাত্রা, চড়ক।

১৯২৩ সনে রায় এণ্ড রায় চৌধুরী 'পল্লীবৈচিত্র্যে'র ২য় সংস্করণ প্রকাশ করেন। "নব সংস্করণের কথা"য় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :— "সতের বৎসর পরে এই পুরাতন চিত্রগুলি নূতন করিয়া তুলি বুলাইয়া এ হাটে বাহির করা সঙ্গত হইল কি না বুঝিতে পারিতেছি না।"

১০। **চীনের ড্রাগন** (ডিটেক্‌টিভ গল্প)। (৭ জুলাই ১৯১৪)। পৃ. ২৭৫।

১১। **পল্লীকথা**। ১৩২৪ সাল (২৬-১১-১৯১৭)। পৃ. ১৫৪।

সূচী : আগমনী, পরিত্যক্তা, প্রত্যাখ্যান, দাদা, দিদি, মা, নববধূ, বিপত্নীক,বিজয়ার মিলন।

১২। **পল্লীবধূ** (উপন্যাস)। ? (২০ মার্চ ১৯২৩)। পৃ.১৬৫।

১৩। **পল্লী-চরিত্র**। ? (৭ মে ১৯২৩)। পৃ. ১৬২।

"মৎপ্রণীত বঙ্গীয় পল্লী-জীবনের কতকগুলি আখ্যায়িকা অনেক দিন পূর্ব্বে প্রধান প্রধান বাঙ্গলা মাসিকে প্রকাশিত হইয়া বিক্ষিপ্ত ভাবে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেই সকল গল্প হইতে কয়েকটি উৎকৃষ্ট গল্প বাছিয়া লইয়া এবং তাহাদের সহিত নবলিখিত 'দত্ত-গিন্নি' নামক গল্পটি যোগ করিয়া প্রকাশক রায়, রায়চৌধুরীর একমাত্র স্বত্বাধিকারী শ্রীমান নলিনীমোহন রায়চৌধুরী সংপ্রতি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলেন।…গল্পগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার সময়, দীর্ঘকাল পূর্ব্বের রচনা বলিয়া তাহাদের যে সকল ত্রুটি

লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা সংশোধিত করিয়া, এবং আবশ্যক বোধে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া ইহাদিগকে প্রায় নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে।”—গ্রন্থকারের বক্তব্য।

সূচী : দুখীরাম, গ্রামের পিসিমা, দুর্ব্বাসা ঠাকুর, সেকালের ডেপুটী, গৃহহীন, পেয়াদা, দত্ত-গিন্নি।

১৪। **তালপাতার সিপাই** (সচিত্র উপকথা)। ? (২৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৩)। পৃ. ১১৫।

“যে সকল ছেলে খুব ছোটও নয়; বড়ও নয়, তাহারা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করে, এরূপ উপকথার বহি······।”

১৫। **অরবিন্দ-প্রসঙ্গ**। মাঘ ১৩৩০ (ইং ১৯২৪)। পৃ. ৮৪।

“ঠিক দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে ১৩১৮ সালে পরম প্রীতিভাজন সুহৃদ্ স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতির অনুরোধে তাঁহার সম্পাদিত ‘সাহিত্যে’র কয়েক সংখ্যায় [অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন ১৩১৮] ‘অরবিন্দ-প্রসঙ্গে’র আলোচনা করিয়াছিলাম। সুরেশ বাবু আমাকে বলিয়াছিলেন, অরবিন্দ যখন বরোদায় ছিলেন, তখন অধিকাংশ বাঙ্গালী তাঁহাকে জানিত না, চিনিত না। গুর্জ্জর ভূমির মরুবক্ষে কি রত্ন লুক্কায়িত ছিল—কেহই তাহার সন্ধান পায় নাই; কিন্তু সেই দীর্ঘ কালের মধ্যে সুদূর প্রবাসে তাঁহাকে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ সৌভাগ্যক্রমে আমিই কিছু কালের জন্য লাভ করিয়াছিলাম। এখন সেই সকল কথা শুনিবার জন্য নবীন বঙ্গের আগ্রহ হইয়াছে; সুতরাং ‘সাহিত্যে’ অরবিন্দ-প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইলে বঙ্গীয় যুবক সমাজে তাহা সমাদৃত হইবে।···

এই দ্বাদশ বৎসর পরে সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বের এই স্মৃতিকথা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। ‘অরবিন্দ-প্রসঙ্গ’ “সাহিত্যে”

যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অতিরিক্ত আরও কিছু লিখিবার ছিল,—আমি তাহা এই গ্রন্থে সংযোজিত করিলাম।”—লেখকের বক্তব্য।

১৬। **নায়েব মহাশয়** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৩১ (১৮-৮-১৯২৪)। পৃ. ৩৩৬।

১৭। **ঢেঁকির কীর্ত্তি** (সচিত্র গল্প-সমষ্টি)। মাঘ ১৩৩১ (ইং ১৯২৫)। পৃ. ১৩৬।

সূচী: ঢেঁকির কীর্ত্তি (সুবিখ্যাত ব'দে ডাকাতের গল্প), শেয়াল-মোক্তার, মানুষ-বাঘ, বিয়ে-পাগলা বুড়োর দুর্গতি, ভুঁইফোড় শিব, মরদ-কা বাত (দস্যুসর্দ্দার বিশ্বনাথের গল্প)।

১৮। **নানা সাহেব** (ঐতিহাসিক উপন্যাস)। ? (১ জানুয়ারি ১৯২৯)। পৃ. ৩১৯।

পুস্তকের কোথাও উল্লেখ না থাকিলেও, ইহা প্রকৃতপক্ষে রামবাগান দত্ত-পরিবারের শশিচন্দ্র দত্তের *Shankar*, Tale of the Indian Mutiny অবলম্বনে লিখিত।

মৃত্যু

দীনেন্দ্রকুমারের শেষ-জীবন তেমন শান্তিতে অতিবাহিত হইতে পারে নাই। ১৯৩৩ সনে তিনি জীবন-সঙ্গীনীকে হারাইয়াছিলেন। তাঁহার উপর দিয়া বহু শোক-ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে। ১৩৫০ সালের ১২ই আষাঢ় (২৭ জুন ১৯৪৩) স্বগ্রামে তাঁহার জীবনাবসান হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে 'মাসিক বসুমতী' (আষাঢ়) লিখিয়াছিলেন :—

"১২ই আষাঢ় স্বগ্রাম মেহেরপুরে ৭৪ বৎসর বয়সে প্রবীণ সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় পরলোকগমন করিয়াছেন।·· পঠদ্দশাতেই দীনেন্দ্রকুমার সাহিত্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করেন এবং তাঁহার গ্রাম্যচিত্র ও গ্রাম পরিবেষ্টনে স্থাপিত চরিত্র-চিত্র লইয়া রচিত গল্প বিবিধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। শেষ পর্য্যন্ত তিনি গ্রামের ও গ্রাম্যসমাজের চিত্র অসাধারণ নৈপুণ্য সহকারে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। জীবনের সায়াহ্নে—বহু দিন 'বসুমতী'র সেবা উপলক্ষে কলিকাতায় বাস করিবার পর তিনি যে মাত্র কয় মাস পূর্ব্বে গ্রামে ফিরিয়া যাইয়া তথায় শেষ শ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার জীবনের সহিত সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্যসম্পন্ন। তিনি যেন তাঁহার পল্লী-জননীর আকর্ষণ অনুভব করিয়া তাঁহার অঙ্কে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন :—

"সন্ধ্যা হ'ল বেলা গেল—
কোলের ছেলে নে মা কোলে।"

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৮২*

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

১৮৪৯—১৯২২

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

১২৫৬ সালের ১২ই কাত্তিক (১৮৪৯, ২৭এ অক্টোবর) চন্দ্রশেখরের জন্ম হয়। তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান নদীয়ায়, পিতামহ—রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খাগড়ায় বসবাস করিতেন, কলিকাতায় ও মুর্শিদাবাদে তাঁহার রেশমের কুঠী ছিল; পিতা—বিশ্বেশ্বর পিতৃব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান করিতেন।

বিদ্যাশিক্ষা

পিতামহের অভিপ্রায়-মত চন্দ্রশেখর আট বৎসর বয়সে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিবার জন্য খাগড়া-নিবসী পণ্ডিত ঠাকুরদাস বিদ্যারত্নের টোলে প্রবেশ করেন। পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের নিকটও চন্দ্রশেখর এক বৎসর সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া উঠেন; তিনি কিছু দিন পরে পুত্রকে বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন; এইখান হইতেই চন্দ্রশেখর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের

পরীক্ষাগুলি কোন্ বৎসর কিরূপ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন, ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী তাহার হিসাব এই :

ইং ১৮৬৬ ··এনট্রান্স, ২য় বিভাগ বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল
১৮৬৯···এফ এ, ২য় বিভাগ এল এম এস ইনষ্টিটিউশন, ভবানীপুর
১৮৭২ ·বি এ, ২য় বিভাগ প্রেসিডেন্সী কলেজ

বিবাহ

পঠদ্দশায় চন্দ্রশেখরের প্রথম বিবাহ হয়—জিয়াগঞ্জের দেবীপুর গ্রামে। কয়েক বৎসর পরে—১৮৭৩ সনে তাঁহার পত্নী ইহলোক ত্যাগ করেন। এই পত্নী-বিয়োগ-ব্যথা হইতেই তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমে'র উৎপত্তি। চন্দ্রশেখরের স্ত্রী-ভাগ্য আদৌ সুখপ্রদ ছিল না। কিছু দিন পরে তিনি পুনর্বায় দারপরিগ্রহ করিলেন বটে কিন্তু ছয় মাস যাইতে-না-যাইতেই দ্বিতীয়া পত্নীও চিরতরে অন্তর্হিতা হইলেন। তাঁহার তৃতীয় বা শেষ বিবাহ হয় যখন তাঁহার বয়স ২৮।

অন্নসংস্থানে

ব্যবসায়ে মুখোপাধ্যায়-পরিবারের বিলক্ষণ ক্ষতি হওয়ায়, চন্দ্রশেখর জীবিকা অর্জ্জনে সচেষ্ট হন। বি এ পাস করিবার অল্প দিন পরেই, ১৮৭২ সনে, তিনি বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক হন। এই পদে তিনি ছয় মাস নিযুক্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ই তাঁহার সাহিত্যে হাতে খড়ি হয়। অতঃপর চন্দ্রশেখর

রাজসাহীর অন্তর্গত পুঁটিয়া ইংরেজী স্কুলে হেড মাষ্টারের পদ লাভ করেন। সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে তিনি মুর্শিদাবাদের ধনকুবের লছমীপৎ সিংহের নীলকুঠীতে তত্ত্বাবধায়কের পদে কিছু কাল কাজ করিয়া শেষে বি. এল. পড়িবার সঙ্কল্প করেন।

১৮৮০ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চন্দ্রশেখর প্রথমে বহরমপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন; কিন্তু তেমন পসার না হওয়ায় ১৮৯০ সনে কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টে যোগদান করেন। কার্য্যশৈথিল্য ও অন্যমনস্কতার জন্য এখানেও তিনি আইন-ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই।

কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁহার আর্থিক অনটন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহার অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া কাশিমবাজারের পুণ্যশ্লোক মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁহার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিয়া—তাঁহার সমস্ত ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বহরমপুরে ফিরাইয়া আনেন। তাঁহাকে প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে, তাঁহারই সম্পাদনায় মহারাজা 'উপাসনা' পত্রিকা প্রচারের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য চন্দ্রশেখর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মহারাজার নিকট হইতে মাসিক ৫০৲ বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছেন।

সাহিত্য-সেবা

'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাবের ছয় মাস পরে—১২৭৯ সালের আশ্বিন মাসে শ্রীকৃষ্ণ দাস রাজসাহী হইতে 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন একদা চন্দ্রশেখরের সতীর্থ

বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে চন্দ্রশেখর 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র জন্য "বিদ্যা বিড়ম্বনা" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন; উহা ১২৮০ সালের বৈশাখ-সংখ্যায় স্থান লাভ করে। ইহাই চন্দ্রশেখরের প্রথম মুদ্রিত রচনা। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট; প্রবন্ধটি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তিনি লেখকের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করেন। যথাসময়ে উভয়ের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হইল; বঙ্কিমচন্দ্র জানাইলেন, চন্দ্রশেখর 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য প্রবন্ধ লিখিলে তিনি তাহা প্রকাশ করিবেন। 'বঙ্গদর্শনে চন্দ্রশেখরের প্রথম রচনা—"শ্মশানে ভ্রমণ" ১২৮২ সালের আশ্বিন-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সন্দর্ভকার হিসাবে চন্দ্রশেখরের গুণপনা সাহিত্য-জগতে প্রচারিত হইতে বিলম্ব হয় নাই। সে-যুগের শ্রেষ্ঠ পত্রিকাগুলি তাঁহার রচনা সাদরে স্থান দিতে লাগিলেন। তাঁহার বহু জ্ঞানগর্ভ রচনা পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত অবস্থায় 'জ্ঞানাঙ্কুর' 'মাসিক সমালোচক,' 'সাহিত্য,' 'মালঞ্চ' (মাঘ ১২৯৫), 'প্রতিমা' (১২৯৭), 'জন্মভূমি' (১২৯৮), 'উপাসনা,' ভারতবর্ষ (ভাদ্র ১৩২০) প্রভৃতির পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল রচনার মধ্যে 'জ্ঞানাঙ্কুর' (আশ্বিন, কার্ত্তিক ১২৮১) প্রকাশিত "অদৃষ্টবাদ," 'সাহিত্যে' (শ্রাবণ ১৩০৮) "যৌন-সম্মিলন" ও 'উপাসনা'য় (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৮) "বিবাহের উৎপত্তি" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থাবলীঃ চন্দ্রশেখরের রচিত বা সঙ্কলিত পুস্তকের সংখ্যা মোটেই দীর্ঘ নহে। আমরা তাঁহার যে কয়খানি পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিলাম; বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। মসলা-বাঁধা কাগজ।

এই পুস্তকখানি কোথাও দেখি নাই।* ইহার অন্তর্ভুক্ত ছয় "সংখ্যা"—(১) ধর্ম্ম কি ?, (২) আমরা পশু না ত কি ?, (৩) কেতকী এবং নদী, (৪) ধর্ম্মের বিচার, (৫) কূপ, (৬) পদবৃদ্ধি—প্রথমে ১২৮০ সালের মাঘ-চৈত্র এবং ১২৮১ সালের আষাঢ়, শ্রাবণ ও পৌষ-সংখ্যা 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রকাশিত হয়। 'মসলা-বাঁধা কাগজ' অনেকটা 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র ধাঁচে লেখা।

২। উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম (গদ্যকাব্য)। ১২৮২ সাল (১-১-১৮৭৬)। পৃ. ১২০+শুদ্ধিপত্র ২।

প্রথমা পত্নীর বিয়োগে শোকসন্তপ্ত স্বামীর শোকোচ্ছ্বাস। সাতটি শোকোচ্ছ্বাসে সম্পূর্ণ এই গদ্যকাব্য রচনার ইতিহাস প্রসঙ্গে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তৎ-সম্পাদিত 'মাসিক বসুমতী'তে (কার্ত্তিক ১৩২৯) লিখিয়াছিলেন :—

"আমরা তাঁহাকে তাঁহার 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম' রচনার ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন :

'তখন শোকাবেগে আপনার তৃপ্তির জন্য আপনি লিখিতাম। প্রথম প্রবন্ধটি বহরমপুরে, দ্বিতীয়টি কলিকাতায় ও আর কয়টি পুঁটিয়ায় লিখিত হয়। তখন আমি পুঁটিয়া স্কুলে মাষ্টারি করি। ছুটির সময় বহরমপুরে আসিতে রাজসাহীর পথে আসিতে হইত। আসিবার সময় আমি শ্রীকৃষ্ণ দাসের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া

---

* "পঠদ্দশায় চন্দ্রশেখর 'মসলা-বাঁধা কাগজ' নামে যে পুস্তক রচনা করেন—তাহা অধুনা লুপ্তপ্রায়। বঙ্কিমচন্দ্র এই পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।"—"চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়" : শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'ভারতবর্ষ,' আষাঢ় ১৩৪৬।

আসিতাম। সে-বার সেই রচনার কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিবার জন্য খাতাখানি রাখিয়া দিলেন। আমি বহরমপুরে আসিলাম। ইহার পরই শ্রীকৃষ্ণ কলিকাতায় হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার ছাপাখানায় [অনুবীক্ষণ যন্ত্রে] যোগ দেন। তিনি খাতা কলিকাতায় লইয়া যায়েন। কিছু দিন পরে তিনি আমাকে লিখিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র একদিন ছাপাখানায় যাইয়া কোন রচনা তাঁহার কাছে আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় শ্রীকৃষ্ণ আমার রচনার কথা বলেন। রচনাগুলি পাঠ করিয়া তিনি 'শ্মশানে ভ্রমণ' শীর্ষক প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ জন্য [দ্র° আশ্বিন ১২৮২] লইয়া গিয়াছেন। আমাকে না জানাইয়া প্রবন্ধ দেওয়া সঙ্গত হইবে কি না, শ্রীকৃষ্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, তিনি প্রবন্ধ লইয়া গিয়াছেন শুনিলে আমি, বোধ হয়, আর প্রবন্ধ দিতে অস্বীকার করিব না। আমি সেই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে উত্তর দিয়াছিলাম। ইহার কয় দিন পরে শ্রীকৃষ্ণ লিখিলেন, তিনি রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন—তবে পুস্তকখানি বড় স্বল্পায়তন হইবে, সুতরাং একটু বাড়াইলে ভাল হয়; আর আমি যদি বাড়াইতে চাহি, তবে যেন অতি শীঘ্র আর কিছু রচনা পাঠাই, কারণ, পুস্তক ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। পত্র অপরাহ্ণে পাইয়া রাত্রিতে 'শয়ন মন্দিরে' লিখিতে বসি এবং পরদিন অপরাহ্ণের মধ্যে উহা শেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই।'

'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম' একখানি উচ্চপ্রশংসিত বহুল-প্রচারিত গ্রন্থ। 'জন্মভূমি' (অগ্রহায়ণ ১৩০৩) লিখিয়াছিলেন, "চন্দ্রশেখর বাবু এক দিন মনের আবেগে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'ভাই! অনেক লোক অনেক রকমে 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমে'র সুখ্যাতি করিয়াছেন বটে, কিন্তু একটি

এম. এ-পাস যুবক আমায় যে compliments দিয়েছেন তেমন প্রশংসা আমি জীবনে শুনি নাই। যুবকটি কোন ভদ্রলোকের নিকট বলিয়াছিলেন, 'দেখুন, আমার স্ত্রীকে আমি বড় ভালবাসি: কিন্তু আমার সেই স্ত্রী মরিয়া যাক,—আমি যেন উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমের মত বই লিখিতে পারি।'"

৩। **সারস্বতকুঞ্জ**। ১২৯২ সাল (২৭-৯-১৮৮৬)। পৃ. ১২৭।

"বঙ্গদর্শন, বান্ধব, জ্ঞানাঙ্কুর এবং মাসিক সমালোচকে সময়ে সময়ে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তন্মধ্যে কতকগুলি পুনর্মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।···প্রবন্ধগুলি প্রথমে যেরূপ বাহির হইয়াছিল, এক্ষণেও প্রায় সেইরূপই থাকিল। স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে কিঞ্চিৎ মাত্র।"—অবতরণিকা।

সূচী: রামবসুর বিরহ, সতীদাহ, মৃণ্ময়ী, রসসাগর, বাঙ্গালির কল্পনাপ্রিয়তা, পশুপূজা, যৌননির্ব্বাচন, বঙ্গে ধর্ম্মভাব, ভার্গববিজয়, বাঙ্গালির জন্য নূতন ধর্ম্ম।

৪। **স্ত্রী-চরিত্র**। ১২৯৭ সাল (২১-৬-১৮৯০)। পৃ. ৬৪।

"হার্বার্ট স্পেন্সারের সমাজতত্ত্বাধ্যয়ন নামক গ্রন্থ পড়িয়া স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে আমার কিছু লিখিবার ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সময়ে সময়ে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা খণ্ডে খণ্ডে কতকটা সাময়িক পত্রে প্রকাশিতও হইয়াছিল। এত দিনে যাহা লিখিতে বাকী ছিল, তাহা লিখিয়া প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিয়া, প্রকাশিত হইতে চলিল।"—ভূমিকা।

৫। **কুঞ্জলতার মনের কথা**। (১০-৪-১৯০২)। পৃ. ৩৭।

"'কুঞ্জলতার মনের কথা' অনেক দিন হইল বিভিন্ন মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। যৌবনকালে রচিত এই রহস্য

প্রবন্ধগুলি আমি যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এক্ষণে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব এমত সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু আমার পরম স্নেহাস্পদ মজুমদার লাইব্রেরির অধ্যক্ষগণ সনির্ব্বন্ধ আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি সম্মতি প্রদান করিলাম। এই প্রবন্ধগুলি প্রথমে স্ত্রীলোকের লিখিত পত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছিল! সেই আকার এখনও রাখা গেল।"—ভূমিকা।

৬। **রস-গ্রন্থাবলী**। ১৩১২ সাল (১৪-৮-১৯০৫)। পৃ. ১৩৩।

সূচী: ১। কবিবর দাশরথি রায়ের পাঁচালী, ২। রাম বসু, ভোলা ময়রা, এন্‌টনি সাহেব প্রভৃতি কবির গান, ৩। নিধুবাবুর টপ্পাবলী, ৪। মধু কানের ঢপ্ কীর্ত্তন ইত্যাদি।

সাময়িকপত্র-সম্পাদন: চন্দ্রশেখর কেবল সুলেখকই ছিলেন না, বিলক্ষণ সমালোচন-শক্তিরও অধিকারী ছিলেন; রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ২য় পর্য্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে' তিনি নিয়মিতভাবে পুস্তক সমালোচনা করিতেন। মাসিক পত্রিকা সম্পাদনেও তাঁহার কৃতিত্ব বড় কম নহে। আমরা তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি:—

মাসিক সমালোচক: বি এল. পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে চন্দ্রশেখর বহরমপুর হইতে প্রকাশিত 'মাসিক সমালোচক' নামে একখানি মাসিকপত্র কিছু দিন সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—এপ্রিল ১৮৭৯। প্রথম সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ভারতী' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬) যে সপ্রশংস উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"মাসিক সমালোচক।—সর্ব্বশাস্ত্র বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচক, সম্পাদক শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—১ম খণ্ড, ১ম

সংখ্যা-বৈশাখ মাস। বহরমপুর অরুণোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা।

এই মাসিক পত্রখানিকে আমরা অতিশয় প্রীতির সহিত পাঠ করিলাম। "উত্তরে সখীর প্রতি" বলিয়া কবিতাটি যেমন সুন্দর হইয়াছে, "বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থা" বিষয়ক প্রবন্ধটিও তেমনি সৎচিন্তা-মূলক হইয়াছে—অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও মন্দ হয় নাই।

উপাসনা : চন্দ্রশেখর আরও একখানি মাঁসিকপত্র অনেক দিন যাবৎ পরিচালনা করিয়াছিলেন ; উহা কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত 'উপাসনা'। 'উপাসনা' ১৩১১ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। চন্দ্রশেখর উহার প্রথম বর্ষ হইতে অষ্টম বর্ষের ৫ম সংখ্যা (মাঘ ১৩১৮) পর্য্যন্ত সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদন-গুণে 'উপাসনা' সুনাম অর্জন করিয়াছিল।

মৃত্যু

১৩২৯ সালের ২রা কার্ত্তিক (১৯২২, ১৯এ অক্টোবর), ৭৩ বৎসর বয়সে চন্দ্রশেখরের জীবনাবসান হয়। ইহার তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার তৃতীয়া পত্নী বা শেষ জীবনসঙ্গিনী লোকান্তরিতা হইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরের মৃত্যুতে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত 'সাহিত্যে' (কার্ত্তিক ১৩২৯) যে প্রশস্তি করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য ; তিনি লেখেন :—

"'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম'-প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় আর নাই। তিয়াত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ করিয়া মুর্শিদাবাদে ভাগীরথী-তীরে তিনি দেহ রাখিয়াছেন।···

চন্দ্রশেখর বাঙ্গালা সাহিত্যের যে কেমন পুরুষ ছিলেন, তাহা আধুনিক যুবজন জানে না—বুঝি বা তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টাও করে না। চন্দ্রশেখর বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন ঋষি বা স্রষ্টা প্রবর্ত্তক ছিলেন। গদ্যে পদ্যের ভাব ও রসোল্লাস, মাধুরী ও বচন চাতুরী তিনিই প্রথমে আমদানী করেন। তাঁহার 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম' গদ্যে একখানি মহাকাব্য,—অপূর্ব্ব, অতুল্য এবং অদ্বিতীয়। উহা আর হইবে না, বুঝি বা হইবার নহে। চন্দ্রশেখর বঙ্কিম-যুগের একজন সন্দর্ভকার ছিলেন। এত প্রবন্ধ নিবন্ধ আর কেহ লিখে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন চন্দ্রশেখরের লেখায় কলম ডালিবার যো নাই। সে এমন সাজাইয়া গোছাইয়া লিখে, এমন ওজন করিয়া শব্দ চয়ন করে যে একটি শব্দও বদলাইবার অবসর থাকে না। চন্দ্রশেখরের গদ্য সত্যই অতুল্য ও অনুপম ছিল।

চন্দ্রশেখর নিয়মিত টোলের ছাত্র ছিলেন, তাই তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্র ভাল করিয়া জানিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট ছিল। কেবল সংস্কৃত ও ইংরেজী নহে, চন্দ্রশেখর ফরাসী বা ফ্রেঞ্চ ভাষা বেশ জানিতেন। ইংরেজী ও ইউরোপীয় সাহিত্যকে যেন গুলিয়া খাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকরের মধ্যে মূর্খের স্থান ছিল না—তারাপ্রসাদ, রাজকৃষ্ণ, চন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, নীলকণ্ঠ, চন্দ্রশেখর, হরপ্রসাদ প্রমুখ অনেকেই এক একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। চন্দ্রশেখর আবার সুগায়ক ছিলেন, আর এমন সুর, তান লয় শুদ্ধ সুকণ্ঠের

গান ইংরেজীনবিসের দলের মধ্যে কাহারও মুখে শুনি নাই আর সে গানের সংগ্রহই বা কত। কীর্ত্তন পাঁচালী শ্যামাবিষয়ক ও টপ্পা চন্দ্রশেখর যে কত জানিতেন তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। কোন মজলিসে চন্দ্রশেখর উপস্থিত থাকিলে গায়কের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত; সকল প্রসিদ্ধ গায়কই জানিতেন যে গজল, খেয়াল, টপ্পা কোন গানে ফাঁকি দিবার উপায় ছিল না। চন্দ্রশেখরের আর একটা ব্যসন ছিল, তিনি 'বটতলার দোকানে দোকানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং পুরাতন পুথি ও কাব্য যাহা ছাপা পাইতেন তাহাই খরিদ করিতেন। চন্দ্রশেখরই বটতলার ফাঁকিবাজী ধরিয়া দেন। বটতলার অধীনে জনকয়েক পয়ারপটু ব্রাহ্মণ কবি ছিলেন, তাঁহারা ত্বরিত রচনায় পারদর্শী ছিলেন। ইঁহারা "প্রক্ষেপে"র (Interpolation) রাজা ছিলেন। যেখানে পুরাতন পুথি পড়া যাইত না, বা অর্থ গ্রহণ করা কঠিন হইত, সেখানেই ইহারা স্বরচিত গোটাকয়েক শ্লোক বসাইয়া কাজ সারিতেন। চন্দ্রশেখর এই কাণ্ডটা ধরাইয়া দেন এবং বটতলার গুপ্ত কবিদিগের দুই তিন জনের নামও প্রকাশ করেন। চন্দ্রশেখরের এই আবিষ্কারের ফলে প্রভুপাদ বলাই চাঁদ এবং প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী উভয়ে মিলিয়া অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া চৈতন্য-ভাগবতের একটি পবিত্র সংস্করণ বাহির করেন। চৈতন্য-চরিতামৃতেরও কতকটা সংস্কার এই সময়ে ঘটিয়াছিল।

চন্দ্রশেখর উদার, উন্নত, সত্যবাদী ও সরলহৃদয় পুরুষ ছিলেন। তিনি একেবারেই বিষয়ী গৃহস্থ ছিলেন না; সঞ্চয় করিতে জানিতেন না। তাঁহার প্রথম পক্ষের পত্নী বিয়োগের পরেই তাঁহার জীবনটা শিথিল হইয়া যায়, জীবনে মমতা থাকে নাই,

সংসারে আঁটও ছিল না। শেষে ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতিভাও বিক্ষিপ্ত পরস্পরশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।

গেল—সব গেল। ভারতীব অতল কৃপায় সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ মনীষার গজমুক্তার সাতলহরের মালা বঙ্গভূমির কণ্ঠে এত দিন দুলিতেছিল, বঙ্গভূমির কণ্ঠ কত ভাবের কত ছাঁদের লেখা সে মালার আন্দোলনে অনপনেয় রেখায় অঙ্কিত রহিয়াছে,—হায় রে, এতদিনে সে মালা বুঝি বা ছিন্ন হইয়া ধূলায় লুটায়! এক দিকে কেশবচন্দ্র, অন্য দিকে বঙ্কিমচন্দ্র, মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র ধকৃধকির মতন বিরাজ করিতেছিলেন, আর দুই দিক হইতে ব্রাহ্ম সাহিত্য ও বঙ্কিমী সাহিত্য, গঙ্গা যমুনার ন্যায় কুল-কুল, কল-কল, ছল-ছল রবে অবিশ্রান্ত ধারায় বাহির হইতেছিল। মাইকেল ভূদেব হইতে রবীন্দ্রনাথ হরপ্রসাদ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর সাহেব দেবতা সকল সে যুগল ধারাকে দুই কূল উপচাইয়া পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আচার্য্য শিবনাথের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সে ব্রাহ্মমনীষার ধারা অর্থাকাঙ্ক্ষার মহামরুতে আত্মগোপন করিয়াছে। বঙ্কিম-যুগের রবীন্দ্রনাথ এবং হরপ্রসাদ এখনও বিদ্যমান। তাঁহাদের অন্তর্ধান হইলে থাকিবে কি? থাকিবে বিলাসের এবং অভাবের লেলিহান জিহ্বা বিস্তারের সহিত শুষ্ক কণ্ঠের ব্যর্থ "টাকা টাকা" রব—থাকিবে ব্যসনাসক্তের বিদ্বেষ বিজৃম্ভণস্বরূপ প্রতিবিধিৎসার নীলিম বহ্নি মুখের উৎকট বিকাশ। আর মূর্খতার ঘোর ত্রিযামায় ফেরুপালের হা হা রব, অট্ট-অট্ট খট খট হাস্য। চন্দ্রশেখর চলিয়া গেলেন—ভাষার নির্ম্মল প্রতিচ্ছন্দ্রও সেই সঙ্গে ডুবিল। সে বাঙ্গালী ত নাই, উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া শোকগাথা লিখিবে কে?"

চন্দ্রশেখর ও বাংলা-সাহিত্য

'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমে'র রচয়িতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়কে আমরা আজ প্রেমিক হিসাবে স্মরণ না করিলেও বাংলা-সাহিত্যের একজন সক্ষম শিল্পী হিসাবে স্মরণ করিয়া থাকি। এক সময় তাঁহার "কি বলিতেছিলাম—ভুলিয়া গেলাম" এবং "মনে করি করি করিতে পারি না মুখখানি" শুধু বাংলা-সাহিত্যের পাঠকদেরই বিহ্বল করে নাই সেকালের অনেক লেখককেও যে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহার সাক্ষ্য বহু পুরাতন সাময়িক-পত্র আজিও বহন করিতেছে। এক 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমে'র জোরে চন্দ্রশেখর বাংলা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের "শ্মশান" অধ্যায় এক বিশিষ্ট রচনা-পদ্ধতির আদর্শ হিসাবে আজিও পঠিত ও গ্রাহ্য হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'মসলা-বাঁধা কাগজ' পাঠ করিলে সহজেই প্রতীতি হইবে যে, চন্দ্রশেখর তাঁহার সাহিত্যসাধনার প্রারম্ভ হইতেই এই পদ্ধতি বা ষ্টাইলের অধিকারী ছিলেন। এই ষ্টাইল ভাবোচ্ছল হইলেও প্রভূত পর্য্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নসম্ভূত। বস্তুতঃ চন্দ্রশেখরের রচনায় পাণ্ডিত্য ও ভাষাতিশয্যের এক আশ্চর্য্য সমন্বয় ঘটিয়াছে।

চন্দ্রশেখরের অনবদ্য রচনার সহিত আধুনিক পাঠকের পরিচয় সাধনের জন্য আমরা তাঁহার সুপ্রচারিত 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম' হইতে কোনও নিদর্শন দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিলাম না; সাহিত্য-সাধকের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ পাঠ্য। তাঁহার 'মসলা-বাঁধা কাগজ' পুস্তকখানি সংগ্রহ করিতে না পারিলেও 'জ্ঞানাঙ্কুর' হইতে উহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সাহিত্য-সাধনার প্রথম পর্য্যায়ের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছি; পুস্তকখানি কেহ অধুনা পুনঃপ্রকাশ করিলে ভাল হয়:

"ধর্ম্ম কি ?···জড়োপাসনা হইতে যেমন একেশ্বর-বাদ সমুদ্ভূত হয়, তেমনি একেশ্বর-বাদ হইতে আবার পৌত্তলিকতার জন্ম হয়। যিনি প্রমাণ চাহেন, তিনি দেখিবেন যে, এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্ম অনেকাংশে পৌত্তলিকতায় পরিণত হইয়াছে ; প্রাচীন ভারতে বেদান্তের পর পৌত্তলিকতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।···

এক্ষণে বঙ্গদেশেপ্রচলিত ব্রাহ্মধর্ম্মও যে কালে পৌত্তলিকতায় পরিণত হইবে, তাহারও পথ ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হইতেছে। এক্ষণেই কেহ২ অবতার বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন—তৃতীয়াবতার পর্যান্ত হইয়া গিয়াছে। পরে আরও হইবে, তাহাও বুঝা যাইতেছে। ব্রাহ্মেরা বলিতেছেন, 'নিরাকারে ঈশ্বর পরম সুন্দর।' কালে বোধ হয়, ভারতচন্দ্রের সুন্দরের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া ঈশ্বর বলিয়া আরাধিত হইবে।" (মাঘ ১২৮০)

আমরা পশু না কি ?···এই সকল ভাবিতে ভাবিতে আমার বোধ হইল, পশুর মধ্যে যেমন জাতিবিভাগ আছে, মনুষ্য-পশুর মধ্যেও তেমনি আছে, এক এক সম্প্রদায়ের মনুষ্য এক এক জাতীয় পশুর সঙ্গে স্বভাবাপন্ন। কোন্ সম্প্রদায়ের মনুষ্যের কোন্ পশুর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, তাহা ভাবিয়া আমি যে ফল পাইয়াছি তাহা কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতেছি।

ইংরাজদিগকে আমার শিবাবতার হনূমান বলিয়া বোধ হয়! ইঁহারা যে সমুদ্র পার হইতে সক্ষম, তাহা ত প্রত্যক্ষই দেখিতেছি। হনূমানের কীর্ত্তি আশ্চর্য্য। হনূমান না হইলে সীতার উদ্ধার হইত না ; ইংরেজেরা এ দেশে না আসিলে ভারতলক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার হইত না—আমাদের নাম উঠিয়া যাইত—আমরা এত দিন সাঁওতাল হইতাম। ইংরেজেরা ইউরোপ হইতে বিশল্যকরণী আনিয়া

মৃতপ্রায় ভারতকে জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। এই যে সুখসেব্য; উপাদেয় দেবতাদুর্লভ আম্র খাইব বলিয়া আজ হইতেই উৎসাহ করিতেছি, এ অমৃতোপম ফল হনুমানই এ দেশে আনিয়াছিল। আমরা যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনের মধুর রস আস্বাদন করিয়া চরিতার্থ হইতেছি, ইহা অনেকাংশে ইংরেজদের প্রসাদাৎ। মাটির দোষে অনেক আম্র টক্ হইয়া উঠিয়াছে—আমাদের এ পোড়া দেশের জল বায়ুর গুণে ইংরেজী সভ্যতা কোন কোন অংশে আমাদের বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে টক্ আম্র কোন্‌গুলি জান?—স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, সিভিল সারভিস্ পরীক্ষা ইত্যাদি আমাদিগকে টক্ আম্র খাইতে হয় বলিয়া কিছু আমরা অঞ্জনানন্দনকে গালি দেই না—তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ ছিল। তিনি আমাদের সুখের কামনাতেই এ ফল আনিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের মাটির দোষ —আমাদের পোড়া কপালের দোষ।...

আমাদের দেশীয় হাকিমেরা পশুর মধ্যে ছাগল। গ্রীষ্মকালে এক এক ব্যক্তি বানর এবং ছাগল লইয়া ভিক্ষা করিতে আসে, তাহা বোধ হয়, সকলেই দেখিয়াছেন। তাহাদের খেলাগুলি একবার মনে করুন, আপনিই সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। ভূমি হইতে অর্দ্ধহস্ত উচ্চ একখানি সংকীর্ণায়তন কাষ্ঠের আসন পাতে; শিক্ষিত ছাগলটি অতি কষ্টে তাহার উপর চারি পা একত্র করিয়া দাঁড়ায়। বানরটি মাথায় টোপর দিয়া সেই ছাগলের পৃষ্ঠে আরোহণ করে। বানর, চাবুক মারে, কান ধরিয়া টানে—ছাগলটি নিরীহ ভদ্রলোকের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বাঙ্গালী হাকিমেরা সাধারণ লোক অপেক্ষা কিছু উচ্চপদস্থ বটেন, কিন্তু দাঁড়াইবার স্থান বড় সংকীর্ণ; ক্ষমতা অতি অল্প—হাত পা গুটাইয়া থাকিতে হয়।

পৃষ্ঠের উপর জেলার বড়২ সাহেব লাগাম দিয়া, কান ধরিয়া—অগত্যা নিরীহ ভদ্রলোকের মতন টুপিওয়ালা বানর বহন করেন। ছাগলটির পা একটু সরিলেই অমনি উপর হইতে বানর চাবুক মারে, আবার ভিক্ষুক প্রদর্শনকারী চপেটাঘাত করে।...

আমাদিগের মধ্যে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিসূত্রে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত, তাহাদিগকে আমার গর্দ্দভ বলিয়া বোধ হয়। গর্দ্দভ অনেক রকমের অনেক বস্ত্র পৃষ্ঠে বহন করে। একটি গর্দ্দভের ভার নামাইয়া খুলিয়া দেখুন,—অমুক রাজার বাড়ীর এক শত টাকা মূল্যের একখানি শান্তিপুরে শাড়ী, অমুক বড়লোকের গৃহিণীর একখানি বিচিত্র ঢাকাই শাড়ী, কৃষ্ণকান্ত তর্কালঙ্কারের একখানি ছেঁড়া মলমলের চাদর, ফয়জুল্লা সেখের আধখানি পায়জামা—উত্তম মধ্যম, অধম অনেক রকম বস্ত্র দেখিতে পাইবেন; গর্দ্দভের বাছাবাছি নাই, সে সব বহন করে। কৃতবিদ্য যুবকদলের মধ্যে একটির ভার নামাইয়া দেখুন—সেক্ষপীয়রের একটি প্লে, মিল্টনের দুই ছত্র, কালিদাসের আধখানি শ্লোক, মিল এবং হামিল্টনের দুইটি কথা; গৃহিণী রচিত একটি পদ্য, বটতলার একখানি নাটকের এক অঙ্ক দেখিতে পাইবেন। গর্দ্দভ অনেক বস্ত্র বহন করে, কিন্তু আপনি উলঙ্গ—ইহার পৃষ্ঠে বিদ্যাবিষয়ক অনেক কথা আছে, কিন্তু আপনি কোন বিষয়েই বাক্যব্যয় করিতে পারে না। এক জনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন, 'মহাশয়, অমুক বিষয়ে আপনার মত কি?' বাবু থেলিস হইতে অগষ্টী কোমটী পর্য্যন্ত সকলের নাম করিবেন, সক্রেটীস হইতে হারবার্ট স্পেন্সর পর্য্যন্ত সকলের মত আওড়াইবেন, কিন্তু নিজের মতের বেলা পৃষ্ঠ হাতড়াইয়া দেখিলেন,

কেশব বাবু কিছু বলিয়াছেন কি না? যদি না বলিয়া থাকেন, তবেই অবাক্।…

আমাদের দেশে যাহারা সমালোচক বলিয়া খ্যাত, তাহাদের অনেকের সঙ্গে আমি কুকুরের সাদৃশ্য দেখি। ইহারা সাহিত্যের দ্বারে প্রহরী—কাহাকেও প্রবেশ করতে দেখিলেই অমনি খেউ খেউ করিয়া কামড়াইতে আসে। ভদ্রাভদ্র চিনিতে পারে না; সকলকেই আক্রমণ করে—অভিপ্রায়, কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে না। এমন বুদ্ধিমান কুকুরও আছে, যাহারা লোক চিনিতে পারে; কে প্রবেশ করিবার যোগ্য, কার প্রবেশ করিবার অধিকার নাই, তাহা বুঝিতে পারে। কিন্তু এরূপ কুকুর আমাদের দেশে বড় বিড়ল, বিলাতি কুকুরের এ গুণ আছে বটে।…

রমণীকুলের সঙ্গে আমি শূকরের সাদৃশ্য দেখি। ছোট২ শূকরগুলি দেখিতে মন্দ নহে, কিন্তু বয়স হইলে বড় কদাকার হয়। অল্পবয়স্কা যুবতী দেখিতে বড় সুন্দর—নয়ন ফিরান দুষ্কর, কিন্তু অধিক বয়স হইলে অতি কদাকারা হয়।

অল্প রৌদ্রেই শূকর উত্তপ্ত হইয়া ছটফট করে; রমণী অল্প প্রলোভনেই ব্যাকুল হয়। একটু অধিক রৌদ্র হইলেই, নিদাঘ সন্তাপে শরীর উত্তপ্ত হইলেই, শূকর অমনি দৌড়িয়া গিয়া দুর্গন্ধময় নর্দ্দমায় পড়িয়া শরীরের জ্বালা নিবারণ করে। রমণীর চক্ষের উপর রূপের জ্যোতি জ্বলিলে, রূপরৌদ্রে মন উত্তপ্ত হইলে, অমনি জ্ঞানশূন্য হইয়া স্থানাস্থান, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা না করিয়াই দৌড়িয়া গিয়া পাপ-পঙ্কে পড়িয়া আশু শীতল হয়। নিকটে দেবতাবাঞ্ছিত নির্ম্মল জাহ্নবীর পবিত্র জল রহিয়াছে, শূকর তাহা চায় না—

নৰ্দ্দমাই ভাল। কি আশ্চর্য্য! নরকুলের গৌরব জু লয়স্ সিজরের ভার্য্যা পাপ ক্লোডিয়সের অনুরাগিণী।

শূকরকে অতি সাবধানে খোঁয়াড়ে বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়, নহিলে পথ পাইলেই অমনি গিয়া হয় নর্দ্দমায় পড়িবে না হয় বিষ্ঠায় মুখ দিবে। স্ত্রীলোককে অতি সাবধানে অন্তঃপুরে বন্ধ করিয়া শাসনে রাখিও, নহিলে পাপে পড়িয়া শরীর কলুষিত করিবে। ··

ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগকে আমার বিড়াল বলিয়া বোধ হয়। বিড়ালকে যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া ফেলিয়া দাও, পায়ে ভর দিয়াই পড়িবে,—আঘাত প্রাপ্ত হইবে না। ধর্ম্মব্যবসায়ী যে ধর্ম্মেরই লোক হউন, তুমি অকাট্য যুক্তির দ্বারা তাঁহাকে উল্টাইয়া দাও, কিন্তু তিনি পড়িলেও পা পাতিয়া পড়িবেন।

বিড়াল, আলোক অপেক্ষায় অন্ধকারে দেখে ভাল—লোকে বলে, রাত্রে বিড়ালের চক্ষু জ্বলে। ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগকে পার্থিব কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বড় পাইবে না, কিন্তু পরলোক সম্বন্ধে সমস্ত দিন ধরিয়া বক্তৃতা করিতে পারেন। 'যজ্ঞোপবীত না ফেলিলে স্বর্গপ্রবেশের অধিকার নাই,' এই বিষয় লইয়া এক ব্যক্তিকে আমি স্বয়ং দুই ঘণ্টা কাল অনর্গল বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছি।

বিড়াল, নিষ্কর্ম্মা রমণীর বড় প্রিয়পাত্র। প্রায়ই দেখা যায়, নিষ্কর্ম্মা রমণী মাত্রেরই একটি একটি বিড়াল থাকে। বালকেরাও বড় বিড়ালভক্ত। ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগের প্রভাব স্ত্রীলোক এবং বালকের মধ্যেই কিছু বেশী। কথক, রামায়ণ-গায়ক, গুরু পুরোহিতের কথাটা এক বার মনে করুন—ইচ্ছা হয়, বঙ্গদেশের নব প্রচারিত ধর্ম্মের কথাটাও একবার ভাবুন।

শিক্ষকদিগের সঙ্গে আমি গোরুর সাদৃশ্য দেখিতে পাই। গোরু, পশু হইলেও বড় ভক্তির ধন। গোরু অনেক কাজে লাগে। গোদুগ্ধে শরীরের পুষ্টিসাধন হয়। গোরু না থাকিলে আমাদের দেশে চাষ হইত না—আমাদের অন্নাভাব হইত। শিক্ষকগণ যে কত লোকের অন্নদাতা, তাহার সংখ্যা কে করিবে? ইঁহাদেরই কৃপায়, ইঁহাদেরই বলে আমাদের দেশের অনেক লোক অন্ন করিয়া খায়।

অন্য দেশে গোরু নহিলেও চলে—ইংলণ্ডে ঘোটকের দ্বারা চাষ হয়; কিন্তু বাঙ্গালীর গোরু নহিলে উপায় নাই। ইউরোপে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের যেরূপ অবস্থা এবং গ্রন্থে যেরূপ বহুল প্রচার, তাহাতে শিক্ষকের বিশেষ সাহায্য ব্যতীতও বিদ্যোপার্জন করা যায়, কিন্তু আমাদের দেশে বিনা শিক্ষকে চলিবার উপায় নাই।

গোরু যে দুগ্ধ দান করে, তাহা অতি উপাদেয়, কিন্তু গোরুর আহার ঘাস। পৃষ্ঠে শর্করাভার, কিন্তু তাহাতে অধিকার নাই; বহন করা মাত্র সার—আহারের বেলায় ঘাস।...

আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে আমার শৃগাল বলিয়া বোধ হয়। পশুর মধ্যে শৃগাল অতি ধূর্ত্ত—ধূর্ত্ততার বলেই করিয়া খায়; পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা চিরকাল সমস্ত ভারতবর্ষকে ঠকাইয়া খাইতেছেন—ইহাদিগকে আজি পর্য্যন্ত কেহ ঠকাইতে পারিল না। শৃগাল দিবসে সূর্য্যালোকে প্রায় দেখা দেয় না, রাত্রে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া শব্দ করে এবং সুযোগ পাইলে অন্যান্য ক্ষুদ্র জীব ধরিয়া লইয়া পলায়ন করে। যেখানে জ্ঞানের আলোকে মনের অন্ধকার অনেক দূর হইয়াছে, সেখানে ব্রাহ্মণেরা বড় আধিপত্য

করিতে পারেন না; অশিক্ষিত ব্যক্তির নিকটে বক্তৃতাদি করিয়া কৌশলে অর্থাপহরণ করেন। শ্মশানে অনেক শৃগাল দেখিতে পাওয়া যায়। তোমার প্রেমপ্রতিমা মানবলীলা সম্বরণ করিয়া তোমার গৃহ শ্মশান করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তথায় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাতায়াত করিতেছেন। একটি মৃতদেহ পড়িলে, রাজ্যের শৃগাল তাহার চারি পার্শ্বে সমবেত হয়, পরস্পর কলহ করে এবং পরমানন্দে মৃতদেহের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদরসাৎ করে। মানুষশৃগালেরাও মৃত্যুর গন্ধ পাইলে, দলে দলে আসিয়া শ্রাদ্ধবাড়ী পরিপূর্ণ করিয়া তুলেন; পরস্পর কলহ, বিবাদ, হাতাহাতিও বাদ যায় না। অবশেষে উত্তমরূপে উদর পূর্ত্তি করিয়া এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নগদ লইয়া প্রস্থান করেন।" (ফাল্গুন ১২৮০)

কেতকী এবং নদী :...সংসার যে এত সুন্দর, এমন শীতল বলিয়া বোধ হয়, তাহার মূলাধার রমণী। মাতার স্নেহ, ভগিনীর আদর, গৃহলক্ষ্মীর প্রেম না থাকিলে সংসারে কি সুখ থাকিত? এ সকল যাহার আছে, তাহার পক্ষে সংসারে এবং স্বর্গে প্রভেদ কি? এ সংসারে ভালবাসাই এক মাত্র সুখের মূল—দ্বিতীয় মূল নাই। রমণীর ন্যায় ভালবাসিতে কে জানে? পুরুষের প্রণয় স্বার্থ-পর; রমণীই কেবল আপনা ভুলিয়া ভালবাসিতে পারে, রমণীই কেবল পরের জন্যে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারে—রমণী কেবল যাহাকে মন দেয়, তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারে, রমণী কেবল হাসিতে২ জ্বলন্ত চিতায় শয়ন করিতে পারে।

তুমি পথিক, ভ্রমণ করিয়া২ অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছ—এক বার ঐ নদীতীরে বসিয়া স্বচ্ছসলিলকণবাহী সমীরণ সেবা কর, সকল শ্রম দূর হইবে। তুমি পুরুষ, সংসার-যাতনায় বড় ক্লিষ্ট

হইয়াছ, এক বার রমণী শীতল স্নেহবারিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ কর, সকল দুঃখের শেষ হইবে।" (চৈত্র ১২৮০)

কূপ ঃ কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী ইষ্টকালয়ং।

শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালেচ শীতলং॥

হে কূপ, চাণক্য পণ্ডিত কেবল তোমার গুণ দেখিয়াছিলেন, গুণ গাইয়াছিলেন। তিনি গান্, কিন্তু আমি তোমার অনেক দোষ দেখিতে পাই। তুমি রাগ করিও না, 'এ সংসারে কিছুই নির্দ্দোষ নহে, কিছুই নির্গুণ নহে—সকলেরই গুণ আছে, সকলেরই দোষ আছে। পূর্ণচন্দ্র মাসে এক দিন, সূর্য্য দুর্লক্ষ্যণীয়, নক্ষত্রগণ অগম্য, প্রণয়ে বিচ্ছেদ আছে, স্নেহ আশঙ্কাপরায়ণ, মনুষ্য আত্মাদররত, সৌন্দর্য্য সর্ব্বনাশের কারণ, বিদ্যায় সন্দেহ বাড়ে, হৃদয় কঠিন হয়, মৃত্যু ইচ্ছাধীন নয়। আবার সমুদ্রে দ্বীপ আছে, আকাশে চাঁদ আছে, মেঘে বিদ্যুৎ হয়, অরণ্যে ফুল ফুটে, সংসারে ভালবাসা আছে, মনুষ্যজীবনে বিবাহ আছে, মুর্খতা শান্তিপ্রদ, দারিদ্র্য রোগহীন, বিচ্ছেদে তন্ময় হই—যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই তাহাকে দেখি, তুমিও গ্রীষ্মকালে শীতল, শীতকালে উষ্ণ।

তোমার ন্যায় বটচ্ছায়াও গ্রীষ্মকালে শীতল, কিন্তু শ্যামা স্ত্রী, বুঝি সকলের ভাগ্যে নয়। অপরের যেমন হোক, আমার ভাগ্যে নয়। আমার গৃহিণী শ্যামা স্ত্রী বলিয়া পরিচিত হইলে হইতে পারেন, কিন্তু তাঁর শীত গ্রীষ্ম নাই—বার মাস—দিবারাত্রি গরম হইয়া থাকেন। তাঁর চক্ষের উষ্ণতা থাক্, কেবল কথার জ্বালায় গায়ে ফোস্কা পড়ে। শ্রীমুখের বাক্যযন্ত্রণায় আমার ইষ্টকালয় পর্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছে—এক দণ্ড বাড়ীতে তিষ্ঠিতে পারি না।

কত হরির লুট দিলাম, পীরের সিন্নি দিলাম, মধুমণ্ডার ব্রত করাইলাম, আপনি পেটে না খাইয়া চন্দ্রহার তৈয়ার করাইলাম, আপনি জীর্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া নীলাম্বরী এবং ঢাকাই শাড়ী কিনিলাম, আলতা-পরা পদযুগলকে স্মরগরলখণ্ডন বলিয়া বলিয়া মস্তকে ধরিলাম, এবং সকল কথায়, মোসাহেবের ন্যায় কেবল 'যে আজ্ঞা২' করিলাম, কিন্তু কাঙ্গালের কর্কট বাশি কখন শ্রীমুখে 'পোড়ারমুখো' বই আর কিছু শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু এ কথা তিনি বলিতে পারেন—তাঁব রাইট আছে, কারণ পদ্মহস্তে এমনি যত্ন করিয়া তাম্বূল তৈয়াব করেন যে প্রায় প্রত্যহই মুখ পুড়িয়া যায়, ব্যঞ্জনে লবণ এমন কবিয়া দেন যে, এত দিনে বোধ হয়, প্রকৃত পক্ষেই পোড়ারমুখ হইয়া উঠিয়াছে। ··

দেখ কূপ, তোমার আর একটি মহৎ দোষ আছে। তোমার ভিতরে যত অল্প জল থাকে, তত তুমি গভীর দেখাও, আবার জল না থাকিলে তুমি অতলস্পর্শ বলিয়া অনুমিত হও। আমি এই স্থলে গ্রন্থকারদিগের সঙ্গে তোমাব সাদৃশ্য দেখি। গ্রন্থকার যত কেন গভীর হউন না, যদি জল থাকে, অবশ্য তাহা দৃষ্ট হইবে। যিনি কেবল অন্ধকার, বুঝিতে হইবে তাঁহাতে জল নাই। বেকনের গ্রন্থসকল অতি দুরূহ, তবু তাঁহার ভাব গ্রহণ করা যায়। কোলরিজের দর্শন-সম্বন্ধীয় রচনাবলির অর্থ বোধ হয় না। হয় না, কিন্তু তাহা পাঠকের বুদ্ধির দোষ নহে, গ্রন্থকারের চিন্তাপ্রণালীর দোষ। হয় তাঁহার চিন্তাপ্রণালী অতি গোলমেলে অথবা তাঁহার রচনায় ভাব নাই—কেবল কথার আড়ম্বর মাত্র। আজকাল, অনেক অক্রুবান বাঙ্গালী কবির কথা বুঝা যায় না। আমাদের বক্তব্য, একটু লেখাপড়া শিখিয়া কবিতা লিখিলে ভাল হয় না?

দেখ, যেখানে নদী নাই, সেখানে তোমার জল অল্প—অনেক দূর না খুঁড়িলে পাওয়া যায় না। যায় না, কিন্তু যাহা যায়, তাহারই আদর কত। স্নান, আহার, ঠাকুর-সেবা, সব তোমারই জলে হয়। নদীতীরে তোমার জল অধিক হইলেও তাহার আদর নাই। কেহ স্নান করে না, কেহ খায় না—তাহাতে কেবল পাদধৌত হয় এবং স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করে। সেও কেবল ঘর নিকাইতে। বাঙ্গালী গ্রন্থকারেরা তোমার এই গুণের অধিকারী। নিকটে গভীর স্রোতস্বতী বহিতেছে বলিয়াই আমাদের গ্রন্থ লেখার এত আড়ম্বর। আজ যদি ইংরেজেরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যান, তবে কাল আমাদিগকে ইষ্টিল নিব, চস্‌মা, পারপেচুয়াল ইনক্‌ষ্ট্যাণ্ড ফেলিয়া আবার হলধর হইতে হয়। ইংরেজী শিক্ষাই আমাদের কল্পতরু, আমাদের কামধেনু। কিন্তু যেখানে ইংরেজী শিক্ষার প্রাদুর্ভাব অধিক, সেখানে কূপজলের বা বাঙ্গালা গ্রন্থের আদর নাই। সমস্ত দিন মিল্, কোমৎ, বেকন্ লইয়া ক্লান্ত হইয়া একখানি বাঙ্গালা সাময়িকপত্র পড়িতে২ তামাকু খাই এবং গৃহিণীর সঙ্গে রসিকতাই করি। কূপোদকে পদধৌত হয়। আবার যাঁহারা ইংরেজী জানেন না, তাঁহাদের কাছে বটতলার মহাত্মারাই মহারথী বলিয়া পরিচিত।

অতএব ভাই বঙ্গীয় গ্রন্থকার, অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই। দাদা যত মরদ, তা বড়বৌয়ের পায়েই মালুম। পরস্পরকে গালিগালাজ করিয়া লেখনী ক্ষয় করিবার দিন আজিও আমাদের হয় নাই—হইতে বিলম্ব আছে। গালিগালাজের দিন ত পলায় নাই। সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি কর, দর্শনের উন্নতি সাধন কর, বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া নূতন২ তত্ত্ব আবিষ্কৃত কর—কেবল

বিবাদ করিলে কি হইবে? আইস ভাই, সকলে মিলে মিশে উন্নতির স্বর্ণভূমে যাইবার জন্য সেতু নির্ম্মাণ করি। যাহার যাহা সাধ্য, সে তাহা করুক। তোমার ক্ষমতা অধিক, তুমি লোমকূপে করিয়া পর্ব্বত আনয়ন কর। আমার তেমন ক্ষমতা নাই, আমি না হয় বালুকা তুলিয়া ক্ষুদ্র২ রন্ধ্র পূর্ণ করিব। সাগরবন্ধনে কাঠবিড়ালিও কাজে লাগিয়াছিল।…

দেখ কূপ, অনেক সুন্দর মুখের প্রতিবিম্ব তোমার হৃদয়ে পড়ে। আমি একখানি সুন্দর মুখের জন্য কত দিন নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করি, তেমন মুখ কি কখন দেখিয়াছি? সে মুখ কি আমায় দেখাইতে পার? যে দিন চন্দ্রদেব, নীল গগন আলো করিয়া, সাতাইশটি সেবাদাসীর সঙ্গে রসের তরঙ্গ তুলিয়া আমোদ করেন এবং কুমুদিনী, নায়কের নিষ্ঠুরতা এবং অপ্রেমিকতা দেখিয়া অভিমানভরে অঙ্গ দোলাইয়া উঠে; যখন প্রভঞ্জন কানে২ কি বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করে, কিন্তু প্রেমের অভিমান! কুমুদিনী 'এ প্রাণ আর রাখিব না—চক্ষের উপর এই পোড়ানি' বলিয়া যেন মরিবার জন্যই বার২ ঢলিয়া২ জলে পড়ে; যখন নির্লজ্জ লম্পটস্বভাব শশাঙ্ক, প্রণয়িনীর অভিমান দেখিয়া মান ভাঙ্গিবার জন্য পৃথিবীময় সোহাগ ঢালিয়া দিয়া প্রেম ভিক্ষা করেন এবং কুমুদিনী মাথা দোলাইয়া 'নহি নহি নহীত্যেব কুরুতে' আর বায়ু প্রিয়তমা সহচরীর ন্যায় দুঃখে গলিয়া যায়—

'যাঁহা সারি রহ্‌নে গুমাই তাঁহা যাও২ নেহি বোলুঁরে'

তখন এই শোভার মধ্যে বসিয়া, এই শোভা দেখিতে২ একখানি সুন্দর মুখ চিন্তাপ্রবাহমধ্যে ভাসিয়া যায়। ভাসিয়া যায়, তার পর অনুসন্ধান করিয়া আর পাই না, সে মুখখানি কোথায় পাওয়া যায়, বলিতে

পার? যখন সন্ধ্যা-সমীরণ প্রেম উদাসিনীর ন্যায় শূন্য হৃদয়ে বনে উপবনে, নদীতীরে বৃক্ষমধ্যে ঘুরিয়া২ বেড়ায়, তখন ভূতপূর্ব্ব আন্দোলন করিতে২ যে অপ্সরানিন্দিত মুখ বিদ্যুৎবৎ হৃদয়ে চমকিত হয়; বিদ্যুৎবৎ যেমন জ্বলে তেমনি নিভায়—যেমন ভাসে তেমনি ডুবে; বিদ্যুৎবৎ হৃদয়াকাশের অন্ধকার আরও ঘনীভূত করিয়া যায়; বিদ্যুৎবৎ বজ্রাঘাত লইয়া আসে, কেহ বলিতে পার সে মুখ কোথায় পাওয়া যায়? কেহ বলিতে পার কোথায় হারাধন মিলে? আমি তাহার জন্য পৃথিবী খুঁজিয়া দেখি, কিন্তু সে মুখ দেখিতে পাই না। কত সুন্দর মুখ দেখিয়াছি, কত ঘর-আলো-করা রূপ দেখিয়াছি, কত সোনার সীতা দেখিয়াছি, কত এক মাণিক সাত রাজার ধন দেখিয়াছি, কত রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী দেখিয়াছি, কিন্তু তেমন পবিত্র সৌন্দর্য্য এ পাপ-সংসারে, এ জন্মে এ পোড়া চক্ষে আর পড়িল না। সে সরলতা, সে কোমলতা, সে পবিত্রতা, সে অনির্ব্বচনীয় শোভা কাহারও মুখে দেখিতে পাইলাম না। কে তাহার সন্ধান বলিয়া দিবে? কোন্ স্থানে গেলে, কার উপাসনা করিলে, কি তপস্যাবলে তাহা পাওয়া যায়, আমি তাহারই উপাসনা করিব, সেই তপস্যাই করিব। গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থো বর্ষাসু স্থণ্ডিলেশয় ইত্যাদি নিয়ম পালনে আমি পরাঙ্মুখ নহি। ইহার অপেক্ষাও যদি কোন কঠোর নিয়ম থাকে, তবে তাহাতেও স্বীকৃত আছি। হৃদয়ের পরতে২ যে কালাগ্নি জ্বলিতেছে, তাহার তুলনায় পঞ্চাগ্নি কোন্ ছার? পঞ্চাগ্নি কোন্ ছার—আমি ব্রাহ্মদিগের বক্তৃতা শুনিতে২, স্ত্রীলোকের মুখে ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে২, উত্তমর্ণের তাগাদা শুনিতে২ সেই তপশ্চারণ করিব। করিব, কিন্তু হায়, এ সংসারে যাহা যায়, তাহা কি আর ফিরিয়া আসে?" (শ্রাবণ ১২৮১)

পদবৃদ্ধি ঃ···ভাষা। ভাষার উদ্দেশ্য আমাদের অভাব প্রকাশ করা—মনের কথা অপরকে বলা। সে উদ্দেশ্য কেবল বালকেই সংসাধিত করিয়া থাকে, প্রাপ্তবয়স্কের ভাষা, মনের ভাব প্রকাশ জন্য নহে—প্রত্যুত মনের কথা এবং আপন অভাব গোপন করিবার জন্য।

গ্রীষ্মকালে কাপড় গায়ে রাখিতে কষ্ট বোধ হয়, অথচ সভ্যতার অনুরোধে পিরান ব্যবহার না করিলে চলে না—পদ্মাপেরে বাঙ্গাল্দের আবার বার মাস ডবল্ ষ্টকিং চাই। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, মনে করি, ফাউল করি দিয়া শ্যাম্পেইন্ খাইয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের মুখোজ্জ্বল করিব, কিন্তু পারি না—পাপ সমাজের ভয় ধরিয়া রাখে। যাহাকে তুই চক্ষে দেখিতে পারি না, ভদ্রতার হাতে পড়িয়া তাহাকে দেখিয়া "পরমাহ্লাদিত" হইতে হয়। যাহাকে ভালবাসি, ইচ্ছা হয় দিবারাত্র অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহার কাছে বসিয়া সেই অতুল মুখখানি দেখি, সেই মন্মথের কুসুমশয্যার ন্যায় চক্ষু দুটির পানে তাকাইয়া থাকি—দিবারাত্র আপনার মনের কথা বলি, তাহার মনের কথা শুনি—এক কথা এক শ বার শুনি, কিন্তু মনের অভিলাষ মনেই থাকে, কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না।

দিন যায়। সূর্য্য উঠিল, ডুবিল, আবার উঠিল, আবার ডুবিল। বার, তিথি, মাস, ঋতু আসিল, যাইল, আবার আসিল, আবার যাইল। দিন যায়। দিনে২ আর কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি হইল। নারিকেলে জলসঞ্চারের ন্যায়, মনুষ্য-হৃদয়ে প্রাণসঞ্চারের ন্যায়, অজ্ঞাতসারে বড় হইলাম। দেখিতে২ মানব-জীবনের সাত আট বৎসর কাটিয়া গেল। বিদ্যারম্ভ হইল—আমরা পাড়াগেঁয়ে

লোক, কিছু অধিক বয়সে বিদ্যারম্ভ হইল। পাঠশালায় প্রবেশ করিলাম—পদবৃদ্ধি হইল—আর দুখানি পা বাড়িল—চতুষ্পদ হইলাম।···

নবীন যৌবনারম্ভে পশু হইলাম। পশুর ভবিষ্যৎদৃষ্টি নাই; পশুর ভূতপূর্ব্ব মনে থাকে না—কালি কি হইয়া গিয়াছে, তাহা ভাবে না, কালি কি হইবে তাহা ভাবে না, যখন চিত্তবৃত্তি যে দিকে লইয়া যায়, সেই দিকেই যায়। যৌবনারম্ভেও আমাদেরও ঐ দশা। প্রতি দিনকে মনুষ্য-জীবনের শেষ মনে করিয়া এই মজার সংসারে নানা রঙ্গে মাতিলাম—ভাবিলাম না যে, মিষ্টতায় তীব্রতা আছে, কুসুম ম্লান হয়, স্পৃহায় তৃপ্তি আছে, সময় ধ্বংসকারী, উল্লাস সুখ নহে, অভ্যস্ত কার্য্যে আমোদ কমে, আসক্তি বাড়ে—মনে করিলাম না যে, আবার ভবিষ্যৎ আছে; যাহা করিয়াছি, তাহার ফল ভোগ করিতেছি, আজি যাহা করিলাম, তাহার ফল ভবিষ্যতের জন্য তোলা রহিল—ভাবিয়া দেখিলাম না যে, সকল কারণই কার্য্য, সকল কার্য্যই কারণ—বৃক্ষ হইতে একটি শুষ্ক পত্র খসিয়া পড়িলে, তাহার ফল অনন্ত কাল জগতে বিচরণ করিবে। কিছুই ভাবিলাম না—ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেচনা-শূন্য হইলাম—কুপথ-সুপথ জ্ঞান হারাইলাম—যে দিকে আমোদ পাইলাম, সেই দিকেই ধাইলাম। পশুর ন্যায় কেবল বর্ত্তমানের উপর সকল ভর দিলাম।···

সময়ের স্রোত বহিতে লাগিল। অভিভাবকেরা দেখিলেন যে, ছেলেটি ত চতুষ্পদ হইল, এখন উপায়? তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে যাহাতে দুইখানি পা কমিয়া যায়, তাহার চেষ্টা দেখা উচিত। ·

অনেক বাদানুবাদ, অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল, বিবাহ দাও। সকলেই একবাক্য হইয়া বলিলেন যে, প্রায়ই দেখা যায়, লোকে বিবাহ করিলেই পদদ্বয় হারাইয়া বসেন, গতিশক্তিহীন হইয়া পড়েন—আর ঘরের বাহির হইতে পারেন না; বড় জোর চলিতে পারেন ত পাকশালা হইতে শয়ন-মন্দিরে এবং শয়ন-মন্দির হইতে পাকশালায়। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিবাহ হইল। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা, কে খণ্ডাতে পারে তাহা? অদৃষ্টে যাহা আছে, অবশ্য হইবে, মনুষ্যের কি সাধ্য তাহার অন্যথা করে? বিবাহে বিপরীত হইল। করিতে ইচ্ছা এক, হইয়া উঠিল আর। বিবাহে পা কমা দূরে থাক্, আর দুটি পা বাড়িল। পা কমাইয়া দ্বিপদ হইবার জন্য বিবাহ, কিন্তু কপালের কর্ম্মভোগ;—পা বাড়িয়া ষট্‌পদ হইয়া উঠিলাম।

সংসার-মরুভূমে গৃহ নামে একটি সরোবর আছে। সেই সরোবরে কমল ফুটিল। আমি ভ্রমর হইয়া সেই ফুলে মধু লুটিতে লাগিলাম। গুন্২ সার হইল। যখন অভিমানিনী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া বঙ্কিম বদন ঘুরাইয়া বসেন, তখন সেই মুখের—মেঘাড়ম্বর দিনের স্থলকমলিনীর ন্যায় সেই মুখের চারি পাশে গুন্২ করি। মান গুরুতর হইলে পাদপদ্মযুগলে পড়িয়াও গুন্২ করিতে হয়। আবার যখন তিনি রাগভরে অষ্টাদশে কণ্ঠ তুলেন, তখন যে ঠোঁট চাটিতে২ মাথা চুলকাইতে২ শব্দ করি, সেও অস্পষ্ট অপরিস্ফুট গুন্২ ধ্বনি। গৃহিণীর মুখের জ্বালায়, হিতোপদেশের জ্বালায় এবং সংসার-জ্বালায় দিবা নিশি গুন্২ করিয়া মরি। গুন্‌গুনের হাত আর এড়াইতে পারি না। লিখিতে বসিলে প্রেমাগুন, বাড়বাগুন, দাবাগুন, মনাগুন আসিয়া পড়ে; বিদেশে বিচ্ছেদাগুন, সঙ্গীতে

'মদন আগুন জল্‌ছে দ্বিগুণ'—কোন ক্রমে এই সোপসর্গ গুন্‌২ ছাড়াইতে পারি না। প্রতিবেশীরা বলেন 'ছোঁড়ার গুণের পালান নাই', প্রতিবেশিনীগণ বলে 'ছুঁড়ি কি গুণ করেছে লো'—আমি গুণগুণে খুন হইলাম।...

নূতন২ দু দিন আমোদ প্রমোদ, রঙ্গরসে গেল। তার পর মধুমক্ষিকা হইয়া মধু সঞ্চয় করিতে হইল। মধুমক্ষিকা নিরন্তর মধুর জন্য ঘুরিতেছে। আমরাও তাহাই করিতেছি। কোথায় একটু মধু পাইব, কোথায় গেলে অর্থলাভ হইবে, এই ভাবিয়া সারা হইলাম। অমুক ফুলে মধু আছে, অমুক স্থানে কর্ম্মখালি আছে, অতএব দৌড় সেইখানে। কেন—কিসের জন্য এত দৌড়াদৌড়ি? এই সংসার-উদ্যানে স্বদেশ নামে যে একটি বৃক্ষ আছে, সেই বৃক্ষের গৃহ নামক শাখায় একটি মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়াছি, তাহাতে মধু বোঝাই করিতে হইবে; অবশ্য হইবে, না করিলেই নয়। তাহারই জন্যে এত বিভ্রাট।...

কালের স্রোত বহিয়া গেল। আর দুটি পা বাড়িল—উর্ণনাভ হইলাম। এখন একবার এই শরীর দেখ দেখি, মাকড়সার গা বলিয়া কি বোধ হয় না? এক দিন এই শরীর দেবকান্ত ছিল, এমন হইল কেন? ছেলেপিলে হইয়াছে; পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, জামাতায় গৃহ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের জন্য আপনার পেটে অন্ন হয় না। আর ঐ ডাক্তার বাবু, তাঁহার কাছে পূর্ব্বজন্মে যেন কতই ধার করিয়া খাইয়াছি। এই ঘোর শীত, একখানি কম্বল গায়ে দিয়া কাটাই—ছেলেদের কাশ্মীরি শাল নহিলে চলে না। আপনি গ্রীষ্মের রৌদ্রে সুধুমাথায় বেড়াই, পান্নার কণ্ঠীর জন্য গৃহিণী কানের পোকা বাছিলেন। ছেলেদের পমেটমের খরচে আর

মেয়েদের মিসির খরচে আমাকে হাবাত করিল। বুড়ো বয়সে এ আবার কি বালাই? ষষ্ঠী ঠাকুরুণ, করযোড়ে মিনতি করিতেছি, আপনার কৃপারশ্মি সংবরণ করুন। যথেষ্ট হইয়াছে, আর কেন? প্রতি বৎসর নূতন ছেলে কোলে করিয়া নবান্ন করিতে আর পারি না। এ পড়তা আর কিছু দিন থাকিলে, আটতুরুপ করিয়া হাতের পাঁচ পর্য্যন্ত হারাইব।...

এখন স্বরচিত জালে বদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছি। আর দ্বিপদের ন্যায় হাসিয়া২ নাচিয়া২ আপন কল্পনা-তরঙ্গে আপনি ভাসিয়া বেড়াইতে পারি না; আর চতুষ্পদের ন্যায় ইন্দ্রিয়স্রোতে গা ঢালিতে পারি না—সে সকল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; আর ভ্রমরের ন্যায় মধু লুঠিতে পারি না—বনে, উপবনে, কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে, পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে, উড়িয়া বেড়াইতে পারি না—ডানা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এখন ভাবিবার দিন বটে। এখন ভূতপূর্ব্ব সমালোচন করিবার কৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিবার সময় বটে।

আপন জীবন সমালোচনা করিয়া দেখিলাম, অনর্থক দিন গিয়াছে। এ সংসারে যাহা২ লইয়া আসিয়াছিলাম, যাহা২ উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, সব হারাইয়া বসিয়াছি—কালোস্রোতে সব ভাসিয়া গিয়াছে। সরলতা, কোমলতা, পবিত্রতা, সহজপ্রফুল্লতা, বিশ্বব্যাপিনী আশা, রঙ্গময়ী কল্পনা—যাহা কিছু প্রকৃতির কাছে পাইয়াছিলাম, সে সকল সংসার-দাহনে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন আর সকলকে বিশ্বাস করিতে পারি না; কারণ, আপন হৃদয়ে পাপ প্রবেশ করিয়াছে। দেখিলাম, সরল হইলে প্রতারিত হইতে হয়, কোমল হৃদয়ের ব্যথা অধিক, পবিত্রতা, মূর্খত্ব অথবা ভণ্ডামি,

প্রফুল্লতা হাল্‌কার লক্ষণ, আশা কুহকিনী—কেবল নাচাইয়া লইয়া বেড়ায়। বন্ধুত্ব, প্রেম, জ্ঞান, যশ, পদ, লোকের শ্রদ্ধা—দেখিলাম, সব ভোজের বাজি। কিছুতে সুখ নাই, কিছুতে শান্তি নাই;—সব অস্থির, সব নশ্বর, সব দুঃখের আকর, সব অতৃপ্তিপ্রদ। মনে কত সাধই ছিল—তাহার একটিও মিটাইতে পারিলাম না। এখন সে সকলে জলাঞ্জলি দিয়াছি—শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলাম, জগন্নাথদেবকে দিয়া আসিয়াছি। কেবল একটি সাধ আছে—সজ্যোৎস্না রজনীতে হিমাদ্রিশিখরমালার উচ্চতম শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া, নীলোজ্জ্বল গগনবিহারী চন্দ্রদেবকে সাক্ষী করিয়া, মনের সুখে, প্রাণ ভরিয়া, মুক্তকণ্ঠে এক বার কাঁদিব। আমার সাধ যায়, এক বার 'তরঙ্গিণী২' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া, শব্দতরঙ্গে ঐ কোমল নীলাকাশ ভাসাইব, শব্দহিল্লোলে ঐ নক্ষত্রগণকে দোলাইব—প্রতি গিরিগুহায়, প্রতি নির্ঝরিণীর তীরে প্রতিধ্বনিকে জাগাইব;—জাগাইয়া জাহ্নবীর জলে ঝাঁপ দিব। প্রতিধ্বনি, ঐ নাম গাইয়া২ পর্ব্বতে বেড়াইবে—আকাশে নাচিয়া২ ঐ নাম গাইবে, আর আমি সেই জ্যোৎস্নাময়ী নিশিতে, ঐ নক্ষত্রমালামণ্ডিত আকাশের দিকে—অলঙ্কারখচিতা, সৌন্দর্য্যোদ্ভাসিতা সাধ্বীর ন্যায় ঐ আকাশের দিকে—আমার নয়নপুত্তলি তরঙ্গিণীর ন্যায় ঐ আকাশের দিকে মুখ করিয়া, সেই গীত শুনিতে২ চন্দ্রকরপ্রোজ্জ্বল জাহ্নবীতরঙ্গান্দোলিত হইয়া ভাসিয়া যাইব। বিধাতঃ, এই ভিক্ষাটি আমায় দিবে? তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, তুমি ইচ্ছাময়, মনে করিলে সব করিতে পার—আমার এই সাধটি পূরাইবে? এটি না পূরাও, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—বলিবে? এ মাটির দেহ কবে মাটিতে মিশাইবে? কবে সে বাতাস বহিবে, যাহাতে এ ছাইয়ের

স্তূপ উড়াইয়া দশ দিকে বিকীর্ণ করিবে? আমায় বলিয়া দাও—আমি সেই বাতাসের প্রতীক্ষা করিয়া আছি, আমায় বলিয়া দাও, কবে সে বাতাস বহিবে? আমি আপনি উড়িতাম, কিন্তু প্রভো, জাল ছিঁড়িতে পারি না। আমি কীটাণুকীট—আমার শক্তি কতটুকু? তুমি সর্ব্বশক্তিমান্—জাল ছিঁড়িয়া দাও—আমায় মুক্ত করিয়া দাও—বলিয়া দাও, সে বাতাস কবে বহিবে? এ বহুজনাকীর্ণ বিপুল সংসারে আমার কেহ নাই—আমি একা—অধমকে চরণে স্থান দাও।" (পৌষ ১২৮১)

চন্দ্রশেখরের 'কুন্তলতার মনের কথা' পুস্তকখানিও অধুনা দুষ্প্রাপ্য; যৌবনে রচিত এই রহস্য-প্রবন্ধগুলির কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

মেয়ের সুখ : সম্পাদক মহাশয়,…পুরুষদিগকে নির্ব্বোধ কেন বলি শুনিবেন? তাঁহারা মনে করেন, আমরা বড় সুখে আছি। আমাদিগকে বুঝাইতে চাহেন যে, তাঁহারা আমাদিগকে রামরাজ্যে রাখিয়াছেন—পূর্ব্বজন্মের তপস্যার ফলে তাঁহাদের পদ্মহস্তে পড়িয়া আমরা সশরীরে স্বর্গভোগ করিতেছি। আর যত জ্বালা তাঁহাদেরই—যত জ্বালা আমাদেরই জন্য। তাঁহারা রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার করিয়া আনেন, আমরা পায়ের উপর পা দিয়া কেবল বসিয়া খাই, আর সোনার চন্দ্রহার এবং বারাণসী শাড়ীর স্বপ্ন দেখি। তাঁহারা দারুণ সংসার-জ্বালায় ক্ষিপ্ত কুকুরের মতন দিন রাত ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করেন, আমরা ঘরে বসিয়া তাঁহাদের বুকের রক্ত শোষণ করি, আর পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গা ক'রে, তার উপর মুচ্‌কে হেসে, সম্মুখস্থ দর্পণের ভিতর জ্যোৎস্নার উপর বিজলিখেলা দেখিয়া দিন কাটাই। আমাদিগকে ঘরের বাহির হইতে হয় না, চন্দ্র সূর্য্যের মুখ দেখিতে

হয় না, গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা ভাবিতে হয় না—কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই—আমাদের সুখের সীমা কি ?

বটেই ত! আমাদের সুখের সীমা কি? অনুগ্রহ করিয়া পেটে এক মুষ্টি খাইতে দেন, পরনে একখানা পরিতে দেন, নিশান্তে চরণ দুখানি এক বার দেখিতে দেন—আর সুখের চাই কি? আমাদিগকে সোহাগ করিয়া বুকে করেন, পায়ে ধরিয়া মান ভাঙ্গেন, "প্রাণাধিক" "জীবনসর্বস্ব" বলিয়া চিঠি লেখেন—আর সুখের বাকী কি? রাগ হইলে পদাঘাত করেন, বিনাপরাধে মুখ বাঁকান্, কথায় কথায় পরিত্যাগ করিতে চাহেন—আমাদের সুখের অভাব কি?

তা এতই যদি সুখ, তবে আসুন, না-হয় একবার অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া দেখা যাউক—এক বার দেখিয়া লউন, কিসে কত সুখ দুঃখ। আপনারা রূপার বেড়ি পায়ে দিয়া ঝুম্ ঝুম্ করিয়া অন্দরে প্রবেশ করুন, আমরা আপনাদের বোঝা মাথায় করিয়া সংসারের পথে বাহির হই। আপনারা এক বার কমল হইয়া গৃহ-সরোবরে ফুটুন, আমরা ভ্রমর হইয়া চরণতলে গুণগুণ করিতেছি—দয়া করিয়া একটু মধু দিবেন, কিন্তু দেখিবেন যেন অভ্যাসদোষে গুব্‌রে পোকার আমদানি না হয়। আপনারা চাঁদ হইয়া ষোল কলায় গৃহাকাশে উদয় হউন, আমরা চকোর হইয়া উড়িতেছি—আর যেমনই হউক, কিন্তু উপমাটার সার্থকতা কলঙ্কের অভাবে নষ্ট হইবে না। আপনারা পরচুলার খোঁপা বাঁধিয়া, ঘোমটায় দাড়ি ঢাকিয়া, মুখ ফিরাইয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া মান করিয়া বসুন, আমরা বুট্ ধরিয়া মান ভাঙ্গিতেছি—কেবল এক ভিক্ষা, আমাদের মানের সঙ্গে যেন আমাদের নাথিটা শুদ্ধ শিখিবেন না; মনে রাখিবেন যে, আল্‌তা-

পরা পায়ে আর বুট্-পরা পায়ে অনেক প্রভেদ। কেমন, রাজি আছেন ত?

তবে আসুন, আপনারা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, পিরীতের আড়ায় বসিয়া সোহাগের ছোলা খাইতে আরম্ভ করুন, আমরা আপনাদিগকে "রাধাকৃষ্ণ" পড়াইবার উদ্যোগ দেখি। আপনারা সলিতা পাকাইতে হাত বশ করুন, আমরা চুরট-মুখে প্রদোষভ্রমণে বাহির হইতেছি। আপনারা ঘরকন্নার ভার লউন, আমরা সংসারের ভার লইতেছি—আপনারা রন্ধনশালায় প্রবেশ করুন, আমরা কাছারি যাইতেছি। আপনারা রাঁধিবেন, বাড়িবেন, পাখা হাতে করিয়া কাছে বসিয়া আমাদিগকে খাওয়াইবেন, আচমনের পর পান তামাক দিয়া আমাদের পাতে প্রসাদ পাইবেন, আমরা খোঁপার উপর শামলা পরিয়া, চোখের কাজল চশ্‌মায় ঢাকিয়া, বড় বড় আইনের পুথি হাতে করিয়া কাছারি যাইব। আপনারা ঘরে বসিয়া লক্ষ্মীর আল্‌পনা দিবেন, চুলের দড়ি বিনাইবেন, ছেলেকে দুধ খাওয়াইবেন, চাকরাণীর সঙ্গে গণ্ডগোল করিবেন, আমরা এজলাসে দাঁড়াইয়া, নন্দনকাননে জ্যোৎস্নার মতন রাঙ্গা ঠোঁটের উপর মৃদু হাসির লহর তুলিয়া, নথের ফাঁক দিয়া সাক্ষীর জেরা করিব—সাক্ষী মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবে না ত? জজ সাহেব দম্ আটকাইয়া মরিবেন না ত? বেলা পড়িলে আপনারা, শ্যামের কোলে রাইয়ের মতন, মেঘের কোলে বিদ্যুতের মতন, অমাবস্যায় আকাশপ্রদীপের মতন, বার্নিস-করা জুতায় রূপার বক্‌লসের মতন, গোঁফের ভিতর দিয়া মুচকে হেসে, রাজ্যের লোকের নিন্দা এবং নিজের অদ্ভুত গুণরাশির সমালোচনা করিতে করিতে কলসী কক্ষে জল আনিতে যাইবেন; আমরা ইয়ার সাথে, ছড়ি হাতে,

ঘাটের পথে আপনাদিগকে শুনাইয়া নিধুর টপ্‌পা গাইব—সে গান শুনিয়া আপনারা কক্ষের কলসী মাথায় ভাঙ্গিয়া প্রাণ হারাইয়া ঘরে যাইবেন না ত? আপনারা কলসী ভরিয়া জল লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবেন, আমরা সঙ্গে গিয়া বাড়ী দেখিয়া আসিব—আপনারা শাশুড়ী ননদকে বলিয়া দিয়া গালি খাওয়াইবেন না ত? আপনারা ভাত কোলে করিয়া আমাদের আশাপথ চাহিয়া বসিয়া থাকিবেন, আমরা শেষ রাত্রে বমি করিবার জন্য ঘরে আসিব—আপনারা সুড়সুড়ি দিয়া ঘুম পাড়াইবেন ত?

আপনাদের সুখের সীমা থাকিবে না। আপনাদের সেই অতুল সুখ পাপচক্ষে একবার দেখিব, এই আমার বড় সাধ। আমরা যখন বিবাহ করিতে যাইব, আর আপনারা চোখে কাজল দিয়া, ঠোঁটে মিসি দিয়া, শুষ্ক নিতম্বে চন্দ্রহার ঝুলাইয়া, ফাটা পায়ে আলতা পরিয়া, দল বাঁধিয়া আসিয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া বাসর জাগিতে বসিবেন, আর কোটরচক্ষু ঘুরাইয়া রসের চাহনি চাহিবেন, শিশুপালের ন্যায় দন্ত বাহির করিয়া রসের হাসি হাসিবেন; আমরা নয়ন ভরিয়া দেখিব, শত্রুর মুখে ছাই দিয়া কেমন দেখায়—এক বার দেখিব, সে কটাক্ষের আগুনে বিশ্বসংসার পোড়ে কি না, সে হাসির তুফানে গরিবদের প্রাণতরী ডুবে কি না। তার পর আমরা যখন সেই বাসরবিলাসে "ফচ্‌কে ছোঁড়া ঘাটে পড়া"* বলিয়া গান ধরিব, তখন আপনারা ভাবে ভোর হইয়া সুখাতিশয্যে সেই বাসরের কোণে গোটে গোটে মরিয়া পড়িয়া

* "ফচ কে ছুঁড়ি ফুলের কুঁড়ি"—এই গানটার পাল্টা না কি?

Printer's Devil.

থাকিবেন—সুখের সীমা থাকিবে না। স্বামিগৃহে আসিয়া যখন উদরান্নের পরিবর্ত্তে শাশুড়ীর হাতনাড়া, ননদের দাঁতঝাড়া খাইবেন—চাকরাণীরা পর্য্যন্ত শ্লেষ করিবে, পাড়ার পাড়া-কোঁদলিরা খোঁটা দিবে—তখন সুখের আর অবধি থাকিবে না। শেষে যখন আমাদের কাছে চোখ দুটি ছল ছল করিয়া, মুখখানি কাঁদ কাঁদ করিয়া দুঃখের কান্না কাঁদিতে আসিবেন, আর আমরা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া সহানুভূতি জানাইব, তখন ভরসা করি স্বর্গসুখ অনুভব করিবেন। কেমন, রাজি ত ?

আমরা আপনাদের সকল মহৎ কার্য্যেরই ভার লইব ; তবে একেবারে ঠিক বাবু হইয়া উঠিতে পারিব কি না, সেই এক কথা। আমরা লেখা পড়া শিখিয়া যণ্ডামর্ক হইতে, গলাবাজি করিয়া স্বদেশের উদ্ধার করিতে, ইংরেজী পড়িয়া গুরুজনের অবহেলা করিতে, ব্রাহ্ম হইয়া ছত্রিশ জাতকে তরাইতে পারিব কি না, সেই এক ভাবনা। কবিরাজ হইয়া লালবড়ির পরিবর্ত্তে আকা'র পোড়া মাটি চালাইতে, ডাক্তার হইয়া ল্যাটিন নামের দৌলতে সোনার দামে জল বিক্রয় করিতে, ইস্কুল মাষ্টার হইয়া পড়াই না পড়াই, দুচোখো ছেলে ঠেঙ্গাইতে, হাকিম হইয়া গরীবের সর্ব্বনাশ করিতে, মোক্তার হইয়া দিনে ডাকাইতি করিতে, জুনিয়র উকীল হইয়া মোক্তার মহাশয়ের ছেলে ছোঁচাইতে পারিব কি না, সেই এক সন্দেহ। আমরা যাত্রা শুনিতে গিয়া জুতা চুরি করিতে, ঘাটে গিয়া বৌঝিকে ঠাট্টা করিতে, বেশ্যার গালি খাইয়া কৃতার্থ হইতে, সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়া ভদ্রলোককে গালি দিবার জন্য জাল "প্রেরিত" তৈয়ার করিতে পারিব কি না, সেই বড় ভাবনা।

তা, পারি-না-পারি, আসুন এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। শেষ রাখিতে না পারি, হার মানিয়া ইস্তফা দিব। মুখ হাসে আমাদেরই হাসিবে।

দুঃখের কথা ঃ সম্পাদক মহাশয়!...আপনারা বলেন, আমরা বড় বেহায়া হইয়া উঠিয়াছি। পূর্ব্বে চন্দ্র সূর্য্যে কখন মুখ দেখিতে পায় নাই; এখন পথের পথিকও নয়ন সার্থক করিতে পায়। পূর্ব্বে কণ্ঠস্বর সখি-কর্ণের বাহিরে যাইতে জানিত না; এখন সেই কণ্ঠে দিনরাত রণবাদ্য বাজে। যে হাসি অধর-প্রান্ত পার হইলে নয়নপ্রান্তে গিয়া লুকাইত, এখন তাহা রাজপথের বায়ুতে বাহিত হয়। সকলই না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। লজ্জা সরম রাখিবার পথ কি আর আপনারা রাখিয়াছেন? পূর্ব্বে শাশুড়ী ননদে গৃহিণীপনা করিতেন: আমরা পাতা-ঢাকা ফুলটি হইয়া গৃহকোণে বসিয়া থাকিতাম। এখন আপনারা তাঁহাদিগকে অপোষ্য জানিয়া গৃহ-বহিষ্কৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কাজেই আমাদিগকে হাতের সূতা না খুলিতে খুলিতে গৃহিণী হইতে হয়—লজ্জা সরম রাখি কেমন করিয়া, বলুন দেখি। ইহার পর, যদি গান গাইয়া আপনাদিগকে ভুলাইয়া ঘরে রাখিতে হয়, আপনাদের বন্ধুবান্ধব পদার্পণ করিলে পিয়ানো বাজাইয়া তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়, এবং আপনাদের সঙ্গে ইডেন উদ্যানে বেড়াইতে যাইতে হয়, তবে—বলুন দেখি, লজ্জা সরম থাকে কেমন করিয়া। পরকে দোষ দিবার আগে এক বার ঘর ভাবা উচিত। যদি সত্যই আমরা অপরাধী হই, তবু ইহা অবশ্যই জিজ্ঞাস্য—অপরাধী আমাদিগকে করিয়াছে কে? তোমাদের লজ্জা নাই, তাই দোষটা আমাদের ঘাড়ে

চাপাও—অসুখের বোঝা পরকে বহিতে দাও। অধিক বলা ভাল দেখায় না, কিন্তু তোমাদের লজ্জার জ্ঞান দেখিয়া আমি লজ্জায় মরি।

সংসার-ধর্ম্মে আমাদের আর অনুরাগ নাই, এই কথা? আপনারা কি আর সংসারে ধর্ম্ম রাখিয়াছেন যে, তাহাতে আমরা অনুরাগ রাখিব। এক দণ্ড আমাদের অঞ্চল-ছাড়া হইলে আপনারা পৃথিবী অন্ধকার দেখিবেন—গাভী-হারা বৎসের ন্যায়, জল-ছাড়া মাছের ন্যায়, ডাল-হারা প্রেতের ন্যায়—আকুল, ব্যাকুল, পর্য্যাকুল হইবেন—আমরা সংসারধর্ম্ম করি কেমন করিয়া? যদি আপনাদের সেবাতেই দিন যায়, তবে ছেলে মেয়েকে দেখি কখন্? মেলে মেয়েকে দেখিতে হইলেও শরীর ময়লা হয়—তাহা আপনারা দেখিতে পারেন না—সংসারধর্ম্ম কোথা হইতে হইবে? আপনারা যদি মানুষ হইতেন, তাহা হইলে আমাদের অদৃষ্টে এ বিড়ম্বনা ঘটিত না। পরের দায়ে আমরা মারা পড়িতাম না।

আমরা হিন্দুভাব হারাইয়াছি? তা আপনাদের জন্য নিত্য মুরগীর ঝোল রাঁধিয়া হিন্দুভাব থাকে কেমন করিয়া, বলুন দেখি? আমরা ত তোমাদের দেখিয়াই শিখি। তোমাদের যখন বৈঠকখানায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইত, তখন অন্তঃপুরে শিবপূজাও ছিল। এখন যদি বৈঠকখানায় শ্রীমদ্ভাগবতের পরিবর্ত্তে হুইস্কি প্রবেশ করিল, তবে অন্তঃপুরেই বা নাটক প্রবেশ না করিবে কেন? তোমরা যখন দেবতা ছিলে, তখন আমরাও দেবী ছিলাম। এখন তোমরা প্রেত হইয়া উঠিয়াছ বলিয়াই ত আমাদিগকে প্রেতিনী হইতে হইয়াছে। দোষটা কি কেবল আমাদেরই? সঙ্গদোষে অনেক পাপ বর্ত্তে। আমরা যে সঙ্গদোষে মারা গেলাম, এ কথা বলিই বা কাহাকে, শোনেই বা কে?

আমরা বিলাসিনী হইয়াছি? তা ত বটেই; কিন্তু না হইলে কি রক্ষা ছিল—না হইয়াই বা করি কি—যাই কোথা? দাঁড়াই কোথা? তোমরা যদি বাবু হইয়া উঠিলে, তবে আমাদের বিবি হইয়া না উঠিলে ত আর চলে না। তোমরা মনুষ্যত্ব ছাড়িয়া ভ্রমর হইয়া গুন্‌গুন্‌ ধরিয়াছ, তাই আমাদিগকে দেবীত্ব ছাড়িয়া কমল হইয়া ফুটিতে হইয়াছে। তোমরা যদি ফটিকচাঁদ হইলে, তবে আমাদের কমলিনী না হইলে ত চলে না। 'তোমরা প্রকৃত সৌন্দর্য্য হারাইয়া বাহ্য চাকৃচিক্যের দাস হইয়াছ, কাজেই আমাদিগকে পরী সাজিতে হয়। ইংরেজের স্কুল কলেজে বজ্রাঘাত হউক, কি ছাই শিক্ষাই যে তোমরা পাইয়াছ, প্রেম-সরোবরে চব্বিশ ঘণ্টা ডুবিয়া থাকি, ইহাই তোমরা চাও। কেবল প্রাণনাথ প্রাণধন-সম্বলিত দুই একখানা পত্রের জন্য বৎসরে তের মাস প্রবাসবাস কর। আমরাও দুই দশখানা মলিন-বদন সজল-নয়ন জীয়স্তে মরণ পত্র লিখিয়া তোমাদের সম্বর্দ্ধনা করি। পেটের দায়ে তোমাদের অধীন হইতে হইয়াছে, সুতরাং তোমাদের মন রাখিতে হয়, নতুবা চিরকালের সংস্কার কি সহজে ছাড়া যায়! আমরা বিলাসিনী হইয়াছি বটে; কিন্তু দোষ কাহার? অপরাধী কি আমরা?

হাসির কথা: সম্পাদক মহাশয়,...কথাটা কি সত্য? আমরা বশ করিতে জানি না, তোমাদের হায়া থাকিলে, এমন কথা কখন মনেও আনিতে না—মুখে আনা ত দূরের কথা। এই যে আজকাল তোমরা ভ্রাতাকে পর করিয়া দিতেছ, আত্মীয়ের বিষয় অপহরণ করিতেছ, পিতাকে ওল্ডফুল বলিতেছ—এ সকল কাহাদের জন্য? এই যে তোমরা স্বার্থসর্ব্বস্বতাকে সারসর্ব্বস্ব করিয়াছ, অতিথি অভ্যাগতকে দূর করিয়া দিতেছ, দেবতা ব্রাহ্মণকে

বৈতরণী পার করিয়াছ, ইহলোক পরলোকের কাছে ইস্তফা লইতেছ, ধর্ম্মাধর্ম্মের সঙ্গে ফারখৎ করিয়াছ—এ সকল কাহাদের জন্য? আমাদের মুখে হাসি দেখিবার জন্য তোমরা দিন রাত প্রাণপাত করিতেছ—মন রাখিবার জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতেছ, অলঙ্কারের জন্য শালগ্রামের উপবীত কাড়িয়া লইতেছ, প্রাণের দায়ে অঞ্চল ধরিয়া পদপ্রান্তে লুটাইতেছ। কেবল আমাদেরই মুখ চাহিয়া তোমাদের বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, ধর্ম্ম নাই, ইহলোক নাই, পরলোক নাই; এমন কি, আপনাতে আপনি নাই; তবু বলিবে, আমরা আর তোমদিগকে বশ করিয়া রাখিতে পারি না;—ছি! ছি! যদি এমন কথা তোমরা বল যে, কার্য্যতঃ আমরা বশ হইলেও, অন্তরে অন্তরে আমরা বশ নহি, তাহাতে আমরা কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ ত দেখি না। বশ্যতা ত বাহিরেরই জিনিষ; তাহা অন্তরের জিনিষ হইলে ত প্রেমের পদবীতে উন্নীত হয়। তোমাদের মতন অপদার্থের কাছে যে প্রেমের প্রত্যাশা করে, তাহার দুর্ভাগ্যের ত সীমা নাই। প্রকৃত প্রেম যদি তোমরা জানিতে, তবে ত জগতে তোমাদের আশাভরসা সকলই থাকিত। তাহা তোমরা জানও না; যাহা জান না, তাহার প্রহসন তোমাদের নিকট হইতে আমরা চাহিও না। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ এমন থাকে যে, সম্পূর্ণরূপে আমাদের বশীভূত নহে, তাহাদিগকে একটা কথা বলিতে পারি। তাহারা এ পৃথিবীতে বশ কেবল কুশিক্ষার, কু-অভ্যাসের, শুঁড়ীর আর ইংরেজের জুতার। যে এত জিনিষের বশ, সে আমাদের সম্পূর্ণ বশ কেমন করিয়া হইবে? এত জিনিষের যে বশ, তাহাকে বশ করিতে আমরা ইচ্ছাও করি না, তাহারা সুখে থাক।"

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬৬-১৯২৩

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

১৮৬৬ সনের ২০এ ডিসেম্বর (৬ পৌষ, ১৭৮৮ শক), বৃহস্পতিবার ভাগলপুরে পাঁচকড়ির জন্ম হয়; এই তারিখ তাঁহার কোষ্ঠী হইতে গৃহীত। তাঁহার পিতার নাম—বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস—২৪-পরগণার হালিশহরে। বেণীমাধব ভাগলপুরে কলেক্টরী আপিসে ওয়ার্ডস ক্লার্ক ও বাটোয়ারী ক্লার্কের কাজ করিতেন।

বিদ্যাশিক্ষা

পাঁচকড়ি পিতা-মাতার এক মাত্র আদরের সন্তান। তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা পিতার সান্নিধ্যে ভাগলপুরেই সমাধা হয়। আশৈশব বিহারে অবস্থান করায় হিন্দী ভাষায় পাঁচকড়ির বিলক্ষণ অধিকার জন্মিয়াছিল। বিদ্যালয়ে কৃতী ছাত্র হিসাবে তাঁহার সুনাম ছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি কোন্ সালে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন, ক্যালেণ্ডার-অনুযায়ী তাহার পরিচয় দিতেছি :—

ইং ১৮৮২ : প্রবেশিকা, ১ম বিভাগ (১৬ বৎসর বয়স)···ভাগলপুর জিলা স্কুল।

১৮৮৫ : এফ. এ. ২য় বিভাগ পাটনা কলেজ

১৮৮৭ : বি এ (সংস্কৃত অনার্স), ২য় বিভাগ ··পাটনা কলেজ

বি. এ. পাস করিবার অল্প দিন পরেই তিনি কাশী সংস্কৃত-সাহিত্য ও সাংখ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "সাহিত্যাচার্য্য" উপাধি লাভ করেন।

বক্তা ও ধর্ম্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যাতা

তরুণ বয়সে পাঁচকড়ি ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের দ্বারা বিলক্ষণ প্রভাবিত হইয়াছিলেন। যে-বৎসব বি এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, সেই বৎসর হইতে তিনি নিযমিতভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন-সম্পাদিত ধর্ম্মপ্রচারক' পত্রে লিখিতে সুরু করেন। এই প্রসঙ্গে 'জন্মভূমি' (আষাঢ ১৩৫০) লেখেন :—

"শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের সহিত এক সময়ে পাঁচুবাবুর খুব মাখামাখি ভাব ছিল। শৈশবকাল হইতেই পাঁচুবাবু— শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের দলে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের 'ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্মপ্রচারিণী সভা' এবং 'সুনীতিসঞ্চারিণী সভা'র জন্য পাঁচুবাবু এক সময়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পাঁচুবাবু ইহা মুক্তকণ্ঠে বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের উৎসাহেই তাঁহার বাঙ্গলা লেখায় প্রবৃত্তি জন্মে। এবং তাঁহারই উৎসাহে তিনি 'ধর্ম্মপ্রচারক' 'বেদব্যাস' [ভূধর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১৮৮৭ সনে প্রথম প্রচারিত] প্রভৃতি পত্রে, ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করেন। কিছু দিন পরে, নানা কারণে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সহিত তাঁহার মনের অকুশল ঘটে , তাই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে হয়।

ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সহিত পাঁচুবাবু বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট পাঁচুবাবু অনেক শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়াছেন।"

পাঁচকড়ি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন:—বি. এ. পাস করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলাম; পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে লেখক ও বক্তারূপে সহায়তা করিতাম।... ১৮৮৭ খ্রী: অব্দ হইতে ১৮৯১ খ্রী: অব্দ পর্যন্ত, আমি কলিকাতায় আসিতাম যাইতাম, সাহিত্য-চর্চা করিতাম, মাসিক ও সাপ্তাহিকে লিখিতাম, তখন আমাদের একটা বড় দল ছিল, সে দলের আনুকূল্য লাভ করিবার জন্য অনেকে আমার আনুগত্য করিতে বাধ্য হইতেন।" ('মানসী', জ্যৈষ্ঠ ১৩২০)

প্রথম যৌবনে পাঁচকড়ি যে বক্তৃতা-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহাই বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া দেশবাসীর নিকট তাঁহাকে বাগ্মী-রূপে পরিচিত করিয়াছিল। স্বভাবদত্ত সতেজ ও মধুর কণ্ঠে বহু সভা-সমিতিতে তাঁহাকে বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দীতে অনর্গল বক্তৃতা দান করিতে দেখা গিয়াছে।

অধ্যাপনা

কলেজ হইতে বহির্গত হইয়া পাঁচকড়ি ভাগলপুরে টি. এন. জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্রতী হন; ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র তাঁহার নিকট পড়িয়াছিলেন। এ কথা শরৎচন্দ্র নিজেই লিখিয়া ছিয়াছেন।

১৮৯৫ সনের শেষাশেষি পাঁচকড়ি শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক হন। পর-বৎসর ৭ই আগস্ট তারিখে ভাগলপুরে ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে যে অভিনন্দন-পত্র দেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

মান্যবর পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ,
শিক্ষক মহাশয় শ্রীচরণেষু।

শোকোচ্ছ্বাস।

আমরা সকলে, মিলি ছাত্রদলে,
এসেছি চরণতলে।
দিব বা বিদায়, কোন প্রাণে বল,
ভাসে বক্ষঃ নেত্রজলে॥

ওই শ্রীচরণ নয়নের জলে
এসেছি ধোয়াতে সবে ;
কিবা উপহার সমর্পিব আর,
কৃতজ্ঞতা বিনা এবে ?

কৃতজ্ঞ হইতে শিখায়েছ তুমি
যেরূপ যতন ক'রে—
তারি পরিচয় নিকটে তোমার
এসেছি দিবার তরে॥

গিয়াছিলে দেব, নয় মাস তরে
আশা ছিল প্রাণে ইহা,
হেরিব চরণ, কিন্তু আজি হায়
ভাসিয়া ডুবিল তাহা॥

বিষাদের জলে, ডুবিল সকলি
আনন্দ উল্লাস হাসি,
সুখের স্বপন ভাঙ্গিলে অকালে
ঘিরিল যাতনা রাশি॥

সমভাবে সবে দেখিতে নয়নে
পুত্রসম ছাত্রদলে,
বিবিধ প্রকারে উপদেশ কত
শিখাতে কথার ছলে ॥

যে ঋণেতে ঋণী, মোরা তব ঠাঁই
রহিনু জনম তরে,
তাহা শোধিবারে, কিবা ভূমণ্ডলে
আছে, কে বলিতে পারে ?

এইমাত্র মোরা, যাচিতেছি দেব,
সতত ঈশ্বর সনে
শাস্তি সুখ যেন বিরাজিত রহে
নিয়ত তোমার মনে,

যেন মনসুখে, ধর্ম্মে মতি রেখে
করহ কালাতিপাত।
আশীষ তোমার, অবোধ শিষ্যেরে
করি দেব প্রণিপাত ॥

ভাগলপুর।
৭ই আগস্ট, ১৮৯৬। } টী. এন, জুবিলী কলেজিয়েট, ছাত্রবৃন্দ।

সাময়িকপত্র সম্পাদন

পাঁচকড়ির নাম সংবাদপত্র-জগতে সুবিদিত। তিনি বহু পত্র-পত্রিকা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কয়েকখানির কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

'বঙ্গবাসী' ঃ সংবাদপত্র-সেবায় তাঁহার হাতেখড়ি 'বঙ্গবাসী'তে। স্বনামধন্য ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই 'বঙ্গবাসী'র সহিত পাঁচকড়ির সংযোগ ঘটান। এই প্রসঙ্গে পঞ্চানন তর্করত্ন লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

"'বঙ্গবাসী'র এক সময়ে রক্ষাকর্ত্তা, বাঙ্গালা ভাষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যঙ্গসাহিত্যকেশরী স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে পাঁচকড়ি বাবু যেদিন বর্দ্ধমানে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত, সেদিন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকেও আমন্ত্রণ করেন। আমি গিয়া দেখিলাম একজন পঞ্চবিংশবর্ষীয় [?] গৌরবর্ণ যুবা বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। আলাপ আপ্যায়ন হইল, ঘনিষ্ঠতা অল্প সময়ের মধ্যেই পাঁচকড়ি বাবু করিয়া লইলেন এবং আমাকে পৃথক্‌ভাবে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া সংবাদপত্র সেবার পথে যাইব কি না? ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে আনিয়াছেন। আমি তাঁহার পত্র লইয়া যোগেন্দ্র বাবুর নিকট যাইব। কিন্তু আমার ইহাতে কি উন্নতি হইবে?' পাঁচকড়ি বাবু তখন শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহার বাক্‌পটুতা বুদ্ধিমত্তা ও লোকসংগ্রহের সামর্থ্য দেখিয়া ও তাঁহার তাৎকালিক প্রয়োজন বুঝিয়া আমি তাঁহাকে কিছু দিন সংবাদপত্র সেবার পরামর্শ দিয়াছিলাম, কিন্তু আইন পরীক্ষা দিয়া উকীল হইবার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছিলাম। অল্প দিন মধ্যেই 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের সংস্রবে পাঁচকড়ি বাবু যখন আসিলেন, তখন তাঁহার কর্ম্মপটুতা, লিপিকৌশল ও বুদ্ধিমত্তা সকলকেই তাঁহার প্রতি অকৃষ্ট করিয়াছিল।

সে সময় 'বঙ্গবাসী'র সর্ব্বস্ব স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু তাঁহাকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁহাকে কি ইংরাজি কি বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া মনে করিতেন। বঙ্গসাহিত্যসিংহ অক্ষয়চন্দ্র সরকার আমার সমক্ষে ও পাঁচকড়ির অসাক্ষাতে পাঁচকড়ি বাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। 'বঙ্গবাসী'র-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত তদানীন্তন দৈনিক ইংরাজি সংবাদপত্র 'টেলিগ্রাফে'র সম্পাদক পাঁচকড়ি বাবু ছিলেন।" ('বঙ্গবাণী,' পৌষ ১৩৩০)

পাঁচকড়ি কর্ম্মদক্ষতাগুণে ১৮৯৫ সনে 'বঙ্গবাসী'র প্রধান সম্পাদকের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন।* ইহার সংস্রবে আসিয়া তিনি আত্মোন্নতির প্রভূত সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুকে স্মরণ করিয়া তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন :—

"আপনার 'বঙ্গবাসী'র সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আমি বাঙ্গালা লিখিতে শিখিয়াছি, আপনার 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক-পদে উন্নীত হইয়া আমি বাঙ্গালীর সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত হইয়াছি। এখন ভাগ্যবশে আমি স্বতন্ত্র ; কিন্তু 'বঙ্গবাসী'র ভাব ও ভাষা চিরদিনই আমার হইয়া থাকিবে।" ('রূপ-লহরী,' উৎসর্গপত্র)

কিন্তু এ সকলের মূলে ছিলেন ইন্দ্রনাথ,—'বঙ্গবাসী'র হিতৈষী, পরামর্শদাতা ও লেখক। পাঁচকড়ি তাঁহার সাহিত্যগুরু হিসাবে ইন্দ্রনাথকে স্বীকার করিতে কোন দিনই কুণ্ঠিত হন নাই ; তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে লিখিয়া গিয়াছেন।

"তিনি আমার খাঁটি গুরুমহাশয় ছিলেন, হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাইয়াছিলেন, কত ভঙ্গী করিয়া পড়িতে, বুঝিতে এবং বুঝাইতে শিখাইয়াছিলেন। আমার লেখায় এবং বলায় যদি কিছু মাধুরী থাকে তবে সে তাঁহার ; আর বাকী উদ্ভটতা, উৎকটতা—সে সব আমার। এখনও তাঁহারই কথা বেচিয়া খাইতেছি, তাঁহারই সিদ্ধান্তসকল ব্যাখ্যা করিয়া সমাজে স্থান পাইয়া আছি। গুরু, বন্ধু, সখা, ভ্রাতা, পরিচালক তিনি আমার সব ; অধম অযোগ্য আমি তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি বিশেষ কিছুই আদায় করিতে পারি

* "বঙ্গবাসীর সম্পাদক হইবার পর, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে সুরেশের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হয়" ('সাহিত্য,' পৌষ-মাঘ ১৩২১)

নাই। যাহা পারিয়াছি, তাহাই আমার জীবনের অবলম্বন, দারিদ্র্যের তৃপ্তি, নিরাশার সুখ।" ('প্রবাহিণী,' ২০ বৈশাখ ১৩২২)

'বসুমতী' ঃ পাঁচকড়ি কংগ্রেস-বিরেধী 'বঙ্গবাসী' বর্জ্জন করিয়া ১৮৯৯ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি হইতে কংগ্রেস-সমর্থনকারী 'বসুমতী'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। 'বসুমতী'র (তৎকালে সাপ্তাহিক) তখন শৈশব কাল, ১৮৯৬ সনের ২৫এ আগষ্ট ইহার প্রথম আবির্ভাব। স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পাঁচকড়িকে যে নিয়োগপত্রখানি পাঠাইয়াছিলেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

শ্রীশ্রীদুর্গা

BASUMATI OFFICE
96, Beadon Street.
Calcutta, ১৬৷২ *1899*

মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাশয় সমীপেষু—

আমার "বসুমতী" নামক সাপ্তাহিক বাঙ্গালা সংবাদপত্রেব আপনাকে সম্পাদক নিযুক্ত করিলাম, ৬ই ফাল্গুন ১৩০৫ সাল হইত আপনার মাসিক ৮০৲ আশী টাকা হিসাবে বেতন নির্দ্ধারিত হইল, প্রতি মাসে প্রথম সপ্তাহেই বেতন লইবেন। সম্পাদকীয় সমস্ত ভারই আপনার উপর নির্ভর রহিল, বসুমতীর আর্থিক ক্ষতিও স্বার্থের সম্বন্ধ ভিন্ন কোন আপত্যই আমি করিব না।

ঈশ্বর না করুন যদ্যপি বসুমতী প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়, তথাপি আপনাকে অন্যান্য কাজ ও পুস্তক রচনা, সংগ্রহ ইত্যাদি দিয়া ঐ বেতনে এক বৎসর নিযুক্ত রাখিব, আপনিও এই এক বৎসর অন্য কোথায় যাইতে পারিবেন না, যদ্যপি এই এক বৎসর মধ্যে আপনি

চলিয়া যান অর্থাৎ কার্য্য পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে আমায় ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে, এক মাসের বেতন বাদ যাইবে। আমি আপনাকে এই এক বৎসর মধ্যে ত্যাগ করিলে তিন মাসের বেতন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিব।

বসুমতীর আর্থিক উন্নতির সহিত আপনার বেতন বৃদ্ধি হইবে তাহা বলাই বাহুল্য, তিন মাসের পরে আপনি ৯০৲ নব্বুই টাকা হিসাবে বেতন পাইবেন।

বিনীত
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বসুমতীর স্বত্বাধিকারী।

দুই বৎসর পরে স্বত্বাধিকারীর সহিত মতবিরোধের ফলে পাঁচকড়ি 'বসুমতী' ছাড়িয়া অমরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রবর্ত্তিত 'রঙ্গালয়' পত্রে যোগদান করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—১ মার্চ ১৯০১।

পাঁচকড়ি স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের দৈনিক 'সন্ধ্যা'তেও নিয়মিতভাবে লিখিতেন। ১৯০৮ সনে তিনি দৈনিক 'হিতবাদী'র সম্পাদক হন। 'বাঙ্গালী'ও হিন্দী দৈনিক 'ভারতমিত্র'ও তাঁহার সম্পাদনায় কিছু দিন পরিচালিত হইয়াছিল। ১৯২২ সনের জুন মাসের মধ্যভাগ হইতে তিনি মাসিক এক শত টাকা পারিশ্রমিকে 'স্বরাজে' প্রতি দিন অন্যূন এক পাটি করিয়া লিখিতেন।* এক মাত্র 'নায়ক' পত্রের সহিতই পাঁচকড়ি দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন।

পাঁচকড়ির সম্পাদিত আরও দুইখানি পত্রিকার উল্লেখ করা প্রয়োজন; ইহার প্রথমখানি—'প্রবাহিণী,' সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা, প্রবর্ত্তক—সতীশচন্দ্র মিত্র। ইহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—৩ মাঘ

---

* ১৩ জুন ১৯২২ তারিখে পাঁচকড়িকে লিখিত আর, এস, শর্ম্মার "গোপনীয়" পত্র।

১৩২০। পাঁচকড়ি দুই বৎসর 'প্রবাহিণী' সম্পাদন করিয়াছিলেন। প্রথম বর্ষে তিনি কেবল প্রথম চারি মাস ও শেষে দুই মাস (২৫শ-৪৪শ সংখ্যা বাদে) ইহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। 'প্রবাহিণী'র প্রত্যেক সংখ্যায় তাঁহার রচনা স্থান পাইত, "নানাকথা"-বিভাগটিও তিনি নিজে লিখিতেন।

'সাহিত্য'ঃ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি অকালে পরলোক গমন করিলে পাঁচকড়ি প্রিয় সুহৃদের এই সাধের মাসিক পত্রিকাখানি সহজে বিলুপ্ত হইতে দেন নাই, তিনি স্বয়ং ১৩২৭ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যা হইতে 'সাহিত্যে'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। 'সাহিত্যে'র পৃষ্ঠায় তাঁহার বহু রচনা—প্রবন্ধ, গ্রন্থসমালোচনা, "সহযোগী সাহিত্য," "বৈঠকী" প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

সরকারী প্রচার-বিভাগের বঙ্গানুবাদক: সংবাদপত্র-জগতে পাঁচকড়ির যশ যখন সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই সময় বঙ্গীয় সরকার তাঁহাকে প্রচার-বিভাগের বঙ্গানুবাদক (Bengali Translator to the Bengal Publicity Board) পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার নিয়োগকাল—১ অক্টোবর ১৯১৮। এই পদের বেতন ছিল মাসিক ২৫০৲ টাকা।*

সাংবাদিক হিসাবে দোষগুণঃ এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার একটি প্রবন্ধে ('মানসী ও মর্ম্মবাণী,' পৌষ ১৩৩০) যে মন্তব্য করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "পাঁচকড়ির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনা হয়, তাঁহার মতস্থৈর্য্য ছিল না। বাস্তবিক আজ তিনি কোনও রাজনৈতিক

* ১১ অক্টোবর ১৯১৮ তারিখে বেঙ্গল পাব্‌লিসিটি বোর্ডের জয়েণ্ট সেক্রেটারি ই ন, র‍্যাণ্ডির পত্র।

বিষয়ে এক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, কল্য পুনরায় তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করিতেছেন। অবশ্য সকলেরই ভ্রান্তি ঘটিতে পারে এবং মত পরিবর্ত্তন করা কোনও লোকের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু পাঁচকড়ি প্রকাশ্যেই স্বীকার করিতেন যে তিনি পেটের দায়ে কোনও বিশেষ নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।...বাস্তবিক তিনি স্বাধীনভাবে কিছুই লিখিতে পারেন নাই, সেই জন্য তিনি কিরূপ রাজনীতিক ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। স্যর আশুতোষ চৌধুরী বলিয়াছেন, পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই। আমরা আশ্চর্য্য হইতাম সাহিত্যিকরূপে তাঁহার অপূর্ব্ব ক্ষমতা দেখিয়া; 'বাঙ্গালী'তে একপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এক মতের সমর্থন করিয়াছেন—সেই দিনই 'নায়কে' অপর একপ্রকার যুক্তি প্রদর্শিত করিয়া অপূর্ব্ব নিপুণতার সহিত পূর্ব্বমতের খণ্ডন করিয়াছেন।...

পাঁচকড়ির বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ আনয়ন করা হয়, তাহা এই যে, তিনি সম্পাদকীয় লেখনী সময়ে সময়ে এরূপ অসংযতভাবে ব্যবহার করিতেন যে, তাহাতে অনেকে মর্ম্মাহত হইতেন। তাঁহার নামে অনেক বার মানহানির মকদ্দমা হইয়াছে। প্রায়ই তিনি তাঁহার শ্লেষবাণাহত প্রতিপক্ষের রহস্য-রসাস্বাদন-শক্তি-অভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেন। প্রাচীন বাঙ্গালার রসিকতায় যে আধুনিক বাঙ্গালীর মানহানি হইতে পারে, ইহা তিনি আইন সত্ত্বেও বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না। অধিকাংশ স্থলেই এই সকল বিবাদ হাস্য-পরিহাসের মধ্যেই বিলয়প্রাপ্ত হইত। পাঁচকড়ি যথার্থই লিখিয়াছিলেন—"যে আজ আমাকে গালাগালি

করে, সে কাল আমার হাত ধরিয়া লইয়া যায়। যে আজ আমার নিন্দায় দুন্দুভি বাজায়, সে কাল প্রশংসার সানাইয়ে সুর জমাইবার চেষ্টা করে। তোমাদের নিন্দা স্তুতির মূল্য বুঝিয়া আমার কেবল হাসি পায়। আমাকেও চিনিলে না, চিনিতে পারিবেও না।"*

গ্রন্থাবলী

আমারা পাঁচকড়ি রচিত ও সম্পাদিত যে কয়খানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিলাম। বন্ধনী-মধ্যে ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। **আইন-ই-আকবরী** ও আকবরের জীবনী। ১৩০৬ সাল (১০-৩-১৯০০)। পৃ. ৯৫+১।

"ফ্রান্সিস গ্লাডউইন কর্ত্তৃক ইংরাজী হইতে অনূদিত" ও বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

২। **শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত** আদি, মধ্য, অন্ত্যলীলা (কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত) চৈতন্যাব্দ ৪১৪ (১২-৩-১৯০০)। পৃ. ৩৭৮। বসুমতী-কার্য্যালয়।

৩। **উমা** (গৃহচিত্র)। ১ ফাল্গুন ১৩০৭ (৭-৫-১৯০১)। পৃ. ১৬২।

৪। **রূপ-লহরী** বা রূপের কথা। ১৩০৯ সাল (১৫-৬-১৯০২)। পৃ. ১৮৭।

সূচী: কালিন্দী, মনোরমা, ফুলকুমারী, অনুপমা, দোপাটি, মালতী, হাবী।

---

* "আবার আসিলাম": 'প্রবাহিনী,' ২১ অগ্রহায়ণ ১৩২১ (৪৫শ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।—ব্র-না-ব

৫। **সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস,** ১ম খণ্ড। আশ্বিন ১৩১৬ (ইং ১৯০৯)। পৃ. ২৫৩।

"ইদানীং সিপাহীযুদ্ধ ঘটিত অনেক পুরাতন কথা, অনেক অজ্ঞাত বিষয়, বিলাতে ও ভারতে প্রকাশিত হইয়াছে। সে সকল কথা বাঙ্গালী পাঠকগণ জানেন না। আমি তাহাই পাঠকগণের গোচর করিবার জন্য এই দুষ্কর কার্য্যে অগ্রসর হইলাম। 'হিতবাদী'র পরিচালকগণের পক্ষ হইতে একখানি সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস পাঠকগণকে উপহার দিবার জন্য বহুদিন হইতে উদ্‌যোগ আয়োজন হইতেছিল; আমিও সে পক্ষে একটু চেষ্টা করিয়াছিলাম। আর সেই চেষ্টার ফলেই এই ইতিহাসগ্রন্থ প্রকাশ করা হইল।"—ভূমিকা

ইহা সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।

৬। **বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয়,** ১ম খণ্ড (সচিত্র)। ইং ১৯১৫ (১৮ নবেম্বর)। পৃ. ২২৩। বসুমতী-কার্য্যালয়।

"ইয়োরোপের মহাপ্রলয়ের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই যুদ্ধের সূচনাকালে এবং প্রথম অবস্থাতে আমি যে সকল সন্দর্ভের প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার অনেকগুলি ইহার অঙ্গীভূত হইল।... ইতিহাসের হিসাবে এখনও এ মহাপ্রলয়ের ইতিহাস লিখিবার সময় আসে নাই। এখন গল্পগাছা লিখিবারই সময়, আর ইয়োরোপের সভ্যতার যাচাই করিবার সময়। এ সকল বিষয় আমি বিলাতের টাইমস্ আফিস হইতে প্রকাশিত বৃহৎ ইতিহাসের প্রথম খণ্ড অবলম্বনে এবং ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেনের ফাইল পড়িয়া সংগ্রহ করিয়াছি। এই খণ্ডে কেবল সূচনার কথা, কেবল গোড়ার বিপ্লবের কথাই লেখা হইয়াছে।"—সম্পাদকের নিবেদন।

৭। **সাধের বউ** (উপন্যাস)। ২৫ ভাদ্র ১৩২৬ (ইং ১৯১৯)। পৃ. ১৬৪।

৮। **দরিয়া** (উপন্যাস)। আষাঢ় ১৩২৭ (২৬-৬-১৯২০)। পৃ. ১৯৪।

পুস্তকের ভূমিকা-স্বরূপ "গোড়ার কথায়" গ্রন্থকার এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"আজ 'দরিয়া' পুস্তকে যাহা লিখিলাম, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে উহা বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর সর্ব্বজন-পরিচিত ভাব ছিল। তাই ৺শিশির কুমার ঘোষের 'অমিয় নিমাই চরিত' তখন অত বিকাইয়াছিল। এখন শুনিতেছি বাঙ্গালীর পুরুষপরম্পরাগত ভাবসম্পত্তির কথা আধুনিক শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় বুঝিতে পারেন না। আমি যাহাকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়া এই পুস্তক রচনা করিয়াছি, তাহার যদি ব্যাখ্যা করিতে হয় তাহা হইলে সাধক-তত্ত্বের গোড়ার কথা বুঝাইতে হইবে। সে চেষ্টা না হয় অন্য পুস্তকে করিব।

'দরিয়া'য় পরকীয়া-তত্ত্ব একটু ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছি। পরকীয়া বলিলে এখন অনেকে যাহা বুঝেন উহা তাহা নহে; উহা পরস্ত্রী-গমনের নামান্তর নহে। যাহা পরের ভাব তাহাকে আমার ভাবের সহিত মিলাইয়া পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে পারিলে তবে পরকে আপন-জন করিতে পারা যায়, তবে বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টিকে আমার বলিয়া এক করা চলে। Universal Brotherhood কথার কথা নহে। ভাব-বৈষম্যবশতঃই নর-নারীর মধ্যে, জাতি সকলের মধ্যে বৈচিত্র্য এবং বিরোধ ঘটে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, এশিয়াবাসী ও ইয়োরোপবাসী—এই যে বিভেদ ও বিচার ও জাতি পার্থক্য, ইহা ভাবগত বৈষম্য জন্য ঘটিয়াছে। এ

বৈষম্য দূর করিবার চেষ্টা জগতে সর্ব্বাগ্রে বৌদ্ধ প্রচারকগণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের পথে তাঁহারা নর-সমাজের একীকরণ ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহাদের পরে ইস্‌লাম অন্য রকমে জগৎটাকে মোসলেম বানাইয়া এক করিতে চাহেন। পরকীয়া-তত্ত্ব এই চেষ্টার সাধন-পদ্ধতি। সহজ পণ্ডিতগণ বলেন যে, ও পথে জগতের বৈচিত্র্য দূর হইবার নহে; ও পথে দেশ, কাল, পাত্রের প্রভাব এড়াইয়া উপরে উঠা যায় না। তাই তাঁহারা পরকীয়া-সাধনার নানা ক্রম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 'দরিয়া'য় একটা ক্রম আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এ সাধনার অনেকগুলা ক্রম ভগবান্ রামকৃষ্ণ দেব তাঁহার জীবনে ফুটাইয়া দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বাঙ্গালী তাহা দেখিয়া ঠিক মত বুঝিতে পারে নাই। ৺কেশবচন্দ্র "নববিধান" ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করিয়া গোড়ার প্রথম স্তরটা বাঙ্গালীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। সেই তত্ত্বটাকে রোচক ও অর্থবাদে মোড়ক করিয়া 'দরিয়া' পুস্তকে আমি খোলসা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সে চেষ্টা সার্থক হইল কি না বলিতে পারি না।

আধুনিক ইংরেজী-নবীশ সমাজ ছাড়া বাঙ্গালায় এখনও একটা বৃহত্তর ভাবুক সমাজ আছে। তাঁহাদের কোন সমাচার আমরা রাখি না; কেবল মন্দটুকুই দেখিতে পাই। সে সমাজে সহজ-মত কিশোরী-ভজন, পরকীয়া-সাধন এখনও প্রচলিত আছে। সদ্‌গুরুর অভাবে এ সকল মত ও সাধনা অতি মাত্রার বিগড়াইয়াছে বটে পরন্তু খোঁজ করিলে এখনও ভাল ভাবুক ও রসিক মানুষ পাওয়া যায়।

শেষ কথা—সন্ন্যাসী সমাজের কথা। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী সমাজ একটা বিরাট্, বিশাল, দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার। যে

একটু দেখিতে পাইয়াছে, সে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া আছে। এই যে তোতাপুরীর সময় হইতে বাঙ্গালায় আবার ধীরে ধীরে সন্ন্যাসী প্রাধান্য বাড়িয়া যাইতেছে, পরমহংস রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ, ভোলাগিরি, কাঠিয়াবাবা, বাবাজী দয়ালদাস, অঘোরী বাবা, বাবা ঠাকুরদাস প্রভৃতি আজ ষাট বৎসর কাল বাঙ্গালার কাজ করিয়া স্ব স্ব পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন এবং এখনও নূতন অনেকে কাজ করিতেছেন, ইহার মধ্যে কেন্দ্রগত কেন্দ্রী মহাপুরুগণের যে ইঙ্গিত আছে, আমি তাহাই একটু খুলিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। সখের উপর এ কাজ করি নাই, আদেশ বশতঃই এটুকু করিলাম।"

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা—পাঁচকড়ির অধিকাংশ রচনাই প্রধানতঃ সাময়িক বিষয় অবলম্বনে লিখিত, এগুলি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ; এই সকল সংবাদপত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য। তিনি প্রতিষ্ঠাপন্ন কতকগুলি সাহিত্যবিষয়ক পত্র-পত্রিকাতেও গল্প-উপন্যাস, সমাজনীতি, সাহিত্য, জীবনচরিত, জাতিতত্ত্ব, দর্শন, বৈষ্ণবশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, সমালোচনা—সকল বিষয়েই বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ; দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'বেদব্যাস' (১২৯৪-১৩০২), 'জন্মভূমি' (১৩০৭-৮,-১২,-২০,-২১), 'অনুসন্ধান,' 'মানসী,' 'বিজয়া,' 'নারায়ণ,' 'সাহিত্য,' 'বঙ্গবাণী,' 'ধ্রুব' প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর রচনার অধিকাংশই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই ; নিম্নে কতকগুলির তালিকা দিতেছি।

'অনুসন্ধান' :	১২৯৮, ১৫ ভাদ্র	...	সুখ
	১৩০০, ১৫ অগ্রহায়ণ	...	আন্দোলন
	১৩০১, ৪ জ্যৈষ্ঠ	...	একনিষ্ঠা

৮ আষাঢ় ... মানুষ না, বৃক্ষ ?
২২ ভাদ্র ... হিন্দু-বিধবা
৩০ কার্ত্তিক, ৭ অগ্র ... কন্যাদায়
১৩০৭, ১ কার্ত্তিক ... পঞ্চানন্দ

'সাহিত্য' ঃ ১৩১৫, মাঘ ... নবীনচন্দ্র ও জাতীয় অভ্যুত্থান
১৩১৮, বৈশাখ ... ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
আশ্বিন ... বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব
১৩১৯, বৈশাখ ... জীবনচরিতের মূলসূত্র
কার্ত্তিক ... বঙ্গের ভাস্কর্য্য। মাতৃ-পূজা
পৌষ ... দুইটি গান
১৩২০, জ্যৈষ্ঠ ... দান্তে
আষাঢ় ... ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
ভাদ্র ... ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্ত্তিক ... শারদীয়া পূজা। উপাসনাতত্ত্ব
১৩২১, আশ্বিন ... রমণী ও জননী
চৈত্র ... সাহিত্যের অগ্নিপরীক্ষা
১৩২৭, পৌষ-মাঘ ... ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
১৩২৮, আশ্বিন ... উপাসনা ও সাধনা
... শ্রীদুর্গা প্রসঙ্গ। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব
কার্ত্তিক ... দেহের ও দেশের আত্মা
পৌষ ... ঐখানে দাঁড়ায়ে থাক
১৩২৯, বৈশাখ ... "চুড়ি লিবি গো ?" বৈশাখী পূর্ণিমা
কর্ত্তিক ... চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
ফাল্গুন ... শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা। হিন্দু কে ?

'মানসী' ঃ	১৩২০, আষাঢ়	···	কবি দ্বিজেন্দ্রলাল
	আশ্বিন	···	বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব
	কাত্তিক	···	পুনরাগমনায় চ
'বিজয়া' ঃ	১৩২০ কার্ত্তিক	···	ভাষার ধর্ম্ম
	অগ্রহায়ণ	···	আচার ধর্ম্ম
	পৌষ	···	বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-সমাজ
	ফাল্গুন	···	আচার তত্ত্ব
	চৈত্র	···	ব্রাহ্মণ-সভা
'প্রবাহিণী' ঃ	১৩২০, ৩ মাঘ	···	প্রবাহিণী
	১০ মাঘ	···	রূপোল্লাস। স্মৃতি-কথা ঃ বঙ্কিমচন্দ্র
	১৭ মাঘ	···	সরস্বতী-বন্দনা
	১ ফাল্গুন	···	জপ ও কীর্ত্তন
	৮ ফাল্গুন	···	শিব ও শক্তি
	১৫ ফাল্গুন	···	মদন-তত্ত্ব। স্মৃতি-কথা ঃ হেমচন্দ্র
	২২ ফাল্গুন	···	ভগবান্ রামকৃষ্ণ
	২৯ ফাল্গুন	···	ভক্তি-তত্ত্ব
	৬ চৈত্র	···	আমিত্ব
	১৩ চৈত্র	···	ব্রাহ্মণ জাতি। তুমি ও আমি
	২০ চৈত্র	···	ভক্তি ও আসক্তি
	২৭ চৈত্র	···	শ্রীশ্রীরামচন্দ্র
	১৩২১, ৪ বৈশাখ	···	স্মৃতি-কথা ঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়
	১১ বৈশাখ	···	শ্রীশ্রীহনুমান
	২৫ বৈশাখ	···	পঞ্চ কন্যা
	৯ জ্যৈষ্ঠ	···	স্মৃতি-কথা ঃ কেশবচন্দ্র সেন

১৩২১, ২৮ অগ্রহায়ণ ··· আমার কথা
৬ পৌষ ··· আমার সাধ
২০ পৌষ ··· ৺শিশিরকুমার ঘোষ
১১ মাঘ ··· বসন্ত পঞ্চমী
১৮ মাঘ ··· মাটি নিবি গো। সম্মেলনের সখ
২৫ মাঘ ··· শুকদেব
৩ ফাল্গুন ··· শিবরাত্রি
১০ ফাল্গুন ··· জয় রাধে কৃষ্ণ
১৫ চৈত্র ··· অবতার-বাদ
২২ চৈত্র ··· মানস পূজা
১৩২২, ২০ বৈশাখ ··· ইন্দ্রনাথ
২৭ বৈশাখ ··· বাঙ্গালায় তন্ত্র।
কেদারনাথ (ভ্রমণ)
৩, ১০ জ্যৈষ্ঠ ··· কাম ও মদন
১৭ জ্যৈষ্ঠ ··· বাঙ্গালীর প্রত্নতত্ত্ব
১৭, ২৪, ৩১ জ্যৈষ্ঠ ··· তন্ত্রে মূর্ত্তিপূজা
৬ আষাঢ় ··· তন্ত্রের দেহতত্ত্ব
১৩, ২০ আষাঢ় ··· তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব
২৭ আষাঢ় ··· সেকাল আর একাল।
পঞ্চ 'ম' কার
১৭ শ্রাবণ ··· শিব ও শক্তি

'নারায়ণ': ১৩২১, অগ্র., মাঘ, চৈত্র··· পৌরাণিকী কথা
১৩২২, বৈশাখ ·· বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী
শ্রাবণ ··· গতি ও স্থিতি

	১৩২২, কার্ত্তিক	...	শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব
	অগ্রহায়ণ	...	নব বর্ষ
	১৩২৩, ফাল্গুন	...	দোল-পূর্ণিমা
'সারথি':	১৩২৭, আষাঢ়, শ্রাবণ	...	বৈঠকী আলাপ
'বঙ্গবাণী':	১৩২৯, ভাদ্র	...	বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা
	আশ্বিন	...	বাঙ্গালীর জাতি-পরিচয়
	কার্ত্তিক,	...	বাঙ্গালার উপাসক সম্প্রদায়
	পৌষ	...	বাঙ্গালীর সমাজ-বিন্যাস
	ফাল্গুন, চৈত্র	...	গোড়ার কথা
	১৩৩০, বৈশাখ	...	হিন্দুমণ্ডল বা সৌর মণ্ডল
	আষাঢ়	...	সিদ্ধাচার্য্যগণ।
'কল্পনা':	৪র্থ বর্ষ পৃ. ৩১৭-২৬	...	আমরা বিদেশী

এতদ্ব্যতীত কয়েকখানি পুস্তকের "ভূমিকা"তেও পাঁচকড়ির গুণগ্রাহিতা ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় আছে।

মৃত্যু

পাঁচকড়ি দীর্ঘায়ু ছিলেন না। ১৩৩০ সালের ২৯এ কার্ত্তিক (১৫ নবেম্বর ১৯২৩), ৫৭ বৎসর বয়সে, বৃদ্ধ পিতা-মাতা ও পত্নীকে (তৃতীয়া) শোক-সাগরে ভাসাইয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন।

পাঁচকড়ি ও বাংলা-সাহিত্য

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সে-যুগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় মতে উচ্চশিক্ষিত এক জন সাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁহার স্থায়ী সাহিত্যকীর্ত্তি যৎসামান্য হইলেও সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনায়

তিনি যে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এ যুগেও আদর্শ ও অনুকরণীয় বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এই কারণে তাঁহার সেই সকল রচনার সঙ্কলন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাহা ছাড়া বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার বহু প্রবন্ধে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ ছড়াইয়া আছে। তাঁহার সাহিত্যসাধনার অবিসম্বাদিত কীর্ত্তি সেইগুলি। শুধু ইতিহাস নয়, রচনাকৌশলের দিক্ দিয়াও সেগুলি অসাধারণ এবং এইগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা। শুধু সাময়িকপত্রের মধ্যেই আবদ্ধ আছে বলিয়া তাঁহার এই প্রতিষ্ঠা আজিও সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয় নাই এবং তিনি হারাইয়া যাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার রচনাগুলি সংগৃহীত ও সুসম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইলে সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথাযথ মূল্য নির্দ্ধারণ সহজ হইবে এবং আমাদের বিশ্বাস, তিনি এ যুগে বাঙ্গালীর শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করিবেন।

পাঁচকড়ির রসসমুজ্জ্বল রচনার নিদর্শনস্বরূপ আমরা নিম্নে তাঁহার দু-তিনটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিতেছি :—

মাটি নিবি গো।—'মাটি নিবি গো'—চীরপরিধানা, শুষ্কা, শীর্ণা কর্দ্দমপরিলিপ্তা দুঃখিনী মাথায় এক ঝুড়ি মাটি লইয়া, পাড়ায় মাটি বেচিতেছে। অনাহারে তাহার কণ্ঠরব মৃদু দারিদ্র্যের পীড়নে তাহার দেহযষ্টি কিঞ্চিৎ ন্যুব্জ, তাহার আশা নাই, ভরসা নাই, সুখ নাই, স্বস্তি নাই,—আছে কেবল পেটের জ্বালা, আছে কেবল জীবনের মায়া। সে বাঁচিতে চাহে—জীবন-সুখেই সে কেবল বাঁচিতে চাহে, কিন্তু বাঁচিবার উপায় তাহার কিছু নাই, আছেন কেবল মা গঙ্গা, যখন ভাঁটার টানে জল নামিয়া যায়, তখন সে গঙ্গার মাটি, নখাঙ্গুলের শীর্ণ নখের সাহায্যে চাঁচিয়া আনিয়া পাড়ায়

পাড়ায় বেচিয়া বেড়ায়। অথবা যখন কোন ঐশ্বর্য্যশালী ধনবান্ পুরুষ নূতন ভবন নির্ম্মাণ করিবার আয়োজন করেন, তখন বুনিয়াদ খুঁড়িতে যে মাটি বাহির হয়, তাহাই কিছু সংগ্রহ করিয়া সে ক্ষুধার অন্ন সঞ্চয় করে। মাটিই তাহার অন্ন। মাটিই তাহার জীবন।

'মাটি নিবি গো'—কাতর কণ্ঠে দুঃখিনী আবার ডাকিল। কৈ কেহ ত সাড়া দেয় না, কেহ ত দরজা খুলিয়া মাটি কিনিতে পথে আসিয়া দাঁড়ায় না! বুঝি, দুঃখিনী আর মাটির বোঝা বহিতে পারে না। বুঝি, তাহার আজ অনাহারে দিন যায়। বেলা দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, কলিকাতার শান-বাঁধান 'ফুট পথে' আর পা পাতিয়া চলা যায় না; পিপাসায় তাহার তালু শুষ্ক হইয়াছে, অধরোষ্ঠে ধূলা উড়িতেছে; দুঃখিনী আর সহিতে পারে না, তাহার দুই চক্ষুর কোণ হইতে অশ্রুর দুইটি মোটা ধারা গড়াইয়া পড়িল। হা বিধাতঃ! মাটিও কেহ কিনিতে চায় না! এমন সময় বাবুদের বাড়ীর একটি চাকরাণী চাঁচা বাখারীর মতন কালো-কোলা দেহখানিকে দোলাইয়া, এক পিঠ চুল নাচাইয়া, আহারান্তে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে সেই পথে আসিয়া দাঁড়াইল। রোরুদ্যমানা মৃত্তিকাবিক্রয়িত্রীকে চোখের জল ফেলিতে দেখিয়া ঝি মহাশয়া চোখমুখ বাঁকাইয়া বলিল—"আঃ মর মাগী, দরজায় বসে আবার কান্না হচ্ছে।"

ঝিয়ের মিষ্ট সম্ভাষণ শুনিয়া, একটু সামলাইয়া, মাটিওয়ালী উদাসভাবে বলিল—"হ্যাঁ মা, তোমাদের পাড়ায় কি কেহ উনান পাতে না, কাহারও বাড়ীতে কি রসুই-ঘর নাই, কোন গৃহে কি তুলসীমঞ্চ নাই? তোমরা কি হাতে-মাটি কর না?"

এক গাল হাসিয়া যেন সোহাগে আটখানা হইয়া ঝি উত্তর

করিল—"না রে না;—এ যে বাবুসাহেবদের পাড়া। এখানে কাহারও চাল-চুলা নাই, তুলসীমঞ্চ নাই; হাতে-মাটির রেওয়াজও নাই। এ পাড়ায় কি মাটি বেচিতে আসিতে আছে?"

মাটিওয়ালী—"তবে ইহারা খায় কি? খায় না। শেত খানাও যায় না।"

ঝি—"খাবে না কেন? দিনের মধ্যে পাঁচ বার খায়। বাবুর্চ্চিখানায় রান্না হয়, রসুই-করা সামগ্রী ঘরে আনিয়া খায়। হাতে মাটি দেয় না, সাবান মাখে। বুঝিলি, এ পাড়ায় কোন বাড়ীতেই মাটি বিকাইবে না।"

মাটিওয়ালী ঝিয়ের কথা শুনিয়া চোখের জল মুছিল এবং নিরাশভাবে মাটির ঝুড়িটা মাথায় তুলিতে চেষ্টা করিল। বৃদ্ধা দুই দিন একটি চণকও দাঁতে কাটে নাই, ক্ষুধায় স্থির হইয়া বসিতে পরিতেছে না, মাটির ঝুড়ি মাথায় তুলিবে কি! ঝুড়ি তুলিতে গিয়া সে উল্‌টাইয়া পড়িয়া গেল। ঝি নিতান্ত হৃদয়হীনা নহে, সেও এক দিন অনাহারে কষ্ট পাইয়াছে, ক্ষুধার্ত্তের জ্বালা সে বেশ বুঝে; সে-বেদনার স্মৃতি এখনও সে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। ঝি তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর হইতে এক ঘটি জল আনিয়া মাটিওয়ালীর চোখে মুখে দিল। দুঃখিনীর একটু জ্ঞান হইল, পাঁজর-ভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আবার বলিল—"হা ভগবান্ মাটি কেহ খরিদ করিতে চাহে না!" এই কথা শুনিয়া এবং দরজায় একটা হাঙ্গামা হইতেছে বুঝিয়া বাড়ীর গৃহিণী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—"মাটিওয়ালী, তোর এক ঝুড়ি মাটির দাম কত?" অতি ধীরে দুঃখিনী বলিল,—"চারি পয়সা।"

গৃহিণী—অত মাটির দাম চার পয়সা! আমি দুই আনা দেব, আমায় সব মাটি দিয়ে যা।

শীর্ণ মুখে একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া মাটিওয়ালী উত্তর করিল —"আর দয়া করিতে হবে না মা। দেবতাই আমাকে যথেষ্ট দয়া করিয়াছেন। চারি পয়সা পাইলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।"

গৃহিণী—সে কি। দয়া কেমন! দেবতার দয়া কি দেখিলে?

মাটিওয়ালী—যখন আমার দেহে বল ছিল, তখন আমি যত মাটি বহিতে পারিতাম, তাহার দাম পাড়ার লোকে চারি পয়সা দিত। এখন তাহার অর্দ্ধেক বহিতে পারি, তবু চারি পয়সাই পাই। বার্দ্ধক্যে ইহাই আমার পক্ষে দেবতার দয়া। আর তুমি মা যখন নেমে আসিয়াছ, তখন দেবতার দয়া বাকী কি আছে!

গৃহিণী—চাট্টি ভাত খাবি? ভাত যদি খেতে না চাস্ ত একটু গরম দুধ দিব—খাইবি?

মাটিওয়ালী—অত সুখ সহিবে না মা। আমায় চারিটি পয়সা দেও, আমি ঝুড়িটা উপুড় করিয়া খালি ঝুড়ি লইয়া চলিয়া যাই।

এইটুকু বলিয়া মাটিওয়ালী জোর করিয়া উঠিয়া বসিল, জীর্ণ বস্ত্রাঞ্চলে কোটরগত দুইটি চক্ষু মুছিল, একটা ঢোক গিলিয়া সামলাইয়া গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়া আবার বলিতে লাগিল— "মাটি কেনা বন্ধ করিও না মা,—আমার কথা শুন—যখন তোমার দ্বারে আমার মতন আর কেহ মাটি বেচিতে আসিবে, অমনি তখনি দুই এক পয়সার মাটি তাহার নিকট হইতে খরিদ করিও। মাটি লক্ষ্মী, মাটি শেষের সম্বল। যাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে,

তাহার মাটি আছে। মাটি আছে বলিয়াই, মা আমি এমন দুঃখিনী হইয়াও ভিখারিণী হই নাই—কাঙ্গালিনী সাজিতে পারি নাই। চারিটার উপর আর চারিটা পয়সা তুমি আমায় ভিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলে। আমি তাহা লইব কেন। যত ক্ষণ মাটি আছে তত ক্ষণ আমার অন্ন আছে। আমি ভিক্ষা করিব কেন মা। সৌখীন ঘরের গৃহিণী তুমি মা, তোমার নয়নটাও সৌখীন রকমের। আজ তুমি আমায় দুধ খাওয়াইতে চাও, কাল আমার কি দশা হইবে? আজ তুমি আমার চার পয়সার মাটি আট পয়সায় কিনিলে, কাল অমন দাম কে দিবে? লাভের মধ্যে আমার লোভ বাড়িয়া যাইবে, আমার মাটি বেচায় ব্যাঘাত ঘটিবে। না মা, তোমার পয়সা তোমার থাকুক; আমাকে ন্যায্য মূল্য দিলেই আমি সুখী হইব। তোমার মাটির প্রয়োজন নাই, তবুও যে মাটি কিনিলে, দুঃখিনীর বোঝার লাঘব করিলে, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট দয়া।"

গৃহিণী নীরবে মাটিওয়ালীকে চারিটি পয়সা দিয়া, স্বয়ং নিজ হস্তে মাটির ঝুড়ি তুলিয়া ঘরে রাখিলেন। কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, অঞ্চলের বস্ত্র গলায় জড়াইয়া গললগ্নীকৃতবাসে, সাষ্টাঙ্গে মৃত্তিকার স্তূপকে প্রণাম করিলেন। এবং করজোড়ে বলিলেন— "মাটি, তুমি সত্যই মা-টি। যাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তাহার মাটি আছে। তুমি শেষ, তুমি অনন্ত। মা-টি আমার, তুমি স্থির হইয়া আমার ঘরে থাক। মূঢ়া আমি, জানিতাম না, তাই তোমায় তোমার যোগ্য মর্য্যাদা দিই নাই, তোমার উপাসনা করি নাই। আজ আমার সুপ্রভাত, এমন মহীয়সী দুঃখিনী আমার গৃহদ্বারে আসিয়াছিল, তাইতে তোমার মহিমা বুঝিলাম। থাক মা, যুগে

যুগে যেমন আমার শ্বশুর-বংশে পূজিতা হইয়া আসিয়াছ, আবার তেমনি ভাবে থাক। তুমি অন্ন, তুমি প্রাণ, তুমি মান, তুমি ধর্ম্ম, তুমি বাঙ্গালার বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব, তুমি আমার ঘরে স্থির হইয়া থাক। তোমায় বার বার নমস্কার করিতেছি।"

এই ভাবে মৃত্তিকার স্তব করিয়া গৃহিণী চোখের জল মুছিয়া পবিত্রা হইলেন—ধন্যা হইলেন। জ্ঞানময়ী, ভাবময়ী লক্ষ্মীস্বরূপিণী তিনি, মাটিওয়ালীর কথায় তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল, তাঁহার জীবনের ভাবের ধারা নূতন প্রণালী অবলম্বন করিল। তিনি বাঙ্গালিত্বের মহিমা বুঝিলেন।

আইস বাঙ্গালী, একবার মাটিওয়ালীর মতন আমরাও মাটির—আমাদের মা-টির ফেরি করিয়া জীবন ধন্য করি। মাটি নিবি গো—যে মাটিতে তুমি মা শিব গড়িয়া পূজা কর, এবং সংসারে কল্যাণের ধারা প্রবাহিত করিয়া দেও—সেই মাটি নিবি গো? এই মাটি চোরে চুরি করে না, বিদেশী ব্যবসায়ী কাটিয়া দেশান্তরে লইয়া যায় না; এ মাটির মূল্য নাই, যথার্থ মূল্য আজ পর্য্যন্ত কেহ করিতেও পারে নাই। তোরা কেউ মাটি নিবি গো! এ মাটির প্রতি কণা বিশাল ভারতবর্ষের বক্ষবিধৌত হইয়া সঞ্চিত হইয়াছে, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার কোটি তরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া এ মাটি সর্ব্বতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া গঙ্গার স্রোতোমুখে বাঙ্গালার বক্ষে আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছে। এ মাটির স্তরে স্তরে ভারতেতিহাস গাঁথা রহিয়াছে, যুগ-যুগান্তরের কত গাথা ইহাতে খচিত রহিয়াছে। আমাদের বড় সাধের মা-টি নিবি গো! এ মাটি আমার সত্যই কল্পলতিকা; যাহা চাও তাহাই দিবেন, দিতেছেন, দিয়াছেন। এ মা-টির প্রভাবে

আমাদের সকল অভাব দূর হইয়াছে, সকল কষ্টের মোচন হইয়াছে। এই মাটি হইতেই বাঙ্গালার কার্পাস, এবং সেই কার্পাস হইতেই ঢাকার মল্‌মল্‌। এই মাটি হইতেই বাঙ্গালার কার্পাস, এবং সেই কার্পাস হইতেই তুঁতের চাষ আর সেই তুঁতে হইতেই রেশমের গুটি এবং বাঙ্গালার পট্টবস্ত্র। এই মাটি হইতেই অন্ন, আর সেই অন্নের জোরেই বঙ্গভূমি ভারতবর্ষের অন্নপূর্ণা। আমাদের বাঞ্ছাকল্পলতিকা, মৃত্তিকা তোরা কেউ নিবি গো! ছার রজত কাঞ্চন, ছার দ্বিরদরদনির্ম্মিত আসন, ছার মণিমুক্তা, প্রবাল হীরা—ছার বিভব বাণিজ্য! আমার মাটি বজায় থাকিলে, তাহা হইতে পাট উৎপন্ন হইয়া কোটি কোটি টাকা ঘরে আনিয়া দেয়। আমার মাটি বজায় থাকিলে তাহা হইতে ঘাস উৎপন্ন হইলেও, অন্নজলের সংস্থান করিয়া দেয়। আমার মাটির বাঁশবনেও টাকার তোড়া সাজান আছে, কলাবনে মণিমুক্তা ছড়ান আছে। হায় বাঙ্গালী, এমন মাটিকেও অবহেলা করিতেছ।

মাটি নিবি গো—যাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তাহার মাটি আছে। ঐ শুন, ইউরোপে মহারণের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। আর ব্যবসায়ীর জাহাজ আসিবে না, আর বিলাসদ্রব্য পাইবে না, আর নগদ টাকার মুখ দেখিতে পাইবে না। সর্ব্বস্ব যাইবে, থাকিবে কেবল মাটি। সে মাটিকে মাথায় করিয়া রাখিতে পার যদি, তবেই ক্ষুধার অন্ন পাইবে, তৃষ্ণার জল পাইবে, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র জুটিবে। এমন শ্যামা মাটিকে—তোমাদের বাঙ্গালী জাতির মা-টিকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিও না। তোমার আধুনিক শহর, নগর, রাজধানী—সকলই ব্যাসকাশী; ঐখানে মরিলে গাধা হয়, বাঁচিয়া

থাকিলে মর্কট হইতে হয়। এ সব থাকে না, থাকে নাই। গৌড়, রাজমহল, একদলা, পাণ্ডুয়া, রমাবতী, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা—একে একে কত হইয়াছে, কত গিয়াছে। কোথায় নবদ্বীপ—কোথায় বা জগদ্দল! সব গিয়াছে, সব যাইবে—থাকিবে কেবল মাটি, স্তরবিন্যস্তভাবে, সদাস্নিগ্ধ কোমল পেলবরূপে থাকিবে কেবল মাটি। ঐ মাটিই অহঙ্কারের এবং স্পর্দ্ধার চিহ্নগুলিকে স্বীয় কুক্ষিগত করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে—এখনও তেমন অনেক দর্পের ভস্মস্তূপ বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গে এবং সর্ব্বত্র ঢাকা আছে। ঐ মাটির গুণে আজ বাঙ্গালা মরুভূমে পরিণত হয় নাই। ঐ মাটির স্তন্য পীযূষধারা শত ধারায় বিদূরিত হইয়া তোমাকে এখনও ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল দিতেছেন। এমন অক্ষয় ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার মাটিকে ঘরে তুলিয়া রাখ না? এই মাটি অমূল্য নিধি। এই মাটিতেই খোল হয়, যে খোলের চাঁটি শুনিলে এখনও বাঙ্গালী নাচিয়া উঠে। এই মাটিতে নিমাই ও নিতাইয়ের দিব্যমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, যাহাদের পুণ্য প্রভাবে আজও বাঙ্গালায় ভাবের তরঙ্গ উছলিয়া উথলিয়া উঠিতেছে। এই মাটিতেই দশভূজার প্রতিমা গড়িয়া বাঙ্গালী জীবন সার্থক কর! এক বার এই মা-টিকে মা-মা বলিয়া বাঙ্গালী এক বার গড়াগড়ি দেও! তোমার দেহ পবিত্র হউক, তোমার মনুষ্যজন্ম সার্থক হউক।

মা-টি নিবি গো—বাঙ্গালার মাটি-হারা মায়ের ছেলে, তোমরা যদি দেহ পবিত্র রাখিতে চাও, তৈজসপত্র পবিত্র রাখিতে চাও—পবিত্র অঙ্গনে যদি গোপালদের লইয়া দেবতার খেলা খেলিতে চাও,—তবে মাটি লও; মেয়েদের প্রবচন আছে—কোলের ছেলে কোলন্যাঙড়া, মাটির ছেলে সোনার চাঙ্গড়া।

এ মাটিতে গড়াগড়ি দিলে সত্যই সোনার চাঙ্গড়া হওয়া যায়। এই মাটি মাখিয়া আমরা নিরোগ, মাটি হইতেই আমাদের সর্ব্বস্ব। যে দিন হইতে মাটি ছাড়িয়াছি, সেই দিন হইতে চিররোগা দুঃখী হইয়াছি। যে দিন হইতে মাটি ভুলিয়াছি, সেই দিন হইতে মা-টির স্নেহ হারাইয়াছি। বাঙ্গালার মাটি অতি পবিত্র, তাই বাঙ্গালার মাটিতেই দেবপ্রতিমা নির্ম্মিত হয়। বঙ্গভূমি মৃণ্ময়ী, তাই বাঙ্গালার সর্ব্বস্ব মৃণ্ময়! এ মাটিতে কাঁকর নাই, পাথর নাই, কোনখানে কাঠিন্য নাই। এমন মাটি লইবে না? লও—লও, আমার সোনার মাটি, ক্ষীরের মাটি—লও, লও! দুধটুকু মারিয়া যেমন ক্ষীরটুকু হয় ভারতের পীযূষধারাকে শুকাইয়া, গঙ্গার কটাহে নাড়িয়া বাঙ্গালার ক্ষীর মাটি হইয়াছে। এমন ক্ষীরের মাটিকে অবহেলা করিও না। বলিয়াছি ত, এ মাটি কেহ কাড়িয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। তুমি বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে, এ মাটি তোমারই থাকিবে, তোমারই আছে। যে মাটি ভগবানের চরণতাড়নায় দশ বার পবিত্রীকৃত, যে মাটি গঙ্গাজলে সদা সিক্ত, যে মাটির স্তরে স্তরে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত—লও, লও, সাধের মাটি, সোহাগের মাটি, আদরের মাটি, স্নেহের মাটি—লও, লও। মা-টির কোলে যাইবেন, মাটিকে কোলে রাখিলে সকল পাপ-তাপ শীতল হইয়া যায়, সকল জ্বালাযন্ত্রণা দূর হইয়া যায়, সকল অভাবের বিমোচন হয়। এমন কোমল মাটিকে ভুলিও না।

মাটি নিবি গো—সাবান-পমেটম ভুলিয়া—মাটি নিবি গো! বিদেশের প্রসাধন-উপাদান সকলকে মাটিতে ফেলিয়া মাটি নিবি গো! ইউরোপের পাউডার-ভস্ম ফুৎকারে উড়াইয়া—মাটি নিবি গো! এক বার দাঁড়াও, কোঠা-বালাখানা ত্যাগ করিয়া,

মর্ম্মরকুটীরকে বর্জন করিয়া, নগরের সৌধশুষ্কতাকে পরিহার করিয়া নিত্য স্নিগ্ধ, নিত্য শ্যামল বাঙ্গালার মাটির উপর দাঁড়াও। মাটির উপর দাঁড়াইলেই মাটির আদর করিতে শিখিবে, তখন আমার মাটি-বেচা সার্থক হইবে। সর্ব্বস্বান্ত বাঙ্গালী, তোমার কেবল মাটিই ত আছে। মাটি আছে বলিয়াই তুমি এখনও বাঁচিয়া আছ; মাটি আছে বলিয়াই তোমার সোহাগের স্মৃতি আছে; মাটি আছে বহিয়াই মা-টির ক্রোড়ের প্রচ্ছন্ন নিধি খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এমন দিনে মাটি গ্রহণ কর, সে মাটিতে আবার শিব গড়িয়া পূজা কর, তোমার অশেষ কল্যাণ হইবে।

মাটি নিবি গো—('প্রবাহিণী,' ১৮ মাঘ ১৩২১)

নন-কো-অপারেশন। অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ।—

"ঐখানে দাঁড়ায়ে থাক,
রাইয়ের কুঞ্জে আর এস না।"

ইহাই আমাদের নন-কো-অপারেশনের মূল মন্ত্র। যিনি বৃন্দাদূতী এই স্পর্দ্ধার উক্তির মর্ম্ম ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তিনিই আমাদের বিবৃত নন-কো-অপারেশনের ভাব ও ভঙ্গী বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা ইংরেজকে, ইয়োরোপকে স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে উদ্যত হইয়াছি যে, আমার আঙ্গিনার বাহিরে, আমার প্রাচীরবেষ্টিত বাস্তুভিটার বাহিরে তুমি দাঁড়াইয়া থাক,—খবরদার, ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিও না। আমার নিকান-চোকান, কোমল-স্নিগ্ধ, পবিত্র শীতল অঙ্গনে তোমার বুটের মচমচানি হইলে, গোবর-গঙ্গামৃত্তিকার প্রলেপ নষ্ট হইবে, তুলসীমঞ্চ অপবিত্র হইবে, আমার গৃহস্থালীর নিত্যপূত আবরণ ছিন্ন হইয়া যাইবে। বিদেশীয় তুমি, পর তুমি, বিজেতা-

দাম্ভিক তুমি, আমার কোমল আয়তনের মধ্যে তোমাকে আসিতে দিতে পারি না। তুমি বাহিরে দাঁড়াইয়া থাক, আমি দরজার ভিতরে, আমার গণ্ডীর মধ্যে দাঁড়াইয়া তোমার সহিত কথা-বার্ত্তা চালাইব, প্রয়োজন বোধ হইলে তোমার কোন কোন সামগ্রী আমার রুচির মতন করিয়া আকারান্তরিত করিয়া আমি গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু সাবধান, প্রেমভক্তির, মাধুর্য্যের ও রসের আয়তন, আমার গৃহপ্রাঙ্গণে সবুট চরণ, লইয়া, বিলাসপ্রমত্ততার বংশীধ্বনি করিয়া প্রবেশ করিতে উদ্যত হইও না।

আমি বাঙ্গালী,—মাধুর্য্যের নিত্য সেবক। তুমি ইংরেজ, তোমার মধুর কথা শুনিয়া সত্যই আমি আত্মহারা হইয়াছিলাম। বিনামূল্যে তোমার নিকটে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছিলাম। সে বেসাতির ফলে আমার সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে; আমাকে কাঙ্গাল ফকির সাজিতে হইয়াছে,—উদরান্নের জন্য, লজ্জা নিবারণের বস্ত্রের জন্য তোমার দ্বারের কাঙ্গাল-ভিখারী হইতে হইয়াছে। আমার ছিল সব, গিয়াছেও সব। শিল্পকলা ছিল, ধনৈশ্বর্য্য ছিল, বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, উদ্যম-উত্তেজনা ছিল, নিত্যতৃপ্তি ও তুষ্টির শ্যাম-শ্যামার প্রেম-ভক্তিমূলক কীর্ত্তন ও গান ছিল চরিত্র ছিল, মনুষ্যত্ব ছিল শৌর্য্য বীর্য্য ছিল। আবার বলি, ছিল সব,—যাহা থাকিলে একটা জাতি সভ্য ও বরেণ্য হইতে পারে, তাহার সবটাই ছিল। তোমার সংস্পর্শে আসিয়া, তোমার নকল-নবীশ হইয়া মরুমারুতশীর্ণ যূথিকাস্তবকের ন্যায় আমার সকল ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে আর কাহারও সাহচর্য্য করিয়া আমার এতটা দুর্দ্দশা ঘটে নাই। হূণ-শবর, চীন-তাতার, মোঘল-পাঠান প্রভৃতি পূর্ব্বগামী কোন বিজেতা জাতির সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে আসিয়া

আমাকে এতটা সর্ব্বস্বান্ত এবং সর্ব্বস্বহীন হইতে হয় নাই। তোমার যেন "উপাসের" (upas) আওতা—তেঁতুলের ছায়া! দেড় শত বর্ষ কাল এই ব্রিটিশ তিন্তিড়ীতলে বাস করিয়া বাঙ্গালী আমরা কুষ্ঠরোগীর তুল্য স্থবির পঙ্গু হইয়া গিয়াছি। এত দিন পরে রোগের অনুভূতি এবং বোধোদয় ঘটিয়াছে, তাই তোমারই ভাষায় নন-কো-অপারেশনের ডঙ্কা মারিয়া আমাকে বলিতে হইয়াছে,

"যা রে বিদেশী বঁধু
আমি তোরে চাই না।"

তুমি করগ্রাহী রাজা আছ, তাহাই থাক, আমি কিস্তি কিস্তি তোমার টেক্স সকল আদায় দিব, তোমার আইন-কানুন মানিয়া চলিব, তোমায় দেখিলে দূর হইতে সভয়ে সাত সেলাম করিব। পরন্তু আর উপযাচিকার ন্যায় তোমার ভজনা করিব না, তোমার ধামা ধরিব না, উন্নতি এবং অনুচিকীর্ষার খাল কাটিয়া তোমার দেহ-সর্ব্বস্ব বিলাসব্যসনের পঙ্কিল কর্দ্দমপ্রবাহে গৃহ পল্লীকে আর ডুবাইয়া দিব না। জর্ম্মণ যুদ্ধে তোমার ইউরোপকে খুব চিনিয়াছি, পঞ্জাবী কাণ্ডে—জালিয়ানওয়ালার বীভৎস ব্যাপারে,—তোমাকেও চিনিতে পারিয়াছি! নৈরাশ্যের মুকুরে আমার সর্ব্বস্বহীন দেশের এবং জাতির ছবি আমি দেখিয়াছি। তাই পণ করিয়াছি, বাঁচি আর মরি, হারি বা পারি, আমরা কৃষ্ণকায় ভারতবাসী—'ধলা পানে আর চা'ব না, তাহার প্রেমে আর মজ্‌ব না; ধলার সঙ্গ আর কর্‌ব না।"

ইহাই আমাদের নন-কো-অপারেশন, স্বরাজ-প্রাপ্তির সাধনা অসহযোগের শব-সাধনা! ('নায়ক,' ৮ বৈশাখ ১৩২৮)

শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বরী পূজা।—বাবুর দল লম্বশাটপটাবৃত হইয়া বঙ্গদেশের ও দেশের কোন খবর না রাখিয়া, আধা ইংরেজি আধা বাঙ্গালী বুলিতে কেবল

DEPRESSED CLASS

বা পতিত জাতির উদ্ধারের বোলোয়ারী আওড়াইয়া থাকেন। বাবুরা জানেন না যে শূন্যপুরাণ হইতে অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রায় সকল মহাকাব্যেই পতিত জাতির বিবরণ আছে। বরং বৈষ্ণব সাহিত্যে একটু আধটু ব্রাহ্মণের গন্ধ পাওয়া যায়, পরন্তু শিবায়নে, ধর্ম্মমঙ্গলে, কবিকঙ্কণ চণ্ডিতে, মনসা-মঙ্গলে, ব্রাহ্মণের উল্লেখ নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। গন্ধবণিক, কৈবর্ত্ত, পোদ এবং নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতিই বাঙ্গালায় পূর্ব্বে প্রবল ছিল। তাহারাই রাজা, তাহারাই ধনী, তাহারাই সমাজরক্ষক ছিল; তাই বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কবিগণ তাঁহাদের লিখিত মহাকাব্য সকলে বণিক্, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতিরই জয় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার রচিত 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে বণিক্ জাতির প্রধান্য এবং ব্রাহ্মণের অবস্থান ও কর্ম্ম সম্বন্ধে সুন্দর চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কালকেতু, ফুল্লরা লহনা, লাউসেন প্রভৃতির সমুজ্জল চিত্র বাঙ্গালার মুসলমান যুগের মহাকাব্য সকলে অঙ্কিত দেখিলে মনে স্থির বিশ্বাস হয় যে, ইংরেজের আমলের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় Depressed Class বলিয়া কোন শ্রেণী ছিল না। ইংরেজ আমলেই "ভদ্রলোক" এবং "ছোট লোক" এই দুই শ্রেণীর বিভাগ নির্দ্দেশ হয়। ইংরেজের আমলেই ইংরেজিনবীশ বাবু-চাকুরে, উকীল, ব্যারিষ্টার এবং স্কুল মাষ্টার প্রভৃতি ভদ্রলোক অভিধা পান,আর দোকানদার, ব্যবসাদার,

কৃষক, ফিরিওয়ালা অনেকটা "ছোট লোক" বা "অভদ্র" শ্রেণীভুক্ত হন। যে ইংরেজি জানে না, সার্ট কোট পরে না, সে গণনার মধ্যেই নহে, এমন ধারণা কেশবচন্দ্রের আমলের ইংরেজীনবীশ মাত্রেরই মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল। এই ধারণা জন্য দাশু রায়, রাধামাধব প্রামাণিকগণ তখনকার বাবু সাহিত্যে স্থান পান নাই। এই ধারণা জন্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ ছাড়া অন্য জাতির মধ্যে কেমন সকল উৎসব আনন্দ প্রচলিত ছিল, তাহার কোন খবর বাবুর দল রাখেন নাই। তাই গন্ধেশ্বরীর পূজার খবর বাবু-সমাজে তেমন জানা নাই। একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখিব:—খাঁটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত Depressed Classএর বিচার করেন না। তাঁহারাই ত ব্যবস্থা দিয়া রাজবংশী, পোদ, নমঃশূদ্র প্রভৃতিকে উন্নত জাতীয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন; তাঁহাদের ব্যবস্থা পাইয়া আজ কায়স্থ ক্ষত্রিয় সাজিতেছে। ভদ্রলোক ও ছোট লোকের বিচার ইংরেজীনবীশ বাবু ব্রাহ্মণেই অধিক করিয়া থাকে। এই জাতীয় ব্রাহ্মণই "বেণে" বলিয়া নাক শিট্‌কায়।

বাঙ্গালা বেণের দেশ।

সোজা কথা বলিতে হইলে বলিব যে, বৌদ্ধ যুগে এবং মোগল পাঠানের আমলে বাঙ্গালা "বেণের দেশ" ছিল। মুকুন্দরাম, ঘনরাম, মাণিক্ গাঙ্গুলী প্রমুখ মোগল-পাঠানের আমলের ব্রাহ্মণ কবিগণ বেণের গুণগান করিয়া নিজ মহাকাব্য পূর্ণ করিয়াছেন। সেই গন্ধ-বণিক্ জাতির "গন্ধেশ্বরীর" পূজা গতকল্য রাত্রে হইয়া গিয়াছে। এবার আমাদের পাড়ায় এবং বরাহনগরে গন্ধেশ্বরীর মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা হইয়াছে। নহিলে সাধারণতঃ ঘটস্থাপন করিয়া পূজা হয়। গন্ধেশ্বরীর পূজা যাহারা করে, তাহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব নহেন।

গন্ধেশ্বরীর পূজায় ছাগ—খাসী বলিদান হইত, এখনও আঙ্গুল আড়াল দিয়া নিকটস্থ কালীমন্দিরে ছাগ বলি দিয়া গন্ধেশ্বরীর পূজা পূর্ণ করা হয়। আমাদের মনে হয়, গন্ধেশ্বরীর পূজার পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমাদের এই ধারণা বলবতী হইয়াছে যে, বাঙ্গালার গন্ধ-বণিক্ সমাজ পূর্ব্বে বজ্রযানী বৌদ্ধ ছিল, এখন শাক্তরূপে পরিণত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য বাঙ্গালার হীনযানী বৌদ্ধমতের বেদীর উপরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রভাবে বাঙ্গালায় বজ্রযানের খুব সঙ্কোচ ঘটিয়াছিল। পরন্তু গন্ধবণিক্ সমাজের গন্ধেশ্বরীর পূজা বন্ধ হয় নাই। এই গন্ধেশ্বরীর পূজার প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে পার? তাহা হইলে বুঝিবে, বাঙ্গালায় Depressed Class ছিল না। উহার একটু আধটু আমেজ যাহা পাওয়া যায়, তাহাও দাক্ষিণাত্যের প্রভাবে, বল্লালের আমলের পরে। শেষ ব্রাহ্মণ্য প্রধান্য ঘটে, ইংরেজের আমলের গোড়ায়, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রভাবকালে। এখনও আছে, তবে বর্ণগত জাতি নাই—ছিলও না। বাঙ্গালায় জল অনাচরণীয় ব্যবস্থা জেতা-বিজিতের হিসাবে এবং বৌদ্ধবিদ্বেষের ফলে ঘটিয়াছে। যদি খবর লইতে জানিতে, তাহা হইলে এত কথা কহিতে হইত না।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী গ্রন্থখানা যদি অভিনিবেশ সহ পাঠ করিতে, তাহা হইলে জানিতে পারিতে যে, চণ্ডীর পূজায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে কখনই আহ্বান করা হইত না। খুল্লনা স্বয়ং চণ্ডীর ঘটস্থাপনা করিতেন। কেবল দশকর্ম্মে শ্রাদ্ধশান্তিতে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকা হইত। বর্ণ-ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণের কোন শ্রেণী পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ছিল না। কেবল কুলীন কয় ঘর অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী থাকিতে চেষ্টা

করিতেন, বাকী সকল ব্রাহ্মণই কৈবর্ত্ত, পোদ ও বণিক্‌জাতির প্রতিপাল্য ছিল। কালকেতুর কেমন জীবন? হরিহোড় কি করিত? এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা এখনও কেহ করে নাই। ইউনিভার্সিটিও তেমন অভিজ্ঞ পণ্ডিত রাখেন নাই, কাজেই বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস বাঙ্গালী বাবু জানেন না। গন্ধেশ্বরীর কথা তুলিয়া গোটাকয়েক অবস্থার ইঙ্গিত করিলাম মাত্র; পরন্তু এখন ত আর বাঙ্গালার পঠন-পাঠন নাই, বঙ্গ সাহিত্যের বিশ্লেষণও কেহ করে নাই। সে ইঙ্গিত বুঝিবার লোকের বাঙ্গালায় অত্যন্তাভাব ঘটিয়াছে। এই বৈশাখী পূর্ণিমার সঙ্গে যে কত কি জড়ান-মাখান আছে, জয়মঙ্গলবার আছে, মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত আছে, আরও কত কি আছে, তাহা এখনকার বাঙ্গালী জানে না। পূর্ণিমায় গন্ধেশ্বরীর পূজা হয় কেন? ওলাইচণ্ডীও পূর্ণিমাতে হইত। বজ্রযানের খবর যদি থাকিত, সহজ মতের সহিত যদি পরিচয় থাকিত ত এ সকল গুপ্ত রহস্য বুঝিতে পারিতে। এখনও যে বাঙ্গালায় কত বৌদ্ধ আচার পদ্ধতি প্রচ্ছন্নভাবে প্রচলিত আছে, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গালী লেখাপড়া শিখেতেছে বটে, পরন্তু ঘরের খবর রাখিতে ভুলিয়াছে। আমাদের সেই দুঃখই বড় দুঃখ।" ('নায়ক', ২৯ বৈশাখ ১৩২৯)